জাঁ-ক্রিসতফ

রমাঁ রোলাঁ

জাঁ-ক্রিসতফ

[মূল উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদ করেছেন :

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুষ্পময়ী বসু

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫১

দাম : পাঁচ টাকা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : ননীগোপাল পোদ্দার, ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৬

প্রভাত

জাঁ ক্রিসতফ : দ্বিতীয় খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনূদিত

জঁা-মিচেলের মৃত্যু

অনেক বছর চলে গেছে। জঁা-ক্রিসতফ্ এখন এগারো বছরের। চলেছে তার সঙ্গীতশিক্ষা। সে তখন হার্মনি শিখছে ফ্লোরিয়ান হলজার-এর কাছে। যে সুর শ্রুতিসুন্দর, কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে মর্মে এসে সাড়া দেয় তা নাকি দূষণীয়, অতএব নিষিদ্ধ। কিন্তু কেন যে নিষিদ্ধ তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। স্বভাবতই সে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরোধী, তাই সে-সুরগুলিই বেশি করে তাকে আকর্ষণ করে। খুঁজে বেড়ায় প্রসিদ্ধ সুরকারদের রচনায় সে-সব মধুরতার নমুনা কিছু আছে কিনা। যদি সন্ধান মেলে অমনি ছুটে যায় ঠাকুরদাদার কাছে কিংবা শিক্ষকের কাছে। ঠাকুরদাদা বলেন, বীঠোফেন এত উঁচুদরের শিল্পী, সে করতে পারে ব্যতিক্রম। কিন্তু তুমি পারো না। মাস্টারমশাই তো রেগে অগ্নিশর্মা। তুমি ব্যতিক্রমটাই দেখছ, কিন্তু কী অভিনব সৃষ্টি তিনি করে গেছেন তার খেয়াল রাখো ?

থিয়েটারে কনসার্টে জঁা-ক্রিসতফের কায়েমী ছাড়পত্র। সব কিছু যন্ত্রই সে একটু না একটু বাজাতে পারে। বেহালায় হাত তো তার দিব্যি পাকা হয়ে উঠেছে, তাই জায়গা করে নিতে পেরেছে অর্কেষ্ট্রায়। ক'মাসের মধ্যেই চলে এসেছে একবারে সামনের লাইনে। রোজগার করছে দস্তুরমত। রোজগারটা ঠিক সময়েই সুরু হয়েছে যা হোক, কেননা বাড়ির অবস্থা ক্রমশই অতলের দিকে। বেড়ে যাচ্ছে মেলশিয়রের উচ্ছৃঙ্খলতা, ঠাকুরদাদা বুড়ো হয়ে পড়ছেন।

বাড়ির মলিন আবহাওয়াটা জঁা-ক্রিসতফের উপর চেপে বসেছে। বয়স্ক লোকের মতই এখন সে গম্ভীর, চিন্তান্বিত। নিজের কাজ সে

বাঁরের মত করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কাজে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। বাজাতে বাজাতে দেরি হয়ে যায়, শান্ত হয়ে অর্কেষ্ট্রার সিটেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। আগে আগে ছেলেবেলায় থিয়েটার যতটা আগ্রহ জাগাত এখন আর তা জাগায় না। যখন তার চার বছর বয়স তখন তার আকাঙ্ক্ষা ছিল এই জায়গায় এসে বসবে একদিন। মিটেছে তার সেই আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তৃপ্তি কই? যে-যে সুর সে বাজাচ্ছে তাদের উপর তার ঘেন্না ধরে গেছে। অবিশ্যি প্রকাশ্যে মতামত দেবার তার সাহস নেই, কিন্তু মনে মনে ওগুলোকে সে নিতান্ত অর্থহীন বলে পরিহার করে। বাজনার পর তার সহকর্মীরা এমন ভাবে কপাল মোছে যেন তারা ঘণ্টাখানেক ধরে কুস্তি করে উঠল! সবই এত কৃত্রিম, এমন মুখস্তের মত। তার সেই পুরানো দীপশিখাটির কাছে আবার সে ঘনিয়ে এসেছে—সেই খালি-গা সুন্দরী গায়িকাটির কাছে, একদিন যে সে মেয়েটিকে ভালবেসেছিল তা মেয়েটি জানে, তাই মেয়েটি তাকে মাঝে মাঝে চুমু খায়। সেই চুম্বনে আর আনন্দ নেই। মেয়েটির মুখের রং আর গায়ের সেণ্টে তার বিরক্তি ধরে গেছে— তার সেই স্থূল বাহু আর তার লুব্ধতা। শুধু বিরক্তি নয়, রীতিমত ঘৃণা করে সেই গায়িকাকে।

গ্রাণ্ড ডিউক তাকে ভোলেননি। মাঝে-মাঝে, যখন প্রাসাদে অতিথি সমাগম হয়, তখন তাকে আসতে বলেন। প্রায়ই, সন্ধ্যার সময়, যখন সে একলা থাকবার জন্যে হাঁপিয়ে ওঠে। সব ফেলে ছড়িয়ে পড়ি-মরি করে তাকে ছুটতে হয় প্রাসাদে। কখনো বা অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় পাশের ঘরে, কেননা ডিনার খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। বাড়ির চাকররা কি রকম অসম্ভ্রমের সুরে কথা কয়। তারপর তারা তাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে আসে। সেখানে চারদিকে আলো আর

আয়নার ঝলস, আর কতগুলো স্থূলতনু পুরুষ আর স্ত্রীলোক। তার দিকে কুটিল কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। মোমের মেঝে পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডিউক-ডাচেসের হস্তচুম্বন করতে হয়— [illegible] ততই বিশ্রী লাগছে, ঘা লাগছে আত্মসম্মানে।

তারপর আবার পিয়োনো বাজিয়ে শোনাও ও-সব মূর্খদের। ওদেরকে মূর্খ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। একেক সময় ওদের অমনোযোগ এত বিসদৃশ হয়ে ওঠে যে বাজনার মধ্যিখানেই তার থেমে যেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় আশে-পাশে হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। বাজনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় প্রশংসাবর্ষণ, ঘুরে ঘুরে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সকলের সঙ্গে। মনে হয়, ও যেন কোন পশুশালার পশু—যত প্রশংসা, প্রাপ্য তার নিজের নয় তার শিক্ষকের। প্রকাণ্ড একটা অপমানের মত লাগে—আস্তে আস্তে একটা অসুস্থতা তাকে পেয়ে বসে, যেন সব কিছুতেই তাকে অপমান করা হচ্ছে। কোণে বসে কেউ হাসছে, মনে হচ্ছে সে হাসির লক্ষ্য সে নিজে—কিন্তু কি দেখে যে হাসছে, তার হাত পা চেহারা, না, তার হাবভাব দেখে—কিছুই বুঝে উঠতে পারেনা। যদি কেউ তাকে ডেকে কথা না কয়, মনে হয় অপমান, আবার যদি কেউ ডেকে কথা কয়, মনে হয় এও বুঝি অপমান। যদি কেউ তাকে ছোট ছেলে ভেবে মিষ্টি উপহার দেয় মনে হয় অসম্মান করছে। যদি বা ডিউক কোনোদিন তার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে বিদেয় করে দেয়, মনে ভাবে এর মত অবমাননার আর আছে কি। গরিব বলে নিজেকে বড় হতভাগ্য লাগে, সবাই তাকে গরিব বলে ধরে নিয়েছে বলে। একদিন পয়সা নিয়ে যাচ্ছে সে অমনি রাস্তা দিয়ে, সন্ধেবেলা, মনে হল যেন একটা দুর্বহ অপমানের বোঝা সে বয়ে নিয়ে চলেছে। যেমনি ভাবা, দৃকপাত না করে, পয়সা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়েই

অমনি মনে পড়ল, এ সে করল কি, কশাইয়ের দোকানের পাওনা এক মাসের উপর শুধতে বাকি।

তার এই অন্তর্দাহের কথা বাড়ির আত্মীয়-স্বজন কেউ টের পায়না। মা পর্যন্ত না। লুইসা বরং খুশি, প্রাসাদে অমন সব জমকালো লোকজনের সংসর্গে চমৎকার সন্ধ্যাগুলি কাটছে ক্রিসতফের। মেলশিয়র তো দেমাক করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সব চেয়ে আহ্লাদ হচ্ছে ঠাকুরদাদার। টাকা-পয়সা মান-সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি তার অসীম দুর্বলতা—যদিও বাইরে তিনি ভাব দেখান তিনি একজন স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী। তাই ঐ সব ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের ছায়ায়-ছায়ায় ক্রিসতফ ফিরতে পারছে বলে তাঁর প্রকাণ্ড গর্ব। বাইরে শান্ত ও নির্লিপ্ত হয়ে থাকবেন মনে করেন কিন্তু ও সব চিন্তায় অজানতেই তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কতক্ষণে ক্রিসতফ বাড়ি ফিরবে তারই আশায় উৎসুক হয়ে থাকেন। এলেই প্রশ্ন করেন অকারণ—'কেমন হল আজ সব?' কিংবা বলেন—'এই যে ক্রিস্তফ এসেছে, বলো, কি, খবর কি?'

কিন্তু জাঁ-ক্রিসতফের মন-মেজাজ ভাল নেই। কোনো কথাবার্তার ধার না ধেরে এক কোণে চুপচাপ বসে থাকতে পেলেই সে খুশি। কিন্তু জাঁ-মিচেল নাছোড়বান্দা। প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলবার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাই 'হাঁ' বা 'না' বলে পরিত্রাণ পাবার জো নেই। দাও সব খুঁটিনাটি বিবরণ। চটে চেঁচিয়ে ওঠে জাঁ-ক্রিসতফ। তার মুখে হাত ঢুকিয়ে উত্তর টেনে আনতে হয় জোর করে। দেখতে দেখতে জাঁ-মিচেল খেপে ওঠে, গালাগাল করে। জাঁ-ক্রিসতফও মুখ বুজে সইবার ছেলে নয়। শেষকালে একটা খণ্ডপ্রলয় সুরু হয়। বুড়ো বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, জোরে শব্দ করে বন্ধ করে দেয় দরজা। গরিব পরিবারের একটি সন্ধ্যার আনন্দ জাঁ-ক্রিসতফ নষ্ট করে দিল। আভাসেও

কেউ বুঝতে পেলনা তার এই রুক্ষ মেজাজের কারণ কি। হীনবৃত্তি লোকের মতই এদের ধ্যান-ধারণা—এর জন্যে কাকে তুমি দোষ দেবে?

জাঁ-ক্রিসতফ নিজেকে নিয়েই বসে এসে নিরালায়। মনে হয় তার পরিবার ও তার নিজের মধ্যে একটা বহু-বিস্তৃত ব্যবধান। তবু যদি সকলের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গের মত অজস্র কথা কইতে পেত, তা হলে ব্যবধান বোধ হয় এত দুস্তর হতনা। কিন্তু সবাই জানে, বাপ-মা আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কখনো অবিমিশ্র অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারে না—একদিকে সম্ভ্রমবোধ এসে বিশ্বাসের পথ আটকায়, অন্যদিকে বয়স ও অভিজ্ঞতার প্রবীণতা শিশুমনের প্রবণতাকে চায় না বুঝতে দিতে।

বাড়িতে যে সব লোক দেখছে ও যা তাদের কথাবার্তা শুনছে—তাতে আরো বাড়তে লাগল ব্যবধান।

মেলশিয়রের বন্ধুরা প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসে। সব সেই অর্কেষ্ট্রার বাজিয়ে—বিয়ে করেনি কেউ, প্রত্যেকে এক একটি পাঁড় মাতাল। এমনিতে হয়ত মন্দ লোক নয়, কিন্তু অত্যন্ত স্থূল। পায়ের শব্দে আর হাসির হুল্লোড়ে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে রাখে। বাজনা সম্বন্ধে আলোচনা করে, কিন্তু এমন মূর্খের মত করে, যে, সারা গা রি-রি করে ওঠে। যে বাজনাটা জাঁ-ক্রিসতফের প্রিয় তাকে যখন ওরা প্রশংসা করে তখন মনে হয় যেন তাকে অপমান করছে। সমস্ত শরীর তার রাগে জমে কাঠ হয়ে ওঠে, জীবনে বাজনা সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল নেই এমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে।

মেলশিয়র বলে, "ছোঁড়াটার হৃদয় বলে কিছু নেই। একেবারে বোধশূন্য। জানিনা এ ও পেল কোথায়?"

তার ঠাকুরদাদারও অনেক বন্ধু আছে—পাড়ার সব গপ্পে-বুড়োর দল—সেই একই হাসি-ঠাট্টায় মজলিস জমায়। রাজনীতি নিয়ে, আর্ট

নিয়ে, কখনো বা কারো বংশাবলী নিয়ে। বিষয় সম্বন্ধে তাদের মাথাব্যথা নেই, কথা যে বলতে পারছে অনর্গল এবং সেই কথার যে শ্রোতা মিলেছে এতেই তারা খুশি।

কিন্তু বাড়িতে যত লোকই আসুক থিয়োডোরের মত চক্ষুশূল আর কেউ নয়। জাঁ-মিচেলের প্রথম স্ত্রী ক্লারার ছেলে এই থিয়োডোর— সেই সম্পর্কে ক্রিসতফের কাকা। আফ্রিকায় না দূর প্রাচ্যে বিরাট এক ফার্মের অংশীদার। নতুন যুগের জার্মানির প্রতীক, পুরোনো আদর্শবাদকে সে অস্বীকার করে, শক্তি ও সাফল্যই জীবনের একমাত্র জয়—এ অহঙ্কারে সে ডঙ্কা মেরে বেড়ায়। ন্যায়, সত্য আর ধর্মের নিদর্শনই হচ্ছে বীর্য, লোভ আর স্বার্থপরতা—এই তার মূলমন্ত্র।

জাঁ-ক্রিসতফের বিশ্বাসের মূল পর্যন্ত নড়ে ওঠে। তার কাকা ঠিক বলছে না ভুল বলছে তা সে জানেনা, জানতে চায়ওনা। কিন্তু থিয়োডোরকে দেখেই সে ঘৃণা করতে সুরু করে। মনে-মনে ঠিক করে নেয় সে তার শত্রুপক্ষের। তার মতামতের উপর ঠাকুরদাদাও খুব প্রসন্ন নন, কিন্তু থিয়োডোরের জিভের তীক্ষ্ণতার সামনে দাঁড়াবার তার সাধ্য নেই। ক্রমে ক্রমে, নিজেরও অজানতে, থিয়োডোরের দলে কখন ভিড়ে যান। সত্যি, বুড়ো হয়েছেন বলে তিনিই বা কেন সময়ের থেকে পিছিয়ে থাকবেন? থিয়োডোরের এই সব পাটোয়ারী কৌশলই তো আজকের জগতে মান পাচ্ছে—এই সব দিয়েই তো জীবনের মান। কোনো একটা নাতিকে এ পথে ঢুকিয়ে দিলে হয়। মেলশিয়রেরও সেই মত। রুডলফকেই দেয়া যাক—কি বলো? এই বড়লোক আত্মীয়কে খোসামোদ করবার জন্যে সমস্ত পরিবার তাই মেতে উঠল। থিয়োডোরও এই সুযোগে সকলের কাছে নিজেকে একটা কেষ্টবিষ্টু বানিয়ে ফেললে। সব কিছুতেই সে এখন মত দেয়, পরামর্শ দেয়, হস্তক্ষেপ করে। আর,

শিল্প ও শিল্পীর প্রতি তার যে বিজাতীয় ঘৃণা তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ বাড়ির লোকজন যে বাজনার অনুরাগী সেজন্যে তাদেরকে বিদ্রূপ করতে তার কসুর নেই। আর, সে সব অত্যন্ত বোকা ঠাট্টা—তবু এবাড়ির কাপুরুষগুলো তাতে হাসে।

এই সব বিদ্রূপের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জাঁ-ক্রিসতফ। কিন্তু ধৈর্য ধরে ওসব খোঁটা সে সহ্য করতে নারাজ। মুখে কিছু সে বলেনা বটে, কিন্তু দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষে। তার এই নির্বাক্য রাগে হাসতে থাকে থিয়োডোর। কিন্তু সেদিন সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল নিমেষে। বিদ্রূপের খোঁচাটা গভীর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল হয়ত, হঠাৎ জাঁ-ক্রিসতফ থিয়োডোরের মুখের উপর থুতু ছিটিয়ে দিলে। সাংঘাতিক কাণ্ড। অপমানটা এত ভয়াবহ যে থিয়োডোর প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরে যখন মুখে কথা এল সে গালাগালের অগ্ন্যুৎপাত সুরু করলে। নিজের কাণ্ডে নিজেই ক্রিসতফ হতবুদ্ধি হয়ে গেছে—তাই কিল-চড় যা পড়ছে তার পিঠের উপর কিছুই যেন বুঝতে পাচ্ছেনা। কিন্তু যখন সবাই বললে কাকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে আনত হয়ে, তখন সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। থামল একেবারে গাঁয়ের বাইরে এসে। পিছন থেকে তাকে ডাকছে, অনেকদূর পর্যন্ত শুনতে পেয়েছে সেই ডাক। কী হবে আর ফিরে গিয়ে? নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে কেমন হয়! কিন্তু একা-একা পড়লে লাভ কি? পেড়ে ফেলা যায় না সেই দুষমনটাকে?

মাঠে-মাঠে রাত কাটাল। ভোরবেলা আস্তে-আস্তে এসে ঠাকুরদাদার দরজায় টোকা মারলে। সারা রাত ঘুম হয়নি বুড়োর—এখন ওকে দেখে বকতে আর মন উঠল না। বাড়িতে কেউ কিছুই বললে না

—কেননা এখনো ওর মনের তারটা টান করে বাঁধা। বরং ওর মনটাকে মোলায়েম করে দেওয়া দরকার—বিকেলে রাজপ্রাসাদে বাজনার বায়না আছে। কিন্তু মেলশিয়র ছাড়বার পাত্র নয়। হপ্তার পর হপ্তা সে তিরস্কার করে যাচ্ছে—ঠিক জঁা-ক্রিসতফকেই উদ্দেশ করে নয়, এমনি এক কোন অশরীরী অপরাধীর অভিমুখে। বৃথাই মানুষকে উপদেশ দেওয়া! সে মানুষ নিজে যদি অপদার্থ হয়, কি করে বুঝবে সে নির্মল ও সুশীল জীবনের দৃষ্টান্ত! আর যখন থিয়োডোরের সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়, থিয়োডোর তার নাকটা উঁচু করে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে।

বাড়িতে এক ফোঁটা সহানুভূতি নেই, তাই পারতপক্ষে বেশিক্ষণ সেখানে থাকে না ক্রিসতফ। তাকে ঘিরে এই যে সব বন্ধনের দড়িদড়া, তার বিরুদ্ধে সে ছটফট করে। সংসারে কত যে অসংখ্য লোক, তাদের সবাইর কাছে মাথা হেঁট করে সম্মান দেখাতে হবে। কত যে অসংখ্য জিনিস, শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়ে স্বীকার করতে হবে প্রকাশ্যে। কেন যে দেখাতে হবে তা তুমি জিগেগসও করতে পাবে না। তাকে সবাই জোর করে গড়ে-পিটে একটি নিরেট জার্মান বুর্জোয়া বানিয়ে ছাড়বে। যতই তাদের চেষ্টা ততই তার বিদ্রোহ। কি করে বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে অশাসনের এলেকায়। সেই সব বিস্বাদ ও বিবর্ণ অর্কেষ্ট্রা-সন্ধ্যার পর তার ইচ্ছে করে মাঠে গিয়ে ঘাসের উপর গড়াগড়ি খায়, কিংবা পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়ি খেলে। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হয় না। মার বকুনি খাবার ভয়ে নয়, তার খেলার একটিও সঙ্গী নেই। তার সঙ্গে খেলে কেউই আরাম পায় না, কেননা খেলাকে খেলার মতই হালকা ভাবে সে নিতে নারাজ—তার কাছে খেলাও যেন প্রায়

জীবন-যুদ্ধের প্রত্যক। তাই খেলাহারা হয়ে সে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। যদিও ওদের সঙ্গে খেলবার জন্যে সমস্ত মন আঁকুপাঁকু করে, বাইরে এমন ভাব দেখায় খেলাটা অতি বড় তুচ্ছ ব্যাপার। ওদের কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু একটিবারও ওরা ডাকে না। উদাসীনের মত চলে যায় ক্রিসতফ।

গতিফ্রিদ যখন কাছাকাছি থাকে তখন তার সঙ্গে বেড়িয়ে কিছু শান্তি পায়। তার স্বাধীন মেজাজের জন্য তাকে বড় ভাল লাগে, তার সঙ্গে বন্ধুতাটা ঘনতর হয়। এখন সে বুঝতে পারে গতিফ্রিদের আনন্দ, সংসারের সঙ্গে সামান্যতম বন্ধনও না-রেখে অবিশ্রান্ত এই পথ ভাঙা! সন্ধের সময় প্রায়ই দুজনে সোজা গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে, লক্ষ্যহীনের মত, আর রোজই গতিফ্রিদের সময়ের আন্দাজ থাকে না। রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে, তখন আবার বকুনি! গতিফ্রিদ বুকতে পারে এ ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু জাঁ-ক্রিসতফ আবদার সুরু করে—তা ছাড়া অমনি নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ানোর নেশা তাকেও পেয়ে বসে। মাঝরাতে বাড়ির কাছাকাছি এসে গতিফ্রিদ শিস দেয়। ঐ শিসটিই প্রতীক্ষিত সঙ্কেত। পোশাক-টোশাক পরেই প্রস্তুত হয়ে শুয়েছে জাঁ-ক্রিসতফ। শিস শুনে আস্তে-আস্তে সে উঠে আসে, জুতো হাতে করে পা টিপে টিপে চলে আসে রান্নাঘরে—সারাক্ষণ একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে ফেলে না। রান্নাঘরের জানলাটা ঠিক রাস্তার দিকে। টেবিলের উপর সে উঠে দাঁড়ায়, আর খোলা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গতিফ্রিদ তাকে কাঁধের উপর তুলে আনে। দুই গৃহ-পলাতক পথ ধরে আনন্দে।

মাঝে মাঝে জেরেমিকে ডেকে নেয়। জেরেমি জেলে, গতিফ্রিদের বন্ধু। তার নৌকা নিয়ে চন্দ্রালোকে তারা ভেসে পড়ে। দাঁড়ের

ঘায়ে জলে অপূর্ব বাজনা বাজে। পাতলা দুধের মতন একটা কুয়াসা জলের উপর ছড়িয়ে থাকে। তারাগুলো দপ দপ করে। এপার থেকে ওপারে মোরগের ডাক শোনা যায়। কখনো বা লার্কের তীব্র আনন্দধ্বনি আকাশের গভীরে গিয়ে ধ্বনিত হয়। চাঁদের আলোয় প্রলুব্ধ হয়ে মাটি ছেড়ে চলেছে যেন শূন্যের ধূসরে। তাদের তিন জনের কারুরই মুখে কোনো কথা নেই অনেকক্ষণ। গতিফ্রিদ একটা সুর ভাঁজে গুন গুন করে। জেরেমি বন্যপশু নিয়ে নানান রকম গল্প বলে। তার বলার ধরনে গল্পগুলি কি রকম রহস্যময় রূপকথার চেহারা নেয়। বনের আড়ালে চাঁদ গিয়ে মুখ লুকোয়। কালো কালো পাহাড়ের বেষ্টনী তারা ঘুরে আসে। জলের অন্ধকার আর আকাশের অন্ধকার মিশে যায় একসঙ্গে। জলে আর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। শব্দ সব জুড়িয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। যেন রাত্রির মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে নৌকা। সে কি ভাসছে? চলছে? না, থেমে আছে এক জায়গায়?

জলের ঘাসগুলি সিল্কের খসখসানির মত শব্দ করে উঠল। নিঃশব্দে লাগল এসে নৌকা। পারে নেমে পায়ে হেঁটে চলল তিনজন। ভোর না হওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। নদীর পার ঘেঁসে এগুতে লাগল। মেঘের গায়ে আস্তে আস্তে রং লাগছে, প্রথম দিনের আলোয় কখনো সবুজ, কখনো নীল, কখনো বা রুপোলি। নদীর জলে তার ছায়া পড়ছে—কখনো গোলাপী, কখনো পাটকিলে। একের পর এক পাখি জাগছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো এবার বাড়ির দিকে। যেমন সাবধানে বেরিয়ে এসেছি তেমনি ফের গিয়ে ঢুকতে হবে বিছানায়। যাক, কেউ ধরতে পারেনি, বিছানায় পড়েই ঘুমিয়ে পড়ল জাঁ-ক্রিসতফ—তার সমস্ত শরীর তৃণাচ্ছন্ন মাঠের সুগন্ধে বিভোর।

একদিন ক্রিসতফের ছোট ভাই, আর্নেস্ট, সব মাটি করে দিলে। ধরিয়ে দিলে তাদের ঐ রাত-বেড়ানো। সেইদিন থেকেই বন্ধ হয়ে গেল পলায়ন, নজরবন্দী হল সারারাত। তবু কখন কোন ফাঁকে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে, ফিরিয়ালা-ছোকরা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মেশে। কেলেঙ্কারির একশেষ। ছেলেটার একেবারে একটা মুটে-মজুরের মতো রুচি—ঝাঁজিয়ে ওঠে মেলশিয়র। গতিক্রিদকে বেশি ভালোবাসে—এ জন্যে জাঁ-মিচেলের আবার হিংসে। যেখানে বড়-বড় লোকের সঙ্গে মেশবার অবাধ সুবিধে, রাজভৃত্য হবার যেখানে সসম্মান নিমন্ত্রণ, সেখানে ছোটলোকদের সঙ্গে মেশা মানে পরিবারকে অপদস্থ করা—গোপনে ডেকে এনে বক্তৃতা দেয় জাঁ-মিচেল। কিন্তু কথা কানে ঢোকে কিনা কে বলবে। সবাই সাব্যস্ত করে জাঁ-ক্রিসতফের সম্ভ্রমবোধ নেই, নেই আত্মসম্মানের ধারণা।

যতই দারিদ্র্য থাক সংসারে, আর যতই তা মেলশিয়রের মূর্খ উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন দিন-দিন কঠিনতর হোক, তবু যতদিন জাঁ-মিচেল আছে ততদিন জীবন সহনীয় থাকবে। মেলশিয়রকে পাপের পথ থেকে ঠেকাতে যদি কেউ পারে তবে সে ঐ একজন। আর অসহায় সংসারের সাহায্যে যদি কখনো হঠাৎ টাকাকড়ির দরকার পড়ে তাও আসে ঐ একজনেরই পকেট থেকে। সামান্য পেনসনের উপর যৎকিঞ্চিৎ আয়—এখানে-ওখানে বাজনা শিখিয়ে বা পিয়ানোর সুর বেঁধে। কুড়িয়ে কাচিয়ে যা পায় তার বেশি ভাগই লুকিয়ে এনে গুঁজে দেয় লুইসার হাতে। বোঝে, কষ্টটাকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টায় লুইসা কী কঠিন পরিশ্রমই না করছে! এ সাহায্য নিতে লুইসার ভালো লাগে না, কেননা একটু বেশ ঢিলেঢালা ভাবেই জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত জাঁ মিচেল—অর্থের সামান্য অভাবে

অনেক ধাক্কা সইতে হয় বুড়োকে। তবু ওটুকু আত্মত্যাগই যেন বুড়োর পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংসারের জরুরি ধার মেটাতে কখনো-কখনো নিজের আসবাব-পত্র বা অন্য কোনো প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন গোপনে বিক্রি করে টাকা জোগায়। ঠিক টের পায় মেলশিয়র। কখনো-কখনো সে-টাকার উপরই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুইসার কোনো প্রতিবাদই ধোপে টেঁকেনা। বুড়োর কানে আসে সেই দুঃসংবাদ, লুইসার থেকে নয়, কেননা লুইসা কোনো দিনই মুখ ফুটে নালিশ করেনি তার কাছে—কোনো এক নাতিই বলে যায় ফিসফিসিয়ে। রেগে খেপে ওঠে জাঁ-মিচেল, দুই বাপে-ছেলেয় সংঘর্ষ বাধে নিদারুণ। এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় দুজনে, যেন এক্ষুনি হাতাহাতি সুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাপের প্রতি প্রচ্ছন্ন সম্মান-বোধটা বাঁচিয়ে দেয় মেলশিয়রকে। যতই মাতলামো করুক, শেষ পর্যন্ত বাপের তিরস্কারের সামনে মাথা হেঁট করে বসে। কিন্তু তা হলে কি হয়, আবার সুযোগ এসে জুটলেই সনাতন পথে বেরিয়ে পড়ে।

"আমি যখন থাকবনা তখন তোমাদের কী হবে ?" লুইসার কাছে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে জাঁ-মিচেল। "ভাগ্যিস," জাঁ-ক্রিসতফ্‌কে একটু আদর করে বুড়ো : "ও আছে। ও যদ্দিন না তোমাদের এই কাদা থেকে তুলতে পারছে ততদিন হয়তো চালিয়ে যেতে পারব।" কিন্তু হিসেবে অঙ্ক আর বেশি দূর যেতে চায়না, মনে হয় রাস্তার একেবারে প্রান্তে সে এসে পড়েছে। চট করে দেখে কারু সন্দেহ হবেনা হয়তো। বিস্ময়কর-রূপে সে বলবান। আশি পেরিয়ে গেছে, সিংহের কেশরের মত এক মাথা শাদা চুল, দাড়িতে কিন্তু কালো চুলের দেখা মেলে এখনো। দশটা দাঁত এখনো নিটুট আছে, আর তাই দিয়েই সে চিবুতে পারে সতেজে।

চমচমে খিদে পায় তার, আর যদিও মদ খাবার জন্যে মেলশিয়রকে সে বকে, তার নিজের বোতলটি সে খালি রাখে না কোনোদিন। সংসারে ঈশ্বর যত ভালো জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি সে সুবিচার করতে পারবেনা কেন? তাই বলে মূর্খের মত মদের গ্লাশে বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিতে সে রাজি নয়। যতটুকু তার মাপ—দুর্বলমস্তিষ্ক লোকের পক্ষে তাই প্রচণ্ড—ততটুকু সে বজায় রাখে। তার হাত-পা মজবুত, চোখ তীক্ষ্ণ, তার কর্মে সে অশ্রান্তস্রোত। সকাল ছটায় ওঠে, নিষ্ঠা-সহকারে সমাপ্ত করে প্রাতকৃত্য। চেহারার যত্ন নেয়, নিজের শরীরের প্রতি সে শ্রদ্ধা রাখে। নিজের বাড়িতে একা থাকে, আর তার নিজের সংসারে নিজের ব্যাপারে লুইসাকে মোটেই হাত দিতে দেয় না। নিজের ঘর সে নিজে ঝাঁট দেয়, নিজের কফি নিজে করে, সেলাই করে, বোতাম লাগায়। পেরেক ঠোকে, আঠা লাগায়, জিনিসপত্রের মেরামতি করে। আর সিঁড়ি দিয়ে শার্ট-গায়ে নামা ওঠা করতে-করতে মোটা গলায় গান গায়। রোদ হোক বর্ষা হোক, বাইরে বেরুনো আছে সব সময়। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হয় কোনো চেনা লোকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছে, নয়তো কোনো মুখ-চেনা স্ত্রীলোকের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারছে ক'টা রসিকতা। সুন্দরী স্ত্রালোক আর পুরোনো বন্ধু—এ দুইয়ের প্রতি দুর্বলতা তার গেল না। তাই বাড়ি ফিরতে সব সময়েই তার দেরি হয়ে যায়, সময়ই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু রাতের খাওয়ার সময়টা ফাঁকি দিতে পারে না কিছুতেই, যেখানেই যাক, সেখানেই যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে খাওয়াটা সেরে নেয়। তারপর নাতিনাতনিদের সঙ্গে দেখা করে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। বিছানায় শুতে যায়, আর ঘুমুবার আগে এক পৃষ্ঠা বাইবেল পড়ে। আর কতক্ষণই বা তার ঘুম!

বড়জোর এক ঘণ্টা কি দুঘণ্টা—তারপর পুরোনো বইর দোকান থেকে কেনা মোটা কোনো বই খুলে বসে—হয় ইতিহাস নয় ধর্মতত্ত্ব, প্রবন্ধ নয় বিজ্ঞান। একনাগাড়ে পড়েনা এখানে খানিক ওখানে খানিক করে পড়ে। সব সে ঠিকঠাক বোঝেনা—না বুঝুক,—কিন্তু প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে তার পড়া চাই—যতক্ষণ সম্ভব, যতক্ষণ না ফের ঢুলুনি আসে। রবিবার হলে গির্জেয় যায়, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেড়ায়, খেলা করে। পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে একটু বাত আছে—তা ছাড়া রোগের স্পর্শ নেই শরীরে। মনে হয় একশো বছর পর্যন্ত বেঁচে যাবে। না বাঁচবার কারণ তো কিছু দেখা যাচ্ছেনা। লোকে যখন বলে সে শতায়ু হবে তখন সে কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাবে, ভাগ্যের করুণার আর অন্ত নেই। সে যে বুড়ো হচ্ছে তার প্রমাণ, আজকাল বড় সহজেই তার চোখে জল আসে, আর মেজাজটা একটুতেই চিড় খায়। তার একটু মনোমত না হলেই সে তুমুল তাণ্ডব বাধায়। তার লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে। বাড়ির ডাক্তার তার পুরানো বন্ধু, সব সময়েই বলে, খাওয়া কমাও, রাগ কমাও। কিন্তু ডাক্তার আর ওষুধের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। বাহাদুরির লোভে সে আরো বেশি খায়, আরো বেশি চটে। উপেক্ষা করে মৃত্যুকে, মৃত্যুকে যে সে ভয় করেনা কথায় তা জাহির করতে একটুও সে কুণ্ঠিত নয়।

গ্রীষ্মের দুপুর, বেজায় গরম পড়েছে. ঠেসে মদ খেয়ে বাজারে একপ্রস্থ ঝগড়া করে এসেছে জাঁ-মিচেল। বাড়ি ফিরে এসে লেগেছে বাগানের কাজে। মাটি কোপাতে খুব আনন্দ বুড়োর। রোদে খালি-মাথায় মাটি কোপাচ্ছে একমনে, কিন্তু মনের মধ্যে লেগে আছে এখনো সেই ঝগড়ার ঝাঁজ—তাই রেগে-রেগেই মাটি কোপাচ্ছে বুড়ো।

বই হাতে নিয়ে বাগানে ঝোপের কাছে বসে আছে জাঁ-ক্রিসতফ, কিন্তু চোখ বইয়ের দিকে নয়। ঠাকুরদার মাটি কোপানো দেখছে, শুনছে ঝিঁঝিঁর আওয়াজ আর স্বপ্ন দেখছে। তার দিকে পিঠ করে নীচু হয়ে আগাছা তুলছে ঠাকুরদা। হঠাৎ দেখল ঠাকুরদা দাঁড়াল খাড়া হয়ে, আর অমনি দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটির উপর। হাসি পেল ক্রিসতফের, কিন্তু—ওকি, ঠাকুরদা যে আর উঠছেনা মাটি থেকে। ডেকে উঠল ক্রিসতফ, ছুটে গেল কাছে, আর প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকুনি দিতে লাগল ঠাকুরদাকে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল ক্রিসতফ। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, বুড়োর সেই মস্ত মাথা তুলতে চাইলে দু হাতে। কিন্তু কি ভারি সেই মাথা, আর তার দুই হাত কি ভীষণ কাঁপছে! চোখের দিকে তাকাল, উলটোনো শাদা চোখ—চীৎকার করে মাটির উপরেই মাথাটা শুইয়ে রাখল। ছুট দিল ক্রিসতফ—কণ্ঠে করুণ আর্তনাদ। কি হয়েছে—কে একজন জিগগেস করলে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা ক্রিসতফের, শুধু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বাড়ির দিকে। লোকটা ঢুকল বাড়িতে—পিছু-পিছু ক্রিসতফও অনুসরণ করলে। আস্তে-আস্তে ঘন হয়ে উঠল প্রতিবেশীর জনতা। পা দিয়ে ফুল মাড়িয়ে-মাড়িয়ে নীচু হয়ে তারা দেখতে লাগল ঠাকুরদাকে। দু-তিন জনে তুলে ধরল—ঐ তার ঠাকুরদা—দেয়ালের দিকে মুখ করে দু-হাতে মুখ ঢাকল ক্রিসতফ। তাকাতে ভয় করছে তবু পারছেনা না-তাকিয়ে। ঠাকুরদার বিশাল দেহ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে—বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা—আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল ক্রিসতফ। সমস্ত মুখে কাদা, রক্ত,—চোখ দুটো বিকট—আর্তনাদ করতে করতে আবার সে ছুট দিলে। এবার একেবারে সটান বাড়ি। রান্নাঘরে সবজি ধুচ্ছিল লুইসা, সেখানে সে এসে ছিটকে পড়ল। মাকে জড়িয়ে ধরে

অসহায়ের মত কাঁদতে লাগল। মা, ঠাকুরদা—আর বলতে হলনা, বুঝতে পেরেছে লুইসা। হাতের জিনিস খসে পড়ল হাত থেকে, বাড়ি ছেড়ে ছুট দিলে।

কাঁদছে জাঁ-ক্রিসতফ। তার ভাইয়েরা সব খেলা করছে। কি যে হল কিছুই ঠিক সে বুঝতে পাচ্ছে না। ঠাকুরদার কথা ভাবছেনা সে, যে সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য তার চোখে পড়েছে তাই মনে পড়ছে ঘুরে-ঘুরে। ভয় হচ্ছে আবার না সে-সব দৃশ্য দেখতে হয়।

সন্ধেবেলা, দুষ্টুমি করে-করে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে ছেলেগুলো, লুইসা ফিরে এল, সবাইকে নিয়ে চলল ঠাকুরদার বাড়িতে। খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাচ্ছে লুইসা, তাল রাখতে না পেরে আপত্তি করছে আর্নেস্ট আর রুডোলফ। চুপ করো—ধমকে উঠল লুইসা, এমন অদ্ভুত সেই স্বর যে ওরা সহজেই স্তব্ধ হয়ে গেল। কেমন একটা অজানা ভয় ঘিরে ধরল তাদের, বাড়ির ভিতরে ঢুকেই কাঁদতে সুরু করলে। রাত হয়নি তখনো। সূর্যাস্তের শেষ মুহূর্তগুলো ঘরের মধ্যে বিচিত্র আলো ফেলেছে—দরজার হাতলে, আয়নায়, আধো অন্ধকারে ভরা মাঝের ঘরটার দেয়ালে টাঙানো বেহালাতে। কিন্তু ঠাকুরদার ঘরে জ্বলছে একটি নিঃসঙ্গ মোম, তার দুর্বল শিখা নিবে-আসা দিনের আলোকে যেন ব্যঙ্গ করছে, আর স্পষ্ট করে তুলছে ঘরের সঞ্চীয়মান অন্ধকার। জানলার কাছে বসে শব্দ করে কাঁদছে মেলশিয়র। বিছানায় ঝুঁকে পড়ে দেখবার ছুতো করে কী যেন লুকোচ্ছে ডাক্তার। জাঁ-ক্রিসতফের বুকের ভিতরটা এমন কাঁপছে যেন ফেটে যাবে এখুনি। নতজানু করে ছেলেগুলোকে বিছানার পায়ের দিকে বসিয়ে দিলে লুইসা। লুকিয়ে একবার তাকাল ক্রিসতফ। ভেবেছিল বিকেলে যা দেখেছিল তেমনি ভয়াবহই কিছু দেখবে, কিন্তু, আরাম পেল, না,

তেমন ভয়ের কিছু আর নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে ঠাকুরদা। যেন মনে হল ঠাকুরদা ভাল আছেন। কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে যখন দেখল ফোলা মুখের উপর বিস্তৃত ঘা, আর ভারি নিশ্বাস শুনে যখন বুঝল যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগল ক্রিসতফ। তারপর মা যখন প্রার্থনা করতে বলল, ঠাকুরদার জীবন ভিক্ষা করো, তখন মনে মনে সে এই প্রার্থনাই করতে লাগল, যদি ঠাকুরদা আর ভাল হয়ে না-ই ওঠেন তবে যেন এখানেই তাঁর সব শেষ হয়। কি যে সত্যি হবে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পড়ার পর থেকে আর জ্ঞান হয়নি বুড়োর। একবারটি একটু চেতনা এসেছিল, সে শুধু তার অবস্থা সম্বন্ধে তাকে অবহিত করার জন্য। যাজক এসেছে, শেষ প্রার্থনার আবৃত্তি সমাপ্ত করল। বালিশের গায়ে তুলে ধরল বুড়োকে। বুড়ো আস্তে আস্তে চোখ মেললো, কিন্তু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকে তার সাধ্য কি। দৃষ্টিহীন চক্ষু দিয়ে সন্নিহিত মুখগুলোকে সে একবার দেখলে, দেখলে একবার আলোর দিকে, মুখ খুলে বলতে চেষ্টা করল, "শোনো, তারপর···" তারপর আর নিশ্বাস নেই, বাতাসে বলে উঠল, "আমি চললাম—"

সেই কাতর স্বরটা যেন জাঁ-ক্রিসতফের নিভৃত হৃদয়ে গিয়ে বিদ্ধ হল। এ কোন দিন সে ভুলতে পারবেনা। ঠাকুরদার মুখে আর কথা নেই, শুধু একটা অস্ফুট অসহায় গোঙানি। ঘনায়মান অন্ধকারে সরে যেতে যেতে শেষবারের মত আরেকটা আর্তনাদ করল ঠাকুরদা। ডাকলে—"মা!"

মা! মাকে ডাকছে! যন্ত্রনায় মাকে ডাকছে! কান্নাটা যেন দংশন করল ক্রিসতফকে। এমন অবস্থায় পড়লে ক্রিসতফও হয়ত মাকেই ডাকবে। কিন্তু সমস্ত জীবনে যে মার কথা সে বলেনি কোনো দিন

আজ এই শেষ আতঙ্কের মুহূর্তে তারই সে আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু না, ঐ দেখ, তাকাচ্ছে বুঝি ঠাকুরদা। তার নিরুদ্দেশ নিষ্প্রভ দুই চোখ ঘুরতে ঘুরতে ক্রিসতফের চোখের উপর এসে পড়ল, জলে উঠল মুহূর্তে। হেসে কি যেন বলতে চাইল মিচেল। লুইসা ক্রিসতফের হাত ধরে তাড়াতাড়ি টেনে আনল বিছানার পাশটিতে। ঠোঁট দুটো নড়ল একবার মিচেলের, মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে চাইল হয়তো—কিন্তু আর না, সব শেষ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। নেমে এল যবনিকা।

ছেলেপিলেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হল পাশের ঘরে। ওদের কথা আর ভাবতে হবেনা, নিজেদের কাজ করো এদিকে। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ক্রিসতফ দেখছে সেই ভয় ভীত মুখ, শুধু ভয় পাবারই আকর্ষণে। বিছানার উপর বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে ঠাকুরদা, গলা যেন কে দুধর্ষ হাতে চেপে ধরেছে, ক্রমশই বিবর্ণ বিশুষ্ক হয়ে হয়ে যাচ্ছে সে-মুখ। জলের ভুরভুরির মত সেই একটু শেষ নিশ্বাস, তারপর এই শীতল নিঃশব্দতা।

কান্না আর প্রার্থনা, চলছে নানান গোলমাল। এরই মধ্যে হঠাৎ এক সময় ক্রিসতফের দিকে নজর পড়ল লুইসার। বড় বড় চোখ মেলে মলিন মুখে তাকিয়ে আছে। অন্যমনস্কের মত ঘোরাঘুরি করছে এ-ঘর ও-ঘর। তার কাছে ছুটে গেল লুইসা। মা'র বাহুর মধ্যে ভেঙে পড়ল ক্রিসতফ, অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জেগে দেখল বিছানায় শুয়ে আছে। জর হয়েছে। নুয়ে পড়ে মা চুমু খাচ্ছে তাকে। কে যেন নিঃশব্দে হাঁটছে ঘরের মধ্যে, দূর থেকে যেন শোনা যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দ। কে জানে স্বপ্ন দেখছে নাকি?

চোখ চেয়ে দেখে গতিফ্রিদ বসে আছে বিছানায়। কি যেন একটা ঘটেছে, মনে করতে পারছে না ক্রিসতফ। কি ঘটেছে বলো তো? ও, হ্যাঁ—তখুনি আবার সুরু করল কাঁদতে।

"কি, কি হল ?"

"কাকা, কাকা" গতিফ্রিদকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগল ক্রিসতফ।

"বেশতো, কাঁদো—কাঁদোনা।" নিজেও কাঁদছে গতিফ্রিদ।

"কেঁদে খানিকটা যেন আরাম পেল ক্রিসতফ। কান্নার পরে এখন কথা

"না, কথা বলতে পাবেনা। কান্না ভালো, কথা নয়।"

তবু শুনবেনা ছেলে। বললে, "একটা, শুধু একটা কথা—

"কি ?"

"শুধু—শুধু – ঠাকুরদা এখন কোথায় ?"

"তিনি এখন ঈশ্বরের কাছে।"

এ শুনতে চাচ্ছেনা ক্রিসতফ। বললে, "সে কথা বলছি না। বলছি, ঠাকুরদা—ঠাকুরদার দেহটা এখন কোথায় ? এখনো কি আছে বাড়িতে ?'

"না। আজ তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। শুনতে পাওনি ঘণ্টা ?"

তবে, সত্যি সত্যিই কোনো দিন আর দেখতে পাবো না ঠাকুরদাকে ? আবার কান্না জুড়ল ক্রিসতফ।

কাঁদছে অথচ নিজেই সে অবাক হচ্ছে, গতিফ্রিদ তাকে বারণ করছে না, বাধা দিচ্ছেনা।

"আচ্ছা কাকা, আপনার ভয় করে না ?"

"না, ভয় কিসের ? এসব সহ্য করতেই হবে।

মাথা ঝাঁকাতে লাগল ক্রিসতফ।

"সহ্য না করে উপায় নেই। এ সব, উপরে যিনি বসে আছেন তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। তাঁর হুকুম মানতেই হবে আমাদের।"

"কখনো না। আমি তাকে ঘৃণা করি।" শূন্যে ঘুষি ছুড়ল ক্রিসতফ।

ভয়ে গতিফ্রিদ তাকে চুপ করতে বললে। হঠাৎ কি বলে ফেলেছে, ক্রিসতফের নিজের এখন ভয় করছে। গতিফ্রিদের সঙ্গে সঙ্গে সেও

প্রার্থনা সুরু করলে। কিন্তু রক্ত লাগল ফুটতে। মুখে যতই দীনতা আর সমর্পণের ভাব, মনে তত তপ্ত বিদ্রোহ, বিষাক্ত ঘৃণা। কে সে কুৎষিত সৃষ্টিকর্তা ?

দিন চলে যাচ্ছে। জাঁ-মিচেলের কবরের সদ্য-খোঁড়া মাটির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে বৃষ্টিস্নাত রাত্রি। গোড়ায় খুব কেঁদেছিল মেলশিয়র কিন্তু গত সপ্তাহে জাঁ-ক্রিসতফ তাকে মন খুলে হাসতে শুনেছে। যখন কেউ তার সামনে মৃত ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছে, মুখে একটা শোকের চেহারা আনছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই যেমন কথার ফোয়ারা তেমনি স্থূল অঙ্গভঙ্গি। মনে লেগেছে তার নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশিক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে থাকা তার ধাতস্থ নয়।

সব কিছু মেনে নেয় লুইসা। এ দুর্ভাগ্যও তেমনি মেনে নিল। তার দৈনিক প্রার্থনার তালিকায় আরেকটি প্রার্থনা সে জুড়ে দিলে। গোরস্থানে যায় সে রোজ আর সেই ঘাসের চাপড়াটুকুকে মনে করে যেন তার কত আদরের গৃহস্থালীর জিনিস।

গতিফ্রিদও আসে মাঝে মাঝে। একটি ক্রশ তৈরী করে নিয়ে আসে, কিংবা গোটাকয়েক ফুল যা জাঁ-মিচেল ভালবাসত। শহরেও যদি গিয়ে পড়ে কাজের ঝোঁকে তবু লুকিয়ে একবার আসে ঐ ঘুমন্ত তৃণাচ্ছাদনের পাশটিতে।

মাঝে মাঝে জাঁ-ক্রিসতফকে নিয়ে আসে লুইসা। বিশ্রী লাগে ক্রিসতফের এক তাল মাটির উপর ফুল আর গাছের কপট সাজগোজ। কিন্তু নিজের বিরাগ জানাবার তার সাহস নেই, এই বিতৃষ্ণাই যেন একটা অন্যায়, এও আবার অনুভব করে মনে-মনে। তার ভালো লাগেনা কিছুতেই। ঠাকুরদাদার মৃত্যুটা অহোরাত্র তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মৃত্যু যে কি, তা জানতে তার আর বাকি নেই,

মৃত্যুকে তার! ভয় নেই এতটুকু। কিন্তু মৃত্যুকে দেখেনি কখনো মুখোমুখি। আর, মৃত্যুকে যে প্রথম দেখে সে আবিষ্কার করে মৃত্যুর সে কিছুই জানেনা। শুধু মৃত্যুর কেন, জীবনেরও সে কিছুই জানে না। এক মূহূর্তে সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বুদ্ধিতে কিছুই কুলোয় না। মনে ভাবছ তুমি বেঁচে আছ, জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে —মুহূর্তে তাকিয়ে দেখ, কিছুই তুমি জানোনি, ভ্রান্তির কুয়াসার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ শুধু, সে কুয়াশায় দেখতে পাচ্ছনা সত্যের কঠিন-কুটিল ভ্রূকুটি। দুঃখের সঙ্গে দুঃখীর সম্পর্ক নেই, মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই শরীরের। মানুষের সাহিত্য মানুষের দর্শন—সব পুতুল-নাচ। যে জীবননির্ধারের জন্যে এত পরিকল্পনা সে জীবন ভেঙে পড়ছে দিনে দিনে।

রাত্রিদিন এই মৃত্যুর কথাই ভাবছে জাঁ ক্রিসতফ। মৃত্যুর মুহূর্তে সেই শেষ যন্ত্রণার ছবি তাকে আবৃত করে রেখেছে। শুনতে পাচ্ছে সেই ভয়াবহ নিশ্বাসের শব্দ। যখনই যা সে করছে, দেখতে পাচ্ছে ঠাকুরদাদাকে। সমস্ত প্রকৃতি বদলে গেছে, একটা ঠাণ্ডা কুয়াশা যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেই অন্ধ সর্বশক্তিমান কালপুরুষের মৃত্যুশীতল নিশ্বাস সে যেন তার মুখের উপরে স্পষ্ট অনুভব করছে! প্রলয়োন্মত্ত সেই মূর্তির হাতে পড়ে তার যেন কিছুই করবার নেই। কিন্তু তাতে সে দমবার ছেলে নয়, রাগে আর ঘৃণায় তার ভিতরে যেন একটা দাহ সুরু হয়েছে। কিছুতেই সে বশ মানবে না। অসম্ভবের দেয়ালে সে মাথা ঠুকছে, মাথা ভেঙ্গে গেলেও তার আসে যায় না কিছু। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বুঝতে পাচ্ছে সে দুর্বলতর। হোক, তবু সে ভাগ্যের বর্বরতা মেনে নিতে পারবে না, আমরণ ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করে যাবে।

চিন্তার ভার থেকে জীবনের দুঃখই ত্রাণ এনে দিচ্ছে। পরিবারের সর্বনাশ একা জাঁ-মিচেলই বোধহয় ঠেকিয়ে রেখেছিল, সেও চলে গেল,

সরে গেল প্রতিরোধ। চলে গেল সব চেয়ে শক্ত খুঁটি, চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে এল দারিদ্র্য।

সমস্ত কিছুর মূলে মেলশিয়র। কোথায় বেশি কাজ করবে, উলটে পড়ল গিয়ে মদের ঘূর্ণিপাকে। যেটুকু বিরুদ্ধশক্তি ছিল তাকে বাধা দিতে, তাও আর নেই। প্রায় রোজই রাতে ফেরে মাতাল হয়ে, সঙ্গে রোজগারের খুদকুড়াও অবশিষ্ট নেই। তারপর বাজনার গৎও ভুলে যাচ্ছে ক্রমশ। একদিন বদ্ধ মাতাল হয়ে গিয়েছিল এক ছাত্রের বাড়িতে, ফলে সবারই বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল মুখের উপর। শুধু বাপের নামের জন্যে অর্কেষ্ট্রাতে এখনো তাকে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে লুইসার ভয় কখন না জানি কেলেঙ্কারির জন্যে তাকে তাড়িয়ে দেয় অপমান করে।

মাঝে দু-তিন দিন আসেইনি কাজে। আর যখন আসে সে সব মূর্খ উত্তেজনার মূহূর্তে, এমন কথা নেই যা সে না বলে। আর বাজনা নিয়ে এমন কাণ্ড করে, সাধ্য নেই তাকে থামাতে পারে কেউ। কখনো বা বাজনার মধ্যেই অকারণে হেসে ওঠে। মজাদার হল্লোড়ে সে ওস্তাদ, সঙ্গীরা তাকে তাই এটায়-সেটায় প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সমস্ত প্রগলভতাটা জাঁ-ক্রিসতফের গায়ে এসে লাগে প্রহারের মত। এ লজ্জার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

জাঁ-ক্রিসতফ এখন প্রথম-বেহালায় এসেছে। এমন ভাবে এখন সে বসে যে ইচ্ছে করলে বাপের দিকে তাকিয়ে তাকে মিনতি করতে পারে, চুপ করো। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়না, তার কাতর দৃষ্টির কোনো দাম নেই। তার চেয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই ভালো হয়তো। কাজের মধ্যে মন ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু থেকে থেকে কানে এসে ঢোকে বাপের রসিকতা আর তার সঙ্গীদের হাসি। দুই চোখ

জলে ভরে ওঠে। নজর পরে বাজিয়েদের, করুণায় নরম দেখায় মুখগুলি। হাসির শব্দ স্তিমিত হয়ে আসে আচমকা, জাঁ-ক্রিসতফের সামনে আর তার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি মারেনা। কিন্তু তাদের এই করুণাটাও অপমানের মত এসে লাগে ক্রিসতফকে। সে জানে, সে চলে গেলেই তার বাপকে নিয়ে স্থরু হবে বন্য রসিকতা, স্থরু হবে তুমুল অট্টহাসি। সমস্ত শহরের ভাঁড় সেজেছে মেলশিয়র। তাকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছেনা, তাই যত যন্ত্রণা। বাজনার পর বাপকে সে নিজেই বাড়ী নিয়ে আসে, তার প্রলাপোক্তি সহ্য করে, হোঁচট লেগে রাস্তায় পড়ে না যায় তার ঝক্কি সামলায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। বাপকে সটান বাড়ী নিয়ে আসবার পর্যন্ত তার সামর্থ নেই। রাস্তার মোড়ে হঠাৎ মেলশিয়র বলে বসবে অমুক বন্ধুর সঙ্গে তার কাজ আছে—শত প্রতিবাদ-মিনতি করেও তাকে তার করণীয় থেকে বিচ্যুত করা যাবেনা। বেশী কিছু বলতে সাহস হয়না, যদি পিতৃত্বের গৌরবে রাস্তার উপরে মারধোর করে বসে! তা হলেই কেলেঙ্কারির চরম!

এমনি করে পা পিছলে পালাতে লাগল পয়সা। মেলশিয়র শুধু তার নিজের পয়সা উড়োচ্ছেনা, স্ত্রী আর ছেলের রোজগারও ফুঁকে দিচ্ছে। লুইসার শুধু কান্নাই সম্বল, প্রতিরোধ করার শক্তি নেই—স্বামী বলে দিয়েছে এ সংসারে কিছুই লুইসার নিজের বলে নেই, তাকে বিয়ে করে এক কাণা কড়িও স্বামী পায়নি। কিন্তু জাঁ-ক্রিসতফ বাঁধা দিতে আসে। কানের উপর ঘুসি খায়, পায়ের উপর লাথি, ছোট মুঠি থেকে পয়সাগুলি খসে খসে পড়ে। বয়স কত তখন ছেলেটার? বারো কি তেরো। হোক, আস্তে আস্তে জোয়ান হয়ে উঠছে সে, মারের বিরুদ্ধে সেও দু-একটা লাথি ছুঁড়ে বসে। কিন্তু বেশী কিছু অবাধ্যতা করার তার সামর্থ কই? মা আর ছেলে পরামর্শ করে

লুকিয়ে রাখে পয়সা। কিন্তু কোন ফাঁকে খুঁজে পেতে কি করে যে বার করে ফেলে মেলশিয়র, বুঝে উঠতে পারেনা।

তাও যেন যথেষ্ট নয়। বাপের থেকে যা সে পেয়েছে সব সে অকাতরে বিক্রি করতে থাকে। জাঁ-ক্রিসতফ তাই দেখে বিষণ্ণ চোখে, সব দামী দামী স্মৃতিচিহ্ন—বই, বিছানা, আসবাব, সুরশিল্পীদের প্রতিকৃতি। কিছুই বলবার সাধ্য নেই তার। একদিন, কি হল, জাঁ-মিচেলের পিয়ানোতে ঠোক্কর খেল মেলশিয়র; হাঁটুতে হাত বুলুতে বুলুতে বলতে লাগল, নিজের বাড়ীতে স্বস্তিতে ঘোরা-ফেরার জায়গা নেই, সব জঞ্জাল বিদেয় করব ঝেঁটিয়ে। কেঁদে উঠল জাঁ-ক্রিসতফ। ঠাকুরদাদার সব জিনিস এখন এ বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছে। খালি করে দেওয়া হয়েছে ঠাকুরদার বাড়ী। খালি না করে দিলে ও-বাড়ী বিক্রি হবে কি করে? ছেলেবেলায় কত সুখস্বপ্নের মুহূর্ত কেটেছে ও বাড়ীতে। পিয়ানোটা পুরোনো সন্দেহ নেই, স্বর ঘোলাটে হয়ে গেছে, বাজারে দাম বেশী মিলবে না নিশ্চয়ই। ক্রিসতফও আর বাজায় না ওটা, রাজকুমারের দৌলতে নতুন সুন্দর পিয়ানো পেয়েছে সে। তা হোক, যতই পুরোনো আর বাজে হোক, এ তার বন্ধুদের মধ্যে প্রিয়তম। এই এক শিশুকে সঙ্গীতের অফুরন্ত জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। তার ক্ষয়ে-যাওয়া হলদে চাবিতে আঙুল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে খুঁজে পেয়েছে সে ধ্বনি আর তার নিয়মের রহস্য। সব তার ঠাকুরদার কীর্তি—নাতির জন্য মেরামতিতেই মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে—এ তার কম গৌরবের নয়। যেন একটা পূজ্য পবিত্র বস্তু, এই পিয়ানো। রূঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, এ বিক্রি করবার কোন অধিকার নেই মেলশিয়রের। চুপ করো, ধমকে উঠল মেলশিয়র। জাঁ-ক্রিসতফ আর্তনাদ করে উঠল, এ তার নিজের জিনিস, কেউ যেন তার গায়ে হাত না দেয়।

পরদিন সব স্রেফ ভুলে গিয়েছে জাঁ-ক্রিসতফ। বাড়ী ফিরেছে শ্রান্ত হয়ে, কিন্তু মেজাজ বেশ হালকা। কিন্তু ছোট ভাইগুলির দুষ্টু-দুষ্টু চাউনি কেমন অদ্ভুত লাগছে। সবাই মনোযোগে পড়বার ভান করছে, আবার থেকে থেকে আড় চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে, আবার চোখে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে ডুবে যাচ্ছে বইর মধ্যে। ব্যাপার কি? দুষ্টুমি করে কিছু একটা তার অনিষ্ট করেছে নিশ্চয়ই। যাক্‌গে, যখন টের পাবো, আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দিয়ে দিবে গোটাকতক। তার চেয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলা যাক।

আগুনের সামনে বসে আছে মেলশিয়র। যা কোনোদিন হয়না, কণ্ঠস্বর স্নেহে কোমল হয়ে এল জাঁ-ক্রিসতফের, প্রশ্ন করলে, কী করলে কোথায় কাটালে সমস্ত দিন। বাবা মাথা নেড়ে নেড়ে প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আর ছোট দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে বুকের মধ্যিখানটা মোচড় দিয়ে উঠল ক্রিসতফের। ঘরের মধ্যে ছুটে গেল। যেখানটায় পিয়ানো ছিল সেখানটা শূন্য। যন্ত্রণাবিদ্ধের মত চেঁচিয়ে উঠল ক্রিসতফ। অমনি কানে এসে ঢুকল পাশের ঘরে ছোট ভাইদের চাপা হাসির শব্দ। রক্ত চলকে উঠল সমস্ত মুখে। পাশের ঘরে ঢুকলে দ্রুত পায়ে। বললে 'আমার পিয়ানো!"

যেন কিছুই জানেনা এমনি ভাবে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করলে মেলশিয়র। তাই দেখে ছেলেগুলি ফেটে পড়ল হাসিতে। জাঁ-ক্রিসতফের করুণ চাউনি দেখে ভারি মজা লাগল মেলশিয়রের, সেও হাসতে লাগল হো হো করে। কি করছে, যেন আর বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই ক্রিসতফের। পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপের উপর। চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে ছিল মেলশিয়র, আত্মরক্ষা করবার সময় পেলনা। সজোরে তার টুঁটি টিপে ধরল ক্রিসতফ, চীৎকার করে উঠল…"চোর! চোর!"

একটি ছোট্ট মুহূর্তমাত্র। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ক্রিসতফকে ছুঁড়ে ঠেলে দিল সামনের দিকে, কিন্তু ক্রিসতফ কিছুতেই ছাড়বেনা, মৃত্যুর মত আঁকড়ে আছে। আবার ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ছেলেকে, মাথা এসে জোরে ঠুকল দেয়ালে। জাঁ-ক্রিসতফ উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় সে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, গলা বুজে আসছে কান্নায়।

"চোর! চোর! তুমি সব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ, আমার আর মার জিনিস নিয়ে যাচ্ছ ডাকাতি করে। চোর কোথাকার! বিক্রি করে দিচ্ছ আমার ঠাকুরদাকে।"

মেলশিয়র উঠে দাঁড়াল আর জাঁ-ক্রিসতফের মাথা তাক করে তুলল উদ্ধত ঘুসি। দুই চোখে তীক্ষ্ণ ঘৃণা নিয়ে তাকাল ক্রিসতফ। রাগে সে কাঁপছে। কাঁপছে মেলশিয়রও। ছোট দুই ভাই কখন কেটে পড়েছে কোনদিকে। চীৎকারের পর এখন দোদুল্যমান স্তব্ধতা। এক মুহূর্ত। মেলশিয়র গুড়িয়ে গুড়িয়ে কি সব বলছে বিড় বিড় করে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিসতফ দাঁতে দাঁত লাগানো, সমস্ত শরীর নিটুট কাঠ। এক মুহূর্ত চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না বাপের চোখ থেকে।

"আমি চোর! আমি আমার পরিবারের জিনিস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি! আমার ছেলে তাই বলে। ঘৃণা করে আমাকে। এর চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল ছিল।"

গোঙানি থামলে পরেও ক্রিসতফ নড়ল না এক চুল। রুক্ষ গলায় বললে "আমার পিয়ানো কোথায়?"

"দোকানে।" ছেলের দিকে চোখ চেয়ে তাকাতে সাহস হচ্ছেনা। এক পা এগিয়ে এল ক্রিসতফ। বললে টাকা কোথায়?

যেন ভেঙে পড়ল মেলশিয়র। পকেট থেকে টাকা বের করে ছেলেকে দিয়ে দিলে। তক্ষুনি-তক্ষুনি দরজার দিকে এগিয়ে গেল ক্রিসতফ।

মেলশিয়র ডাকলে "ক্রিসতফ!"

ক্রিসতফ দাঁড়াল ! কাঁপা গলায় মেলশিয়র বললে, "বাবা ক্রিসতফ, আমায় ঘেন্না করিস নে।"

হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল ক্রিসতফ। কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল, "বাবা, বাবাগো—না বাবা, আমি তোমাকে ঘেন্না করি না আমার মনে এতটুকু সুখ নেই।"

দুজনে কাঁদতে লাগল সরবে। মেলশিয়র বললে "এ আমার দোষ নয়, আমি খারাপ নই। সত্যি, তাই সত্যি নয় ? আমি খারাপ নই, না রে ?"

প্রতিজ্ঞা করলে, আর কোনোদিন মদ খাবে না। বিশ্বাস হয় না ক্রিসতফের, তেমনি করে মাথা দোলায়। মেলশিয়র বলে টাকা হাতে এলেই তার কেমনতর হয়ে যায়, লোভ কিছুতেই সামলাতে পারে না। এক মুহূর্ত কি ভাবল ক্রিসতফ, বললে, "কিন্তু তুমি কি বুঝছনা বাবা—" আবার থেমে পড়ল।

"কি বুঝছি না ?"

"যে আমাদের লজ্জা করে—"

"কেন, কার সম্বন্ধে ?" যেন কিছুই জানে না এমন সারল্যের ভান করলে মেলশিয়র।

"তোমার সম্বন্ধে।"

মুখ ভেঙচে মেলশিয়র বললে, "ও কিছু না।"

জাঁ-ক্রিসতফ পরামর্শ দিলে সংসারের সমস্ত উপার্জিত অর্থ বাইরের কোনো বিশ্বস্ত লোকের হাতে এনে দিতে হবে—মেলশিয়রের টাকাও বাদ পড়বে না। সেই লোক দিনে দিনে বা হপ্তায় হপ্তায় প্রয়োজন মত কিছু-কিছু ফিরিয়ে দেবে বাবাকে। মেলশিয়রের মন এখন কিছুটা নরম হয়েছে, তাই এ প্রস্তাবে রাজি হতে বাধলনা। বরং উল্টে বললে, এখুনি সে ডিউককে চিঠি লিখে দিচ্ছে, তার প্রাপ্য পেনসন্

যেন এখন থেকে ক্রিসতফের হাতেই পৌঁছে দেওয়া হয়। বাবার এ হেন দীনতার ভঙ্গিতে রাজি হলনা ক্রিসতফ। কিন্তু মেলশিয়রের মন এখন একটা আত্মত্যাগের নেশায় মেতে উঠেছে, তাই সে বললে, না, লিখে দি। নিজের উদারতায় নিজেই সে মুগ্ধ হবার ভান করলে। কিন্তু কিছুতেই এমন চিঠি নিয়ে যাবে না ক্রিসতফ।

ঘরে ঢুকে সব শুনলে লুইসা কি ভাবে ঘুরে গেছে ঘটনার মোড়। চিঠির কথা শুনে সে রেগে উঠল। বললে, এর চেয়ে রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করাও ভাল। স্বামীকে সে কিছুতেই অপমানিত হতে দেবে না। স্বামীর প্রতি তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যে করেই হোক স্ত্রী ও সন্তানের স্নেহের বিনিময়ে জীবনে সে ক্ষতিপূরণ করবেই। শেষ অঙ্কে স্বরু হল মিলনের কোমল কাকলী। যে চিঠি মেলশিয়র ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছিল তা পড়ে রইল টেবিলে, সেখান থেকে উড়ে গেল কুলুঙ্গিতে আর সেখানেই চাপা রইল আপাতত।

কয়েকদিন পরে, ঘর দোর পরিষ্কার করতে করতে লুইসা পেল সেই চিঠি। ইতিমধ্যে মেলশিয়র আবার তার পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেছে; তাই এই চিঠিও কবে হারিয়ে গিয়েছিল মন থেকে। তবু, এখন এ চিঠি পেয়ে ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল না লুইসার, রেখে দিল লুকিয়ে। রেখে দিলে মাসের পর মাস। যদিও অসহ্য হচ্ছে যন্ত্রণা তবুও মন চাচ্ছে না এই চিঠির আশ্রয় নিতে। কিন্তু সেদিন যখন দেখল স্বামী জাঁ-ক্রিসতফকে মারছে আর তার পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছে তখন সমস্ত লজ্জা ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল লুইসার। ছেলেকে যখন নিরালায় কাছে পেল তখন সে-চিঠি তাকে সে বার করে দিলে। ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "যা।"

তবু বুঝি একবার দ্বিধা করল জাঁ-ক্রিসতফ। কিন্তু তাছাড়া আর উপায়ই বা কি? নইলে আর কি করে সংসারকে বাঁচানো যায়? ঘুরতে

ঘুরতে চলে এল রাজপ্রাসাদে। যে পথ হাঁটতে বিশ মিনিট লাগে তাই এখন এক ঘণ্টায় ফুরায় না। যা সে করছে তার লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দীর্ঘ দিনের দুঃখ ও নিঃসঙ্গতা থেকে যে অহঙ্কার জন্ম পেয়েছিল তাই এখন প্রকাশ্যে বাবার পাপের স্বীকৃতিতে যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। যা সে অন্যকে জানতে দিতে চাইত না তাই এখন সবাই দেখবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে মাটিতে। প্রায় কুড়ি বার সে ফিরে ফিরে গেল। শহর সে দু-তিন বার প্রদক্ষিণ করলে। রাজপ্রাসাদের কাছে এসে এসেই আবার সরে সরে যেতে লাগল। এ দুর্দিন শুধু তার একার নয়। ভাবতে হবে মার কথা, ভাইদের কথা। বাবা তাদের পরিত্যাগ করেছে, এখন বড় ছেলে হয়ে তারই কর্তব্য তাদের দেখাশোনা করা। এখন আর দ্বিধা বা অপমানের কথা নাই, নিজের লজ্জা চোখ মেলেই দেখতে হবে নিজেকে। সোজা ঢুকে পড়ল রাজপ্রাসাদে। সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছেই পালিয়ে যাবার জন্য পিছন ফিরলে। কিন্তু তখুনি খুলে গেল দরজা। কে যেন বেরিয়ে আসছে। অমনি ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। খোলা দরজাই যেন তাকে ডেকে নিলে।

অফিসের সবাই জানে ক্রিসতফকে। থিয়েটারের ডিরেক্টর মহামান্য ব্যারনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। ছোকরা এক টেকো কেরান হাত নেড়ে নেড়ে কাল রাতের নাচের বর্ণনা দিচ্ছে ক্রিসতফের কথা কানেই তুলছেনা। আবার প্রশ্ন করলে ক্রিসতফ, দেখা হওয়া কি সম্ভব হবে না? ব্যারন এখন খুব ব্যস্ত, বললে সেই কেরানি—তবে ক্রিসতফের যদি কোন দরখাস্ত থাকে, রেখে যেতে পারে. অন্য সব কাগজের সঙ্গে সইর জন্য এখুনিই পেশ হবে দরবারে। চিঠিটা ক্রিসতফ বাড়িয়ে ধরল কেরানির দিকে। কেরানি পড়লে, অস্ফুট আওয়াজ করলে বিস্ময়ে।

"তাই ভালো!" চোখ জলে উঠল কেরানির। "এই ঠিক ব্যবস্থা। এ অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল। জীবনে এর চেয়ে ভাল কাজ সে

আর করেনি কোন দিন। অমানুষ কোথাকার! এ সুবুদ্ধি ওর এল কোত্থেকে ?"

আঁৎকে উঠল কেরানি। হঠাৎ তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়েছে ক্রিসতফ। রাগে বলছে চেঁচিয়ে; "খবরদার! এ ভাবে অপমান কোরোনা বলছি।"

থমকে গেল কেরানি। সামলে নিয়ে বললে, "তোমাকে অপমান করছে কে? কিন্তু সবাই যা বলাবলি করে. তুমিও যা হয়তো সব সময়ে ভাবো তাই শুধু বলছিলাম—"

"না।" রুখে উঠল ক্রিসতফ।

"কিন্তু, জিগগেস করি, তোমার বাবা মদ খায় না ?',

"ও সব সত্যি নয়।"

"তাই যদি হবে তবে এ চিঠি লেখে কেন ?"

"লেখে—" কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না ক্রিসতফ, "আমি যখন মাসে মাসে আসিই মাইনে নিতে, তখন বাবার আবার আসার কি দরকার ? তার সময় কই ?"

কৈফিয়ৎটা নিজের কানেই কেমন বেসুরা শোনালো। চোখে বিদ্রূপ আর করুণা নিয়ে তাকাল কেরানি। হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠিটাকে দলা পাকাল ক্রিসতফ। চলে যাবার জন্য পা বাড়াল দরজার দিকে। কেরানি ছুটে এসে হঠাৎ তার বাহু বেষ্টন করলে। বললে, "দাঁড়াও, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বলেই সে চলে গেল ডিরেক্টরের অফিসে। জাঁ-ক্রিসতফ অপেক্ষা করতে লাগল, আর আর কেরানির চোখ তার দিকে বর্শা উচিয়ে আছে। ফুটতে লাগল তার গায়ের রক্ত। কি যে সে করছে বা কি তার করা উচিত

কিছুই সে দিশপাশ পাচ্ছে না। হুকুম আসবার আগেই পালিয়ে গেলে কেমন হয় ?

তখুনি ফিরে এল কেরানি। বললে, "ব্যারন তোমাকে ডেকেছেন।"

অগত্যা ঢুকতে হল অফিসে। গাল দুটো নির্মল কামানো, চিবুকে চোয়ালে দাড়ী, ঠোঁটের উপরে পুষ্ট গোঁফ, বসে আছেন ব্যারন। কি লিখছেন নীচু হয়ে। ক্রিসতফের দিকে তাকালেন একবার সোনার চশমার ফাঁক দিয়ে, কিন্তু লেখায় ছেদ আনলেন না।

"তারপর কি চাই তোমার ?"

"না হুজুর, আমাকে মাফ করুন। আমি ভেবে দেখলাম, আমার কোন দরকার নেই।"

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন ব্যারন। বললেন, "তোমার হাতের ঐ চিঠিটা আমাকে দেবে ?

ডিরেক্টরের চোখ ক্রিসতফের হাতের দিকে নিবদ্ধ, তবু কাগজের টুকরোটাকে দলা পাকাচ্ছে ক্রিসতফ। হয়তো বা নিজের অগোচরে। বললে, "দরকার নেই হুজুর, আর দরকার নেই।"

"তুমি দাও তো চিঠিটা।"

যন্ত্রচালিতের মতো চিঠিটা দিয়ে দিল ক্রিসতফ। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কাগজের টুকরোটাকে যথাসাধ্য মসৃণ করলেন ব্যারন। পড়ে একবার তাকালেন ক্রিসতফের দিকে। চোখে সহিংস আনন্দ নিয়ে বললেন প্রর্থনা মঞ্জুর হল।" বলেই অসমাপ্ত লেখা শেষ করতে বসলেন।

বিধ্বস্তের মত বেরিয়ে এল ক্রিসতফ।

"এতে অন্যায় কি ?" অফিসে এলে বললে সেই দয়ার্দ্র কেরানি। সে দিকে আর কান পাতলেনা ক্রিসতফ। চলে এল রাজপ্রাসাদের বাইরে। লজ্জায় সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে। মনে হল অন্যের সমবেদনার

মধ্যে কেমন একটা অবমাননা আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। বাড়ী ফিরে এল, মার প্রশ্নের উত্তরে চটা-চটা কথা বললে, যেন এ ব্যাপারে মারই ষোল আনা পাপ। বাবার কথা ভেবে অনুতাপে পুড়ে যেতে লাগল। সব কথা বলে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা নিতে হবে। মেলশিয়র বাড়ী নেই। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল ক্রিসতফ, কতক্ষণে বাড়ী ফেরে। যতই বাবার কথা ভাবছে ততই জ্বালা যেন শিখা বিস্তার করছে। তার বাবা দুর্বল কিন্তু দয়ালু, দুঃখী—সমস্ত পরিবার কর্তৃক প্রতারিত। বাবাকে সে মনে মনে দেবতা বানাচ্ছে—সিঁড়িতে জুতার শব্দ হল। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল, ইচ্ছে হল বাবার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহু মেলে। কিন্তু মেলশিয়র মাতাল হয়ে ফিরছে, মুখে বীভৎস কদর্যতা। ধীরে ধীরে ক্রিসতফ ফিরে গেল বিছানায়। হাসল মনে-মনে। ছলনার ছবি দেখছে চমৎকার।

কদিন পরেই কাণ্ডটা জানতে পেল মেলশিয়র। রাগে উন্মাদ হয়ে চলল সে রাজপ্রাসাদে, ক্রিসতফের কোন বিনতি-মিনতিই সে কানে তুললে না, একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ে তুললে। কিন্তু ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে আসতে হল, কি যে ব্যাপার সেখানে সত্যি ঘটেছে কাউকে দন্তস্ফুট করল না। সেখানে তাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, তোমার ছেলের মূল্যের জন্যেই তোমার পেনসন। তাই তার সম্বন্ধে আর কোন কেলেঙ্কারীর কথা যদি তাদের কানে আসে, তবে এই পেনসনটুকুও খসে যাবে। সুতরাং আত্মত্যাগের অহঙ্কারের মধ্যেই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হল মেলশিয়রকে।

কিন্তু বাইরে বলে বেড়াতে লাগল তার স্ত্রী ও সন্তানেরা তাকে নিঃস্ব, সর্বশূন্য করে ফেললে। যাদের জন্য সারা জীবন খরচ করে এল এখন তারাই তাকে ভিক্ষুক বানালে। ছেলের কাছে এখন হাত পাততে

হয়, আর ছেলে তাকে কঠিন চোখে পরীক্ষা করে, সত্যি কতটুকু তার প্রয়োজন। চৌদ্দ বছরের ছেলের চোখের সামনে সে ভয় পায়। দাঁড়াও আমিও এর প্রতিশোধ নেব। নীচ ছলনাতেও আমি পেছপা নই। ক্যাবারাতে গিয়ে ঠেসে মদ খেল মেলশিয়র, দাম দেবার বেলায় বললে, ধার রইল, ছেলে দেবে মিটিয়ে। অসহায়ের মত মেনে নিতে হয় ক্রিসতফকে, না মেনে নিলে শুধু কেলেঙ্কারি বাড়ানো ছাড়া আর কোনো সুফল নেই। বাপের এই কর্জ মেটাতে-মেটাতেই রিক্ত হয়ে যায় ক্রিসতফ। মেলশিয়র কাজের বার হয়ে গেল ক্রমে-ক্রমে, বেহালা বাজানোতে আর আগ্রহ নেই। মাইনেই যখন আর হাতে আসছে না তখন কী হবে বাজনায়? থিয়েটারে যাওয়াও সে কমিয়ে দিলে। ঘন ঘন ঘটতে লাগল অনুপস্থিতি। ক্রিসতফের অনুরোধ-উপরোধ অনর্থক হল, কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে মেলশিয়রকে

এখন এই চৌদ্দ বছরের ছেলেকেই প্রতিপালন করতে হবে তার পরিবার। তার বাবা-মা, তার ছোট-ছোট ভাইগুলি। সমস্ত সংসার-পরিজন। চৌদ্দ বছরের ছেলেই এখন সংসারের কর্তা।

* * * *

দুরূহ কর্তব্যের মুখোমুখি দাঁড়াল ক্রিসতফ। দাঁড়াল অসীম সাহসে। তার অহঙ্কার অটল হয়ে রইল, অন্যের থেকে কণামাত্র অনুগ্রহ সে নিতে পারবে না। যে করেই হোক দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে। পরের থেকে হাত পেতে ছোটখাটো করুণার দান মাকে সে নিতে দেখেছে ছেলেবেলা থেকে—দেখেছে আর কষ্ট পেয়েছে মনে-মনে। মাকে বলেওছে এই কষ্টের কথা। কারুর দয়ার উপহার পেয়ে মার যেখানে তৃপ্তি তার সেখানে দুঃখ। মার যেখানে জয় তার সেখানে হার। মা এর মধ্যে কিছুই অন্যায় দেখেনি, বরং সে দানের দামে ক্রিসতফের সামনে

সামান্য এক প্লেট খাবার ধরতে পেরেছে তাতেই তার প্রসন্নতার শেষ নেই। কিন্তু মুখ কালো করে গুম হয়ে বসে রয়েছে ক্রিসতফ, কথা কয় না কারু সঙ্গে, সেই খাবারের প্লেটে হাত ঠেকায়নি। বিরক্ত হয়েছে লুইসা, খাবারের উপরে রাগ কি, করেছে হয়তো বা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। তবু বিচলিত হয়নি ক্রিসতফ, খাবার পড়ে আছে খাবারের নামে। তখন আর বাগ মানতে চায়নি মেজাজ, রুক্ষ হয়ে অনেক নির্দয় কথা বেরিয়েছে লুইসার মুখ থেকে. প্রত্যুত্তরে ক্রিসতফও নীরব থাকেনি। ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে ক্রিসতফ। বাপ তাকে চালিয়াৎ বলে বিদ্রূপ করেছে, আর সেই খাবার ভাইরা খেয়েছে ভাগাভাগি করে।

কিন্তু এখন যে করে হোক জীবিকার্জন করা চাই। অর্কেস্ট্রা থেকে যা সে পায় তা অতি সামান্য। এখন সে বাজনার মাস্টারি সুরু করলে। মধ্যবিত্ত ঘরের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীও জুটে গেল। সকাল বেলা ঘুরে ঘুরে কটি মেয়েকে সে শেখাতে লাগল পিয়ানো। মেয়েরা বেশির ভাগই তার চেয়ে বয়সে বড়, আর হাব-ভাবে ফস্টি-নস্টিতে ওস্তাদ। বাজনাতে এেককটি আকাট মূর্খ, কিন্তু নয়নে ও বাক্যে বাণবর্ষণে তাদের ক্ষান্তি নেই। শেষকালে মাস্টারকেই সরাসরি উপহাস করতে থাকে। মুখ গম্ভীর করে নিজের চেহারায় সে একটা মর্যাদা আনতে চায় আর তার ছাত্রী চোখ বাঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। অমনোযোগের জন্যে কখনো-কখনো ধমকে উঠে ক্রিসতফ, আর ছাত্রী বলে, বাজনা না শিখিয়ে আর কিছু শেখালে কেমন হয়! দু-একটা লজ্জাকর প্রশ্ন করে বসে ছাত্রী, মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে ওঠে ক্রিসতফের। কখনো-কখনো বা ক্রিসতফকে ছোটখাটো ফুটফরমাস খাটতে বলে। উপায় নেই খাটতে হয় ক্রিসতফকে। তার কাজ যে মনোমত হয় না সহ্য করতে হয় সেই

সমালোচনা। শুধু কাজের নয়, তার চলন-বলন, তার হাত-পা তার লজ্জা-কুণ্ঠা—সমস্তই বিশ্রী।

সেই মাস্টারি থেকে সটান তাকে চলে যেতে হয় থিয়েটারের মহড়ায়। প্রায়ই খাওয়ার সময় হয় না। পকেটে করে এক টুকরো রুটি আর দু'টুকরো ঠাণ্ডা মাংস নিয়ে আসে, বিরতির সময় তাই খায়। কখনো-কখনো প্রধানের পদে বসে রিহার্সেল চালাতে হয় তাকে। তারপর আবার নিজের শেখা আছে। তারপর আসল অভিনয়। তারপরে আবার সন্ধ্যায় প্রাসাদে গিয়ে বাজনা। পুরো দু'ঘণ্টার কমে ছাড়ান নেই। রাজকুমারী আবার বাজনা-টাজনা ভালো বোঝেন বলে জাঁক করেন, কিন্তু কী যে ভালো আর কী যে মন্দ এ তারতম্য করার তার প্রতিভা নেই। তবু তা মানবে এমন বিনয়ের ধার সে ধারেনা। তাই ভালো জিনিস শুনবে বলে একটা মোটা জিনিসের সে ফরমাস করে বসে। তাই বাজাতে হয় ক্রিসতফকে। হাল্কা উচ্ছ্বাসভরা বাজনার দিকেই রাজকুমারীর ঝোঁক।

প্রায় মাঝরাতে ছুটি পায় ক্রিসতফ। দুই হাত জ্বলছে, মাথা ঘুরছে, পেট চোঁ-চোঁ করছে—এমন অবস্থায় বাড়ি ফেরে। বাইরে হয়তো বরফ পড়ছে, কিন্তু ঘামছে সে ভিতরে। শহরের প্রায় অর্ধেক হেঁটে তবে তার বাড়ি। দাঁতে দাঁত লেগে যায়, ইচ্ছে করে কোথাও শুয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু পা যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ কাঁদলে চলবে না। একটি মাত্র তার সান্ধ্য স্যুট, তাইতেই ভিজতে-ভিজতে পথ ভাঙে।

বাড়ি ফিরে আসে, ঢোকে তার নিজের ঘরে! তার নিজের ঘর। সে একলা তার মালিক নয়, তার ভাইরা তার অংশীদার। পোশাকটা খুলতে পর্যন্ত তার ইচ্ছে হয় না—তার এই যন্ত্রণার ফাঁস। বালিশে

মাথা রাখতে না রাখতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমটুকু যে আছে এই যেন তার পরম সান্ত্বনা।

কিন্তু ঘুম ভাঙলেই আবার সেই জীবিকার যুদ্ধ। বাজনা আর তার নিজের কাজ নয়, নয় নিজের সৃষ্টি, নয় নিজের উন্মোচন। শুধু একটা জীবিকার যন্ত্র, জীবিকার অস্ত্র। প্রভুর ফরমাশে তৈরি ব্যঞ্জন। প্রভুর শাসনে সরকারী ইস্তাহার।

তার জীবনের মূলই তবে বিষাক্ত হয়ে গেছে। যেন স্বপ্নেও সে আর স্বাধীন নয়। কিন্তু যত বন্ধন ততই সে মুক্তমানস। যতই সংকীর্ণ দেওয়াল ততই উদ্ধত বিদ্রোহ। যতই বাধা ততই উত্তালতা। বাইরে যতই দাসত্ব অন্তরে ততই স্বাধীনতার উত্থান। এত বাধা আছে বলেই যেন জীবন সুস্বাদু। যদি বাধা না থাকত তবে হয়তো স্বাচ্ছন্দ্যের স্রোতে ভেসে যেত ক্রিসতফ, বয়ে যেত কৈশোরের বদখেয়ালে। সমস্ত দিন-রাত্রির পরিসর থেকে দুটি একটি সংক্ষিপ্ত ঘণ্টা সে নিজের জন্যে কুড়িয়ে পায়—আর তার সমস্ত শক্তি সময়ের সেই সংকীর্ণ রেখা ধরে প্রবাহিত হয়, গিরিপথ দিয়ে যেমন ছুটে চলে বন্দিনী নদী। সেই অর্থে বন্ধনের বেদনা শুধু ভাবকে নয় ভঙ্গিকেও প্রভাবিত করে। শুধু মনকে নয় দেহকেও স্থৈর্য দেয়। যেখানে সময় পরিমিত ও চিন্তা যথামাত্র, সেখানে বেশি কথা বলার সময় কই? বাঁচবার সময়ই যেখানে কম, সেখানে যতটুকু সময় পাও দ্বিগুণ মাত্রায় বাঁচো।

তাই এখন ঘটেছে ক্রিসতফের জীবনে। জোয়াল কাঁধে নিয়ে বুঝতে পেরেছে সে মুক্তির আসলে মূল্য কি, তাই বাজে কথায় বা বাজে কাজে সে তার প্রিয়তম মুহূর্ত কটি অপব্যয় করতে নারাজ। উচ্ছ্বসিত আবেগে অফুরন্ত তার লেখবার অভ্যেস, এখন চিন্তার চাপে পড়ে সে আবেগ সংশোধিত হচ্ছে। এখন সে বুঝতে পারছে সঙ্গীত হচ্ছে একটা

শুদ্ধ, যথার্থ ভাষা, সেখানে প্রত্যেকটি ধ্বনি বিশেষ অর্থান্বিত—তাই যে সঙ্গীত শুধু আওয়াজ করে, কোনো কথা বলে না, তার উপর তার নিদারুণ ঘৃণা।

তাই যে-সমস্ত স্বরলিপি সে রচনা করছে কিছুতেই সে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করতে পারছে না, এখনো সে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করতে পারেনি নিজেকে। জীবনে যে সব অনুভব সে অর্জন করেছে তারই মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজছে একান্তে। তার গভীরতম অস্তিত্বের সঙ্কেতই সে খুঁজে পায়, কিন্তু কবে আসবে সেই দুরন্ত উন্মাদনা যাতে উড়ে যাবে সব কাপট্যের মায়াজাল? যে আকাশ বজ্রদীর্ণ সেখানে কুয়াশা কোথায়? বিচিত্র স্মৃতির সঙ্গে অস্পষ্ট কল্পনা এসে মেশে—তবু কিছুতেই মুক্তি নেই এই মিথ্যা থেকে, এই দাসত্ব থেকে। যা সে বলতে চাচ্ছে, কিছুই লিখতে পাচ্ছে না। চিরকালই কি এই অক্ষমতা এই ব্যর্থতা তাকে পরাভূত করে রাখবে? কিছুতেই না, এই মূর্খ নৈরাশ্যের কাছে নতি মানবে না সে কিছুতেই। কিন্তু, তবু কবে সে লিখতে পাবরে ভালো জিনিস? কোথায় সেই বড়ো বিষয়? চকিতে সেই কল্পনা বোধহয় মূর্তি নেয়, কিন্তু লেখার পর পড়ে দেখে, এ একেবারে অর্থহীন। ছিঁড়ে ফেলে লেখাটা, পুড়িয়ে ফেলে। বরং যেগুলি তার সরকারী লেখা, যেগুলি অত্যন্ত বাজে, তাই সে জমিয়ে রাখে—রাজকুমারের জন্ম-দিনের জন্যে যেটা লেখা, যেটা লেখা রাজকুমারীর বিয়ের উপলক্ষে। অনাগত কালের জন্যে তার এই সব অক্ষমতাই বেচে থাকবে! অনাগত কালে বিশ্বাস করে ক্রিসতফ। তাই ব্যর্থতায় কাঁদতে বসে নিরালায়।

কী সব প্রাণান্তকর দিন যাচ্ছে! এতটুকু বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই—কিছু সৃষ্টি করবার নেই, এই উন্মাদ পরিশ্রম থেকে বিচ্ছেদ নেই কোনো-খানে—না খেলাধুলো, না বা বন্ধুবান্ধব। বিকেলবেলা আর সব ছেলেরা

যখন খেলছে, ক্রিসতফ সেই অল্প আলো-জ্বালা থিয়েটারের ধুলোভরা কোণটিতে অর্কেষ্ট্রায় এসে বসেছে, সমস্ত মুখে মনোযোগের যন্ত্রণা। সন্ধ্যায় যখন ছেলেরা শুয়ে পড়েছে বিছানায় তখনো সে তেমনি চেয়ারে বসে, সমস্ত শরীর শ্রান্তিতে অবনত।

ভাইয়েদের সঙ্গেও ভাব নেই। তার পরের ভাই আর্নেস্ট, বারো বছরের। যেমনি দুরন্ত তেমনি বদমাস, আবার অবাধ্য। পাড়ার নোংরা ছেলেদের সঙ্গে মিশে নোংরা সব অভ্যেস আয়ত্ত করেছে। পরের জন রুডলফ, খুড়ো থিয়োডোরের খুব প্রিয়—শুনছি ব্যবসায় গিয়ে ঢুকবে। শান্ত, কর্মঠ বটে কিন্তু ধূর্ত। সে নিজেকে ক্রিসতফের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান মনে করে, তাই সে বাড়িতে ক্রিসতফের আধিপত্য মানতে রাজি নয়। যদিও দাদার জোগানো খাবার খেতে তার অরুচি নেই। কোন ভাইরই টান নেই গান বাজনায়। থিয়োডোরকে নকল করে রুডলফ বরং গান বাজনাকে ঘেন্না করার ভাব দেখায়। ছোট দু'ভাই মাঝে মাঝে বড় ভাইর শাসন-আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওঠে, কিন্তু ক্রিসতফের হাতের থাবা যেমন প্রচণ্ড তেমনি সজাগ তার বিচার-বুদ্ধি। তাই ঘুসি খেয়ে ছোট দু' ভাই মাটিতে ঘুরে পড়ে। কিন্তু তাহলে কি হয়, ক্রিসতফকে অমান্য ও অপমান করতে ছাড়ে না। মিথ্যাবাদী বলে গাল দেয় আর দাদার জন্যে এমন সব ফাঁদ পাতে, যাতে দাদা ঘায়েল হয় অনায়াসে। ডাহা মিথ্যে অজুহাতে ক্রিসতফের থেকে তারা পয়সা আদায় করে আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে কলা দেখায়। ক্রিসতফকে ঠকানো খুবই সোজা। সে স্নেহের কাঙাল, আর একটু স্নেহ পেলেই সে ভুলে যেতে পারে মনের সমস্ত রাগ-দ্বেষ। একটু ভালবাসা পেলে ছোট ভাইদের সে ক্ষমা করতে পারে সহজেই। সেদিন দু'ভাই ভালোবাসার ভান করে তাকে জড়িয়ে ধরল, স্নেহের সেই

আতিশয্যে চোখে জল এল তার। কিন্তু পর মুহূর্তেই টের পেল রাজকুমারের উপহার দেওয়া সোনার ঘড়িটা তারা চুরি করে নিয়েছে। শুধু চুরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার সরলতাকে উপহাস করছে। নিজের উপরেই নিদারুণ রাগ হয় ক্রিসতফের—এই স্নেহের জন্যে কাঙালপনার বিরুদ্ধে। ইচ্ছে করে ভাই দুটোকে মেরে থেঁৎলে দেয়। কিন্তু বারে-বারেই স্নেহের ফাঁদে পা দেয়, আর বারে-বারেই বঞ্চিত হয়।

তা ছাড়া আরো আছে যন্ত্রণা। পড়শীদের কাছে বাবা তার অখ্যাতি করে বেড়ায়। আগে তার সম্বন্ধে যা নিয়ে বাবা গর্ব করত এখন তাই হেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবাও কি হিংসে করছে তাকে? না, কাঁদবে না ক্রিসতফ, রাগ করেও লাভ নেই। চুপ করে থাকাই ভালো। হৃদয়ে ঘা থাক, তবু মুখে যেন না আসে কু-কথা।

পারিবারিক সান্ধ্যভোজের সময় বিষণ্ণ আলোর চারদিকে বসে সেই সব মূর্খ জটলা। যাদের সে ঘেন্না করে, আবার করুণাও করে, তাদেরই খাওয়ার শব্দ শোনে, দেখে তাদের চোয়ালের নড়া-চড়া। শুধু তার সাহসিকা মার সঙ্গেই তার যা কিছু স্নেহবন্ধন। কিন্তু লুইসাও সমস্ত দিনের খাটুনিতে হা-ক্লান্ত, সন্ধের দিকে মুখে আর কথা ফুটেতে চায় না, আর রাত্রের খাওয়ার পরেই সেলাই করতে-করতেই ঘুমিয়ে পড়ে চেয়ারে। আর সে এত ভালো, ছেলেদের প্রতি ভালোবাসায় তার এতটুকু তারতম্য নেই। মনটা কোথায় খিঁচ খায়, ক্রিসতফের মনে হয়, যে বিশ্বাসী একটি বন্ধুকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে নেই তার মার মধ্যে।

তাই সে নিজেকে নিয়েই নির্জন। দিনের পর দিন সে কথা কয়না একটাও, একটা চাপা রাগের মধ্য দিয়ে কাজ করে যায়, নিজেকে পরিশ্রমে বিধ্বস্ত করে ফেলে। শরীর ভেঙে পড়ল

ক্রিসতফের ! তার কী সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর ছিল, আর এখন তা কী হতে চলেছে ! ঘুম আসে না, আর ঘুম এলেও ঘুমের মধ্যে কাঁদে, হাসে, কথা কয়। কখনো কখনো মাথা ধরে, ঠিক মাথার উপরে মনে হয় একটা ভার চাপানো। চোখ জ্বালা করে, মনে হয় চোখের মধ্যে ছুঁচ ফুটছে। একেক সময় কি রকম ঘুরে যায় মাথাটা, বইর অক্ষরগুলো ঝাপসা ঠেকে, মিনিট দুই চুপ করে বসে থাকার পর সেই ফাঁকা ভাবটা ঠিক হয়ে আসে। যা সে খেতে পায় তাতে তার খিদে মেটে না, আর তা অত্যন্ত বাজে আহার—তারি ফলে নিত্যি তার পেটের অসুখ। কিন্তু সব চেয়ে তাকে বেশি জব্দ করেছে তার হার্ট। ঠিক যেন তাল মেপে চলছেন। মাঝে মাঝে এমন বেধাপ্পার মতো লাফিয়ে ওঠে মনে হয় যেন এখুনি ফেটে যাবে ; আবার কখনো শব্দ এমন মিহি শোনায় যেন এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। শরীরের তাপও খামখেয়ালীর মতো ওঠা-নামা করছে। কখনো জ্বরের কাছাকাছি কখনো একেবারে শীতের গা ঘেঁসে। এই পুড়ছে এই আবার কাঁপছে হি-হি করে। গলা শুকিয়ে গেছে, কি যেন একটা ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে, নিশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। স্বভাবতই তার কল্পনায় রঙ চড়তে লাগল। বাড়ির কাউকেই সে কিছু বললে না, শুধু আপন মনে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দেখতে লাগল সে অসুখ-গুলো। মনে ধারণা হল, একটার পর একটি সব অসুখগুলোই তার হয়েছে পর-পর। অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, বমির ভাব যখন নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে পড়ে শেষ হয়ে যাবে রাস্তায়। অকালে মরে যাবে সে, রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া হবে তাকে এই ভাবনাই তাকে পেয়ে বসল। আচ্ছন্ন করে ধরল, প্রতি মুহূর্তে ফিরতে লাগল পায়ে পায়ে। যদি মরতেই হয় তাকে, আহা, এখন নয়—অন্তত ততক্ষণ নয় যতক্ষণ না সে পেয়েছে জয়ের আস্বাদ।

জয়! এই বিস্বাদ জীবনের সমস্ত শ্রান্তি সমস্ত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও যে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ঠেলে নিয়ে চলেছে এখনো। একদিন যা সে হবে তারই অস্পষ্ট আভাস যেন ছায়া ফেলে থেকে-থেকে। এখন কী সে হয়ে আছে তা ভেবেও সে যেন সম্পূর্ণ নিরাশ হয় না। এখন সে একটা রুগ্ন ভীরু ছেলে, অর্কেস্ট্রায় বসে বেহালা বাজায় আর বাজে-মার্কা গান বাঁধে। না, তার চেয়ে ভিতরে-ভিতরে সে অনেক বড়ো। এ সব তো একটা বাইরের মলাট, একটা ক্ষণিক ছলনা। এটা তার আসল স্বরূপ নয়। তার মুখের ছাঁদ বা তার আজকের ভাবনার ধারার সঙ্গে তার আসল স্বরূপের কোন মিল নেই। এ সে বুঝতে পারছে স্পষ্ট। যখন সে আয়নায় নিজের দিকে তাকায়, নিজেকে সে চিনতে পারে না। ঐ চওড়া লাল মুখ, মোটা ঘন ভুরু, গর্তে-ঢোকানো ছোট-ছোট চোখ, চ্যাপটা বোঁচা নাক,—সমস্ত একটা মুখোস, কুৎসিত মুখোস—তার থেকে একেবারে আলাদা, কোনো একজন বিদেশী লোক হয় তো অচেনা। তেমনি তার লেখাও তার নিজের ভাষা নয়, নিজের কথা নয়, আর কারুর। যা সে আছে বা যা সে করছে এ সব কিছু নয়—তবু একদিন যে সে করবে আর হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একেক সময় মনে হয় ঐ নিশ্চয়তা প্রকাণ্ড একটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়। তখন সে নিজেকে আবার শাস্তি দেয়, ক্লেশে আর অপমানে জর্জর করে ফেলে। তবু সেই নিশ্চয়তা টিকে থাকে, ভেঙে পড়ে না কিছুতেই। যা সে করে বা ভাবে কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। একদিন সে প্রকাশিত হবে—আজ নয়, কাল; বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতে। সে হবে! একটা বিশ্বাসের আলোয় তার নেশা ধরে যায়। যদি এই রূঢ় 'আজ' তার পথ আর না আটকায়! যদি ধূর্ত ফাঁদ পেতে তাকে না প্রবঞ্চিত করে!

দিন-রাত্রির সমুদ্র ভেদ করে নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রিসতফ, ডাইনে-বাঁয়ে কোথাও দৃষ্টি নেই, নিশ্চল হয়ে বসে আছে হাল ধরে, শুধু পারের দিকে বন্দরের দিকে একলক্ষ্য হয়ে। বাচাল বাজিয়েদের মধ্যে বসে অর্কেষ্ট্রায় বাজনা বাজাচ্ছে বটে, রাজপরিবারের আনন্দের জন্যে, কী বাজাচ্ছে ভগবানই জানেন—কিন্তু সমস্ত চেতনা আবিষ্ট হয়ে আছে নিভৃত একটি ভবিষ্যতের স্বপ্নে। হায়, সে স্বপ্ন বুঝি মৃদু আঘাতেই ভেঙে পড়ে! সে স্বপ্ন বুঝি বাঁচে না!

পুরোনো পিয়ানোটি নিয়ে বসেছে সে বাড়িতে একলা। রাত নেমে আসছে। মুমূর্ষু দিনের আলো লেগেছে বুঝি সুরের গায়ে। স্বরলিপির বইর থেকে মৃত হৃদয়ের স্নেহের সুগন্ধ ভেসে আসছে। মন ভরে যাচ্ছে ভালোবাসায়। দুই চোখ জলে ভরে ওঠে ক্রিসতফের। মনে হয় কে একজন ভালোবাসার লোক যেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, গরম নিশ্বাস যেন আদরের মত পড়ছে তার গালে, যেন গলা ঘিরে কার দুটি লতানো বাহু। চমকে পিছন ফিরে তাকায় ক্রিসতফ। সে স্পষ্ট অনুভব করে ঘরে সে একলা নয়। যে ভালোবাসে আর ভালোবাসা পায় সেই যেন তার কাছে দাঁড়িয়ে। দেখতে পায় না তাকে, কান্নার শব্দ করে ওঠে ক্রিসতফ—কিন্তু তার সমস্ত যন্ত্রণার উপরে কি একটি মাধুর্যের প্রলেপ-স্পর্শ! দুঃখেরও বুঝি আনন্দ আছে, অন্ধকারেরও আলো। মহাপ্রস্থিত প্রতিভাবানদের কথা মনে পড়ে—তার সমস্ত হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—যে প্রেম প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁদের অপূর্ব সুরতরঙ্গে। কী অলৌকিক আনন্দে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ ছিল তারই স্বপ্নে বিভোর হয় ক্রিসতফ—সেই আনন্দেরই প্রতিচ্ছায়া সে দেখতে পায় তাঁদের রচিত সুরছন্দে। সেই সব সুর যেন ঈশ্বরের মত হেসে তার সমস্ত দুঃখ হালকা করে দিচ্ছে। সেও কি একদিন ঐ ঈশ্বরের মত হাসতে পারবে? ছড়িয়ে দিতে পারবে আনন্দের উষ্ণতা? মুছে দিতে পারবে বিষাদের অন্ধকার?

কবে আসবে সেই উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ?

[দুই]

অটো

রাইন-নদীর উপর দিয়ে স্টিমারে করে যাচ্ছে ক্রিসতফ, কাছেই এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে। ঘন্টাখানেকের রাস্তা। ডেকের উপর তারই সমবয়সী একটি ছেলে বসে আছে চুপচাপ। সেও চলেছে বুঝি কোথাও। কোনোদিকে না তাকিয়ে ক্রিসতফ তার পাশে বসে পড়ল। কিন্তু ছেলেটির চোখ আর ফেরে না তার থেকে। বাধ্য হয়েই তাকাতে হল ক্রিসতফকে। সুন্দর ছেলে, টকটকে গোলাপী গাল, বাঁকা সিঁথি কাটা, আর উপর-ঠোটের উপর সরু করে গোঁফের তুলি টানা। আসলে কচি ছেলে কিন্তু ভাবে ভারিক্কি হবার চেষ্টা করছে। সাড়ম্বরে পোশাক পরেছে—ফ্লানেলের স্যুট, হাতে পাতলা দস্তানা, শাদা জুতো আর ফিকে নীল রঙের টাই—আর সবচেয়ে মজার, হাতে ছোট একটি লাঠি। ঘাড় সিধে রেখে চোখের কোণ থেকে সে তাকাল ক্রিসতফের দিকে, আর যেই ক্রিসতফ তাকালো তার দিকে, সে লজ্জায় আকর্ণ লাল হয়ে উঠল, পকেট থেকে খবরের কাগজ বের করে তাতে ডুবে যাবার ভাব করলে। হঠাৎ, ক্রিসতফের টুপি পড়ে গিয়েছিল, সে ঝটকা মেরে নিচু হয়ে তাই তুলে দিলে পলকে। সৌজন্যটা ক্রিসতফের কাছে বিস্ময়কর মনে হল। আবার সে তাকাল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি আবার লাল হল লজ্জায়। একটু ঝাঁজ মিশিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিলে ক্রিসতফ, কেননা এমন সাড়ম্বর শিষ্টাচার সে পছন্দ করে না—তাছাড়া তার নিজের নিঃসঙ্গতায়

কেন এই অকারণ হস্তক্ষেপ? তবু, যাই বলুক, মনে-মনে সে প্রসন্ন।

কে ভাবে ঐ ছেলের কথা—বাইরের দৃশ্যে চোখ মগ্ন হল ক্রিসতফের। কতদিন পরে এই প্রথম সে শহর থেকে মুক্ত হয়েছে—তাই মুখে লাগছে যে মুক্ত হাওয়া, তা একটি তীব্র স্বাদের মত ভালো লাগছে, ভালো লাগছে জলের শব্দ, ভালো লাগছে এই জলের শীতল প্রসার, ভালো লাগছে তীরের উপরে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। আধখানা জলে ডোবা উইলো-গাছ, কোমলাভ আঙুর-লতা, পুরানো দিনের পাহাড়, মাথা-উঁচু-করা মিনারওয়ালা শহর, কারখানার জাঁদরেল চিমনি—কালো কালো-ধোঁয়া ছাড়ছে অনর্গল। আনন্দে আত্মহারার মত উৎসুক হয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছে সব ক্রিসতফ। সেই সহযাত্রী ছেলে একটু ভয়ে-ভয়ে একটু বা আস্তে-আস্তে দুটি একটি ঐতিহাসিক বিবরণ আওড়াচ্ছে—ঐ ভগ্নস্তূপের মানে কি, কেন ওর গায়ে এখন আইভি-লতার আভরণ? নিজের মনে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে সেই ছেলে। ক্রিসতফের কৌতূহল চাঙ্গা হয়ে উঠল, একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল সেই ছেলেকে। নিজের বিদ্যে জাহির করতে পেরে ছেলেটির খুশির আর শেষ নেই। কিন্তু যখনই সোজাসুজি কোনো প্রশ্ন জিগ্‌গেস করছে ক্রিসতফকে, অমনি তাকে সসম্মানে সম্বোধন করছে বেহালা-বাদক বলে।

"তুমি আমাকে চেন?" লাফিয়ে উঠল ক্রিসতফ।

'হ্যাঁ, চিনি বৈ কি।' এমন সরল সপ্রশংসভাবে ছেলেটি বললে, যে ক্রিসতফের অহঙ্কারে সুড়সুড়ি লাগল।

তারপর শুরু হল তাদের কথা। জাঁ ক্রিসতফকে ছেলেটি বহুবার দেখেছে থিয়েটারে, আর যত সে দেখেছে আর শুনেছে তার সম্বন্ধে, ততই ছেলেটির মন ঝুঁকেছে তার দিকে। সে কথা অবিশ্যি মুখে কিছুই

বললে না, কিন্তু জাঁ-ক্রিসতফ টের পেল এই অহেতুক হৃদয়ের উত্তাপ, টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। এ রকম উৎসুক শ্রদ্ধার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি এর আগে। যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছে তার ইতিহাস কি তাই ক্রিসতফ জিগ্গেস করলে সহযাত্রীকে। সহযাত্রী তার বিদ্যের পিপের মুখ খুলে ধরল। যাই বল, ছেলেটা জানে কিন্তু এক রাজ্যি, ক্রিসতফ মনে-মনে প্রশংসা না করে পারলে না। কিন্তু কথাবার্তা বলবার ঐ কেবল একটি বিষয়—ঐ স্থানীয় ইতিহাস। সমস্ত সংসারে তার নিজের যেন কিছুই বক্তব্য নেই।

শুধু পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে এই যেন তাদের অনেক। সরাসরি মুখোমুখি কোন প্রশ্ন নেই, তেমনিভাবে এগোতেও কেমন সঙ্কোচ। শুধু থেকে-থেকে দমকা প্রশ্নোত্তর, আবার হঠাৎ অনড় স্তব্ধতা। এভাবে কতক্ষণ চালাবে? শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনে। জাঁ ক্রিসতফ জানল, তার বন্ধুর নাম অটো দিনার, শহরের প্রকাণ্ড এক সদাগরের পুত্র। দেখা গেল এমন লোক অনেক আছে—যাদের সঙ্গে তাদের দুজনেরই সমান আলাপ, আস্তে-আস্তে খুলে গেল মুখ, যেন অনেকটা নিরাপদ এলেকায় তারা চলে এল। স্টিমার এসে লাগল ঘাটে যেখানে ক্রিসতফ এবার নামবে। একি, অটোও দেখি এখানে নামছে। অবাক হয়ে গেল ক্রিসতফ। তবে চলো একসঙ্গে হাঁটি দুজনে। যতক্ষণে খাবার সময় না আসছে।

মাঠ ভেঙে চলল দুজনে। অটোর বাহু কখন নিজের বাহুর মধ্যে টেনে নিয়েছে ক্রিসতফ, তাকে বলছে তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। যেন জন্ম থেকে তার সঙ্গে তার চেনা। কোনোদিন সমবয়সী ছেলের সঙ্গ পায়নি, তাই এই ছেলেটির সংস্পর্শে অবর্ণনীয় আনন্দ হচ্ছে ক্রিসতফের। বেশ শিক্ষিত শিষ্টাচারী ছেলে, তারপরে তার প্রতি কী সস্নেহ সহানুভূতি!

সময় চলে যাচ্ছে, কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে কিছু খেয়াল নেই ক্রিসতফের। কিশোর সুর-শিল্পীর সাহচর্যে এত মশগুল যে দিনারেরও বলতে মন চাচ্ছে না যে খাবারের ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু যাই হোক এবার জানাতে হয়। বনের মধ্যে ক্রিসতফ তখন একটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে, আর বলছে, একেবারে চূড়ায় এসে ওঠা চাই। চূড়ায় উঠতে হল অগত্যা। চূড়ায় উঠে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল ক্রিসতফ, এমন ভাব যেন সে সারাদিন এমনিই শুয়ে থাকবে। আর কতক্ষণ থাকা যায় না বলে!

দিনার বললে, 'খেতে যাবে না?'

তখন শরীর পরিপূর্ণ প্রসারিত করে দিয়েছে ক্রিসতফ। বললে, 'কী হবে সেখানে গিয়ে?'

অটোর মুখে উদ্বিগ্ন ভাব ফুটে উঠতেই হেসে ফেলল ক্রিসতফ। বললে, এইখানেই বেশি সুখ। আমি যাবনা। ওরা বসে থাক আমার জন্যে।

ওঠবার ভঙ্গি করল ক্রিসতফ।

বললে, "তুমি খুব ব্যস্ত আছ? নও? তবে এক কাজ করি চলো। চলো একসঙ্গে দু'জনে খাই। আমার জানা-শোনা এক সরাই আছে।"

অনেক আপত্তি ছিল দিনারের। তার জন্যে কেউ বসে আছে সে-জন্যে নয়, কিন্তু এমনি কোনো বিষয়ে মন স্থির করাই তার কঠিন। সব সময়ে সে নিয়মের বশবর্তী, আগে থেকে বলা-কওয়া না থাকলে কিছুতেই সে চট করে তৈরি হতে পারে না। কিন্তু জাঁ-ক্রিসতফের অনুরোধের স্বরটি এমনভাবে এসে বাজল, সাধ্য নেই যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ক্রিসতফ যেন তাকে তুলে টেনে নিয়ে চলল, তারপর তারা ডুবে গেল কথোপকথনে।

সরাইয়ে এসে নিভে গেল সব ঔৎসুক্য। প্রশ্ন উঠল, কে এই খাওয়ার খরচ দেবে। কে নেবে এই সম্মানের শিরোপা। দিনার বললে, আমি দেব, কেননা আমার অবস্থা স্বচ্ছল। ক্রিসতফ বললে, আমি দেব, কেননা আমি গরিব। দিনার তার দৃপ্ত কর্তৃত্ব জাহির করতে চাইল খাবারের ফরমাস করে। ক্রিসতফও পালটা জবাব দিলে আরো কয়েকটা দামী ও বিলাসী প্লেটের অর্ডার দিয়ে। তুমি যদি দেখাতে চাও প্রভুত্ব, আমার কাছে নাও তুমি অন্তরঙ্গতা। তারপর এল মদ-নির্বাচনের পালা। এবার তোমাকে আর কিছু বলতে দেব ভেবেছ ? এক বোতল মহার্ঘ মদের হুকুম করল ক্রিসতফ। চোখের দিকে তাকাতে চেয়েছিল দিনার, ক্রিসতফের চোখের ঘায়ে সে দৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

এত রাজ্যের খাবারের সামনে বসে গুটিয়ে গেল দুজনে। আর যেন কেউ কিছু কথা বলবার পাচ্ছে না। শুধু খাওয়ার মধ্যেই আটকে রইল, নড়া-চড়াগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, দুজনেই তারা বিদেশী, কোনো মিল নেই তাদের মধ্যে, এবং সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল পরস্পরের দিকে। চেষ্টা করল সেই পুরোনো কথার খেই ধরতে, স্বরে এলনা সেই উষ্ণতা। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল এমনি, কি ক্লান্তিকর বিরক্তি! মাংস আর মদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এর মধ্যে, দুজনের চোখে ক্রমশ আসতে লাগল বিশ্বাসের আভা। কোনোদিন এসব জিনিস খায়নি, ক্রিসতফকেই প্রথম দেখা দিল উত্তেজনা। অসম্ভব প্রগলভ হয়ে উঠল। তার জীবনের দুর্দশার কথা বলতে লাগল সে অটোকে।

অটোর জীবনও খুব সুখে কাটেনি, বলতে লাগলো অটো। দুর্বল ভীরু ছিলো বলে স্কুলের সহপাঠীরা বড়ো অত্যাচার করত তার উপর।

উপহাস করত, আর যদি তাদের বর্বরতার জন্য সে ঘৃণায় ভাব দেখাত তা হলেও তার লাঞ্ছনা চলত। তাদের যত রকম ছল-চাতুরী সব তাকে নিয়ে।

হাতের মুঠ দৃঢ় করল ক্রিসতফ। তায় সামনে যেন তারা ইয়ারকি করতে না আসে। বাড়ির লোকও বুঝতে পারেনি অটোকে। ক্রিসতফ জানে তার দুঃখ, তাকে আর বলতে হবে না বুঝিয়ে।

একে অন্যের দুঃখে সমব্যথী হয়ে উঠল দুজনে। দিনারের বাপ-মার ইচ্ছে দিনার ব্যবসা করে, আস্তে-আস্তে বাপের গদিতে এসে বসে, কিন্তু দিনারের ইচ্ছে সে কবি হবে। যদি শীলারের মত শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়, বরণ করতে হয় নির্মম দারিদ্র্য, তবু তার কবি হবার বড়ো সাধ! তার বাপের সম্পত্তি আর যাবে কোথায়! সেই তার ওয়ারিশ হবে—আর সে সম্পত্তিও একটুখানি নয়। জানো, লজ্জায় অটোর মুখ নরম হয়ে এল, কবিতা লিখেছি আমি, আর সে-কবিতা জীবনের বিষণ্ণতার কবিতা। শোনাও না দু' চারটে—ক্রিসতফ পিড়াপিড়ি করতে লাগল। প্রথমে তো কিছুই মনে করতে পারে না অটো। শেষে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দু-তিনটে আবৃত্তি করে শোনালে—আবেগে উছলে পড়ল অটো। চমৎকার—ক্রিসতফ অভিভূত হয়ে গেল। দুজনে এসে পড়ল নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতায়। এসো জীবনের নক্সা কাটি দুজনে। দুজনে এক সঙ্গে কাজ করব, নাটক লিখব, লিখব গীতি-গুচ্ছ। পরস্পরের প্রশংসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল পরস্পর। শুধু সুরশিল্পীর খ্যাতী নয়, ক্রিসতফের শক্তি আর আশা অটোর মনে দাগ ফেলল গাঢ় করে, আর অটোর ভদ্রতা ও শালীনতা মুগ্ধ করল ক্রিসতফকে। সংসারে সব মূল্যবিচারই আপেক্ষিক, কিন্তু অটোর এই সহজ সুন্দর ব্যবহারের যেন তুলনা নেই।

ভূরিভোজনের পর চোখে বুঝি ঢুল লেগেছে। টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর রেখে দুইজনে কথা কইছে, শুধু কইছে না শুনছেও, চোখের দৃষ্টিতে স্নেহের আর্দ্রতা। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা, এইবার উঠতে হল দুজনকে। বিলটা সংগ্রহ করবার জন্যে উঠতে চাইল অটো কিন্তু তার দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ক্রিসতফ যে তার আর নড়বার ক্ষমতা রইল না। জাঁ-ক্রিসতফের শুধু এই অস্বস্তিই হচ্ছে হয়ত পকেটে যা আছে তাতে বিলের পাওনা শোধ হবে না। যদি না কুলোয় তা হলে কি হবে? ঘড়িটা দিয়ে দেবে, যদি দরকার হয় কোটটা, তবু অটো যেন না বুঝতে পারে। যাক, অতদূর যেতে হল না। একদিনের খাওয়ায় বেরিয়ে গেছে তার গোটা মাসের মাইনে।

আবার পাহাড়ের দিকে চলল দুজনে। পাইন-বনে সন্ধ্যার ছায়া পড়ছে দীর্ঘ আলস্যে। চূড়াগুলো এখনো গোলাপী আভায় স্নান করে আছে। পায়ের শব্দ করতে করতে আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে দুজনে। পাইন-পাতার গালচের উপর সে শব্দ কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কারু মুখে কোনো কথা নেই। ক্রিসতফ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করছে একটা মধুর বেদনার ভার। তার সুখের অবধি নেই, ইচ্ছে হয় মুখরতায় বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, কিন্তু মনের মধ্যে সেই মধুর বেদনার ভার কথা কইতে দেয়না। এক মুহূর্ত দাঁড়াল ক্রিসতফ, দেখাদেখি অটোও। চারদিকে অসীম মৌন। অস্তায়মান সূর্যের একটা রেখা ধরে কতকগুলি মাছি উড়ে যাচ্ছে অস্ফুট পাখার শব্দ করতে করতে, গাছের শুকনো একটা ডাল কোথায় ভেঙে পড়ল। অটোর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল ক্রিসতফ। জিগগেস করলে, 'তুমি আমার বন্ধু হবে?'

'হব।'

তাদের যুগ্ম হাত কেঁপে উঠল। স্পন্দিত হল হৃদয়। মধুর লজ্জায় পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে কারু সাহস হল না।

কতক্ষণ পরে ফিরে চলল তারা। আর ঘেঁষাঘেঁষি নয়, দূরে-দূরে হাঁটছে দুজনে। যেন দুজনেই হঠাৎ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সমস্ত পার্বত্য অরণ্য যেন কোন অপরিচিতের এলাকা। পরস্পরকে কেমন যেন ভয় করতে লাগল তাদের—ভয় করতে লাগল নিজেদের ভিতরের এই নবলব্ধ অপূর্ব আবেগকে। খুব জোরে পা চালাল, যাতে শিগগির করে বেরিয়ে আসতে পারে এই বন থেকে, গাছের এই সব ছায়া থেকে।

ছায়াময় বন পেরিয়ে ফাঁকায় এল দুজনে। তখন ফিরে এল সাহস, পরস্পরের হাত ধরল ফের। সুরু হল এলোমেলো কথার টুকরো।

স্টিমারে উঠে বসল দুজনে পাশাপাশি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথায় মেতে উঠল দুজনে, কিন্তু কি তারা কথা কইছে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করছে না। কথা যে বলতে পারছে তারই আনন্দে আর শ্রান্তিতে দুজনে আচ্ছন্ন। কথা না কইলেই বা কি। কোনো দরকার নেই কথার। কোনো দরকার নেই হাত ধরার, কোনো দরকার নেই পরস্পরের দিকে তাকানোর। দুজনে দুজনের একান্ত কাছটিতে।

শেষ হয়ে এল যাত্রা, আবার তবে কবে দেখা হবে আমাদের? আগামী রবিবার। অটোকে ক্রিসতফ তার বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত নিয়ে গেল। গ্যাসের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে দুজনে বিদায়ের ম্লান হাসিটুকু হাসলে, বললে, বিদায়। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শান্তি পাচ্ছে দুজনে, স্নায়ুর কী একটা কঠিন টানের মধ্যে ছিল তারা এতক্ষণ। শেষ বিদায়ের কথাটুকু বলতে কী অসম্ভব একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল বুকের মধ্যে। দুঃখের মধ্যেও কেমন আছে একটা মুক্তির বিশ্রাম।

রাত্রে একা ঘরে ঢুকল ক্রিসতফ। তার সমস্ত হৃদয় গান গাইছে: "আমার একজন বন্ধু হল। আমি একটি বন্ধু পেলাম।" আর কিছু সে দেখছে না, আর কিছু সে শুনছে না, আর কিছু তার ভাববারও নেই!

ঘুমে ঘোর লেগেছে শরীরে। ঘরে ঢোকা মাত্রই এলিয়ে পড়ল বিছানায়। রাত্রে ঘুমের মধ্যে জেগে-জেগে উঠল। মনে হল, কী যেন আমার আছে? "আমার একজন বন্ধু আছে।" আবার ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

পরদিন সকালে উঠে মনে হল সমস্ত একটা স্বপ্ন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে একটি-একটি করে ছোটখাটো ঘটনার খড়কুটো কুড়োতে লাগল মনে মনে, যাচাই করতে লাগল সত্যিই সব সত্যি কিনা। থিয়েটারে গিয়ে বসেছে, অর্কেষ্ট্রায় বাজনা বাজাচ্ছে, তখনো সেই ভাবনা—সত্যিই সব সত্যি ছিলো কিনা! থিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে এসে তার মনে নেই সত্যিই সে কী বাজাচ্ছিল এতক্ষণ!

বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার নামে একখানা চিঠি। কোত্থেকে আসতে পারে নিজেকে প্রশ্ন করবারও প্রয়োজন নেই। ছুটে গিয়ে ঘরের দরজার খিল চাপিয়ে দিল। ম্লানাভ নীল কাগজে লেখা, অক্ষরগুলি দীর্ঘ ছাঁদে একটু টেনে-টেনে খেটে-খেটে লেখা আর লেখার টানগুলিতে জমকালো কেরামতি।

"প্রিয় জাঁ-ক্রিসতফ—না, মাননীয় বন্ধু?

বসে বসে কালকের ঘটনাবলী ভাবছি। আর তোমার স্নেহ ও করুণার জন্যে অপার ধন্যবাদে মন ভরে যাচ্ছে। তোমার স্নিগ্ধ কথা, সে আনন্দময় বেড়ানো আর সেই চমৎকার খাওয়া—সব কিছুর জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এতগুলো টাকা এক মুঠে খরচ করে এসেছ বলে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কী মনোরম দিন।

আমাদের সেই আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়াটা কি তোমার ভাগ্যের বিধান বলে মনে হয় না ? আমার তো মনে হয় এ ভাগ্যেরই নির্দেশ যে আমাদের দুজনের দেখা হবে। আবার রবিবার দেখা হবে এ ভাবতেও কত আনন্দ হচ্ছে! সেদিনের সেই নেমন্তন্নে যেতে পারনি বলে আশা করি কোনো অসুবিধেয় পড়নি। আমার জন্যে যদি কোনো অসুবিধেয় পড়তে তা হলে আমার দুঃখের শেষ থাকত না।

প্রিয় ক্রিসতফ, আমি তোমার ভক্ত ভৃত্য ও বন্ধু—

অটো দিনার—"

"পুনশ্চ—আসচে রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ি এসো না। যদি ক্লশ গার্টেনে আমাদের দেখা হয় তো ভালো হয়।"

পড়তে পড়তে ক্রিসতফের চোখে জল এসে গেল। চিঠিখানাকে সে চুম্বন করলে। একবার হেসে উঠল সশব্দে, বিছানায় নৃত্য করলে খানিকক্ষণ। তক্ষুনি টেবিলের কাছে ছুটে গেল, কলম নিয়ে বসল জবাব লিখতে। এক মুহূর্তও সে প্রতীক্ষা করতে পারছে না। কিন্তু লেখবার অভ্যেস নেই তার। বুকের মধ্যে যা উথলে উঠছে তা প্রকাশ করবার শক্তি তার নেই। তবু কাগজে কলম লাগাল, কালিতে কালো করে ফেলল আঙুলের মাথা, পা ঠুকতে লাগল মেঝের উপর। শেষ পর্যন্ত ছ' সাতখানা কাগজ ছিঁড়ে অনেক কষ্টে দাঁড় করাল একটা চিঠি। হাতের লেখার বা কি ছিরি, ভাঙা-ভাঙা, আঁকা-বাঁকা অক্ষর এখানে-ওখানে ছিটকে পড়ছে, আর কী সব দুর্ধর্ষ বানান ভুল!

"আমার প্রাণ,

যেখানে তোমাকে ভালবাসি সেখানে তুমি কৃতজ্ঞতার কথা কি করে তুলছ? তোমাকে কি বলিনি যে তোমাকে চেনবার আগে আমি কত

বিষণ্ণ আর কত নিঃসঙ্গ ছিলাম! তোমার বন্ধুতাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ। গতকালই আমি জীবনে সুখী ছিলাম—আমার জীবনে আমার সেই প্রথমতম সুখ। তোমার চিঠি পড়ি আর আনন্দে চোখের জলে ভাসি। কোনো সন্দেহ নেই ভাগ্যই আমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যের এই হয়তো বিধান যে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে অনেক বড় কাজ করব। বন্ধু! কী সুন্দর কথাটা! এ কি সত্যি যে আমার একজন বন্ধু হয়েছে? দেখো, আমায় যেন কোনোদিন ছেড়ে যেও না। তুমি সব সময় থাকবে তো আমার কাছে-কাছে?

একসঙ্গে বেড়ে উঠব দুজনে, কাজ করব দুজনে—কত সুন্দর লাগছে ভাবতে। আমি নিয়ে আসব আমার গান-বাজনার স্বপ্ন আর তুমি তোমার বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য! সত্যি, কত বেশি তুমি জান! তোমার মত এমন বুদ্ধিমান লোক আর আমি দেখিনি। আমি তোমার বন্ধুতার অনুপযুক্ত। তুমি এত মহান, এত শিক্ষিত, তুমি আমার মতন স্থূল-বুদ্ধিকে ভালোবাসছ ভাবতে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত পাই না। কিন্তু না, কৃতজ্ঞতার কথা এইখানেই শেষ হোক। বন্ধুতার বেলায় আবার কৃতজ্ঞতা কি! বন্ধুতার কোনো দায়েরও কথা নেই কোনো পরিশোধেরও কথা নেই। আমি চাইনা কোনো উপকার কোনো বদান্যতা। আমরা দুজনকে ভালোবাসি, আমরা সমান। তোমাকে দেখতে কী আগ্রহ যে হচ্ছে! তুমি যখন নিষেধ করছ তখন তোমার বাড়িতে যাব না তোমার সঙ্গে দেখা করতে—যদিও, সত্যি কথা বলতে গেলে, বুঝতে পারছি না বাধা-নিষেধের দরকার কি—কিন্তু, সন্দেহ কি, তুমি বেশি ভালো বোঝ, তুমি যা বলছ তাই হয়তো ঠিক…

আর এক কথা। টাকা পয়সার কথা তুলো না। টাকাকে আমি ঘৃণা করি। যেমন জিনিসটা তেমনি ওই শব্দটা। আমি বড়লোক

আমাদের সেই আকস্মিক দেখা হয়ে যাওয়াটা কি তোমার ভাগ্যের বিধান বলে মনে হয় না? আমার তো মনে হয় এ ভাগ্যেরই নির্দেশ যে আমাদের দুজনের দেখা হবে। আবার রবিবার দেখা হবে এ ভাবতেও কত আনন্দ হচ্ছে! সেদিনের সেই নেমন্তন্নে যেতে পারনি বলে আশা করি কোনো অসুবিধেয় পড়নি। আমার জন্যে যদি কোনো অসুবিধেয় পড়তে তা হলে আমার দুঃখের শেষ থাকত না।

প্রিয় ক্রিসতফ, আমি তোমার ভক্ত ভৃত্য ও বন্ধু—

অটো দিনার—"

"পুনশ্চ—আসচে রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ি এসো না। যদি ক্রশ গার্টেনে আমাদের দেখা হয় তো ভালো হয়।"

পড়তে পড়তে ক্রিসতফের চোখে জল এসে গেল। চিঠিখানাকে সে চুম্বন করলে। একবার হেসে উঠল সশব্দে, বিছানায় নৃত্য করলে খানিকক্ষণ। তক্ষুনি টেবিলের কাছে ছুটে গেল, কলম নিয়ে বসল জবাব লিখতে। এক মুহূর্তও সে প্রতীক্ষা করতে পারছে না। কিন্তু লেখবার অভ্যেস নেই তার। বুকের মধ্যে যা উথলে উঠছে তা প্রকাশ করবার শক্তি তার নেই। তবু কাগজে কলম লাগাল, কালিতে কালো করে ফেলল আঙুলের মাথা, পা ঠুকতে লাগল মেঝের উপর। শেষ পর্যন্ত ছ' সাতখানা কাগজ ছিঁড়ে অনেক কষ্টে দাঁড় করাল একটা চিঠি। হাতের লেখার বা কি ছিরি, ভাঙা-ভাঙা, আঁকা-বাঁকা অক্ষর এখানে-ওখানে ছিটকে পড়ছে, আর কী সব দুর্ধর্ষ বানান ভুল!

"আমার প্রাণ,

যেখানে তোমাকে ভালবাসি সেখানে তুমি কৃতজ্ঞতার কথা কি করে তুলছ? তোমাকে কি বলিনি যে তোমাকে চেনবার আগে আমি কত

বিষণ্ন আর কত নিঃসঙ্গ ছিলাম! তোমার বন্ধুতাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় আশীর্বাদ। গতকালই আমি জীবনে সুখী ছিলাম—আমার জীবনে আমার সেই প্রথমতম সুখ। তোমার চিঠি পড়ি আর আনন্দে চোখের জলে ভাসি। কোনো সন্দেহ নেই ভাগ্যই আমাদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যের এই হয়তো বিধান যে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে অনেক বড় কাজ করব। বন্ধু! কী সুন্দর কথাটা! এ কি সত্যি যে আমার একজন বন্ধু হয়েছে? দেখো, আমায় যেন কোনোদিন ছেড়ে যেও না। তুমি সব সময় থাকবে তো আমার কাছে-কাছে?

একসঙ্গে বেড়ে উঠব দুজনে, কাজ করব দুজনে—কত সুন্দর লাগছে ভাবতে। আমি নিয়ে আসব আমার গান-বাজনার স্বপ্ন আর তুমি তোমার বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য! সত্যি, কত বেশি তুমি জান! তোমার মত এমন বুদ্ধিমান লোক আর আমি দেখিনি। আমি তোমার বন্ধুতার অনুপযুক্ত। তুমি এত মহান, এত শিক্ষিত, তুমি আমার মতন স্থূল-বুদ্ধিকে ভালোবাসছ ভাবতে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত পাই না। কিন্তু না, কৃতজ্ঞতার কথা এইখানেই শেষ হোক। বন্ধুতার বেলায় আবার কৃতজ্ঞতা কি! বন্ধুতার কোনো দায়েরও কথা নেই কোনো পরিশোধেরও কথা নেই। আমি চাইনা কোনো উপকার কোনো বদান্যতা। আমরা দুজনকে ভালোবাসি, আমরা সমান। তোমাকে দেখতে কী আগ্রহ যে হচ্ছে! তুমি যখন নিষেধ করছ তখন তোমার বাড়িতে যাব না তোমার সঙ্গে দেখা করতে—যদিও, সত্যি কথা বলতে গেলে, বুঝতে পারছি না বাধা-নিষেধের দরকার কি—কিন্তু, সন্দেহ কি, তুমি বেশি ভালো বোঝ, তুমি যা বলছ তাই হয়তো ঠিক…

আর এক কথা। টাকা পয়সার কথা তুলো না। টাকাকে আমি ঘৃণা করি। যেমন জিনিসটা তেমনি ওই শব্দটা। আমি বড়লোক

নই বটে, কিন্তু বন্ধুকে দেবার মতন নিশ্চয়ই আমি বড়লোক—আর, বন্ধুর জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে আমার অফুরন্ত আনন্দ! তোমারও কি তাই নয়? আর আমার যদি দরকার হয়, তবে তুমি কি তোমার সৌভাগ্যের ভাণ্ডার আমাকে খুলে দেবে না? কিন্তু সেসব কথা উঠবে না কোনোদিন। আমার সক্ষম হাত আর সক্রিয় মস্তিষ্ক আছে, আর যে রুটি আমার খাবার জন্যে দরকার তা আমি রোজগার করতে পারব। আগামী রবিবার। হা ঈশ্বর, এক সপ্তাহ তোমাকে না দেখে থাকব। এর মধ্যে দুদিন না দেখে কেটে গেছে। তোমাকে না দেখে এ দুদিন বাঁচলাম কি করে?

যে বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল তারা অভিযোগ করেছিল বটে কিন্তু তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনা, তুমিও ঘামিয়ো না। অন্য লোকের কথায় আমাদের কি এসে যায়! অন্য লোকে কি ভাবে বা আমার সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা হতে পারে চিন্তাও করি না। শুধু তুমি কি ভাবো না ভাবো তাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমাকে তুমি ভালোবেসো। যেমন আমি তোমাকে ভালোবাসছি তেমনি। তোমাকে ভাষায় বলতে পারছি না কত ভালোবাসি তোমাকে। আমি তোমার, আমি তোমার, আঙুলের ডগা থেকে চোখের মণি পর্যন্ত আমি তোমার। ইতি।

নিয়ত তোমার
জাঁ-ক্রিসতফ"

সপ্তাহের বাকি কটা দিন একটা অসহ্য আগ্রহ যেন ক্রিসতফকে গ্রাস করে রইল। নিজের পথ ছেড়ে ঘুর-পথ দিয়ে হেঁটে অটোর বাড়ির কাছ দিয়ে কতবার সে যাওয়া-আসা করেছে। অটোর সঙ্গে

দেখা হয়ে যাবে সেই আশায় নয়, শুধু তার বাড়িটা দেখতে। শুধুই বাড়িটা দেখেই আবেগে সে রক্তিম হয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সে আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে, আরেকটা চিঠি পাঠাল, আগেরটার চেয়েও উদ্বেল। অটোও তেমনি ভাবাকুল হয়ে জবাব দিলে।

শেষ পর্যন্ত এল সেই রবিবার। মেলবার জায়গাটিতে ঠিক ঘড়ির কাঁটায় এসে পোঁছেছে অটো। ক্রিসতফ তো এসেছে ঘণ্টাখানেক আগে, আর ভেবে ভেবে কেবল পুড়ে যাচ্ছে, অটো বুঝি আর এলো না। যদি অটোর অসুখ হয়, তাহলে কী হবে! রক্তের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায় ভাবতে গেলে! এক মুহূর্তও ভাবতে পারে না, অটো ইচ্ছে করে কথার খেলাপ করতে পারে কখনো। হে ঈশ্বর! সে যেন আসে, সে যেন আসে—এই সে অস্ফুটস্বরে বারেবারে আওড়াতে লাগল। হাতের লাঠি দিয়ে ঠুকতে লাগল পথের পাথরকে—যদি লাঠির ডগাটা ঠিক লাগে পাথরের গায় তবে ঠিক আসবে অটো, আর যদি তিন-তিনবার না লাগে তবে আসবে না। যদিও খেলাটা খুব সোজা, তা হলেও তিন-তিনবার ফসকাল ক্রিসতফ। যন্ত্রণায় মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, অটো আসছে। আসছে পরিমিত, নিশ্চিতভাবে পা ফেলে-ফেলে। অটো সব অবস্থাতেই ফিটফাট, খুব বিচলিত অবস্থায়ও তার বিচ্যুতি নেই কিছুতে।

ছুটে গেল জাঁ-ক্রিসতফ। গলা যদিও শুকিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, জানালে তাকে শুভদিন। প্রত্যভিবাদন করলে অটো।

আর কিছুই যেন তাদের বলবার নেই। এবার তবে আবহাওয়া নিয়ে কথা বলো আর-কি। কিংবা বলো, এখন দশটা বেজে পাঁচ-ছ মিনিট হয়েছে, কিংবা গড়ের ঘড়িটা সব সময়েই গদাইলস্কর।

স্টেশনে গেল তুজনে হাঁটতে হাঁটতে। সেখান থেকে ট্রেনে করে কাছাকাছি একটা জায়গায়, শহুরে লোকের কাছে বেড়ানোর পক্ষে সেটা মার্কা-মারা। সারা রাস্তায় গুনে-গুনে আট-দশটির বেশি কথা কয়নি তুজনে। একে অন্যের দিকে কথা-ভরা চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে স্তব্ধতার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেছিল একান্তে, সফল হল না। কে-কে তাদের বন্ধু, তাদের বিস্তৃত বিবরণ দিতে বসল ; মুখে কথা থাকলেও চোখের কথা নিভে গেল। যেন তুজনে মুখস্ত-করা পার্টে অভিনয় করছে। স্পষ্ট সেটা যেন স্পর্শ করছে ক্রিসতক আর মনে মনে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা আগেও কত অগণিত কথা উত্তাল হয়ে উঠেছিল মনের মধ্যে, এখন তার একটিও সে প্রকাশ করতে পারছে না। প্রকাশ করতে পারা দূরের কথা, একটি কথার তাপও আর তার মনের মধ্যে লেগে নেই। কেন যে জমাতে পারছে না, তলিয়ে অত বুঝতে চাইছে না অটো। তার অত সারল্য নেই, নেই তত সূক্ষ্ম আত্মদর্শন। কিন্তু, যাই বলো, সেও কেমন মনমরা হয়ে পড়েছে। আসল কথা হয়তো এই, তাদের বিচ্ছেদের সপ্তাহ ভরে তারা তাদের আকুলতাকে এমন উঁচু সুরে বেঁধেছে, সেখানে এখন আর পৌঁছুতে পারছে না গলার স্বর। কণ্ঠস্বর নেমে আসতে চাইছে। নেমে আসতে গেলেই শোনাচ্ছে কেমন মেকি আর মিথ্যে। মনে মনে তাতে কেউ রাজি হতে পারছেনা কিছুতেই।

গাঁয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াল তুটিতে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেও সেই আড়ষ্টতা হালকা হয়ে উড়ে গেল না। ছুটির দিন। হাওয়া-খেয়ে-বেড়ানো লোকের কোলাহলে বনস্থল ভরে গেছে, ভরে গেছে সরাইখানা। যত সব শহুরে মধ্যবিত্ত, প্রচণ্ড হৈ-চৈ করছে আর যেখানে-সেখানে খাচ্ছে ভুরি-ভুরি। মেজাজ এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে, ওদের

কাণ্ডকারখানায় আরো বিগড়ে যাচ্ছে থেকে-থেকে। নিজেরা যে মন খুলে কথা বলতে পারছে না, হাঁটায় ফিরে পাচ্ছে না সেই প্রথম দিনের সরলতা, তার কারণ, সন্দেহ নেই, ঐ সব শহরাগত কৃত্রিম ভদ্রলোকের দল। কিন্তু তাই বলে কথা বলা তারা বন্ধ করেনি—যদিও কষ্ট করে-করে প্রতিমুহূর্তে খুঁজে বের করতে হচ্ছে কথা বলার বিষয় কোথায়! এই শুধু ভয়, এক সময় না দুজনেই আবিষ্কার করে বসে, কথা বলার আর তাদের কোনো বিষয় নেই। শেষকালে অটো কিনা বলতে সুরু করল, ইস্কুলে সে কী শিখেছে—আর ক্রিসতফ বলতে সুরু করল বেহালা বাজানোর কায়দা-কানুনের কথা। সামনেই যেন স্তব্ধতার বিরাট গহ্বর হাঁ করে আছে, সেই ভয়ে পরস্পরকে কথায় ভরে রাখছে দুজনে, ডুবিয়ে রাখছে, আচ্ছন্ন করে রাখছে। যেন অতলস্পর্শ স্তব্ধতার পারে গিয়ে কেউ না পড়ে। অটোর কান্না পাচ্ছিল, আর ক্রিসতফের ইচ্ছা হচ্ছিল কোথাও একা-একা ছুটে পালাই। লজ্জায় কোথাও গিয়ে মুখ ঢাকি।

আর এক ঘণ্টা বাকি আছে ফিরতি ট্রেন নেবার। আবার উঁকি মারছে বুঝি সেই স্তব্ধতার গহ্বর। এমন সময় বনের মধ্য থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল। কি একটা যেন শিকার করছে আপন মনে। এসো ওর রাস্তার পাশে লুকোই চুপটি করে, প্রস্তাব করল ক্রিসতফ, দেখি কোথায় ওর শিকার লুকিয়ে আছে। এই বলে ঝোপ লক্ষ্য করে ঢুকে পড়ল দুজনে। কুকুরটা একবার কাছে আসে, আরেকবার চলে যায় অন্য দিকে। অটো আর ক্রিসতফ একবার এপাশে লুকোয়, আরেকবার ওপাশে, কখনো বা কুঁকড়ি-সুঁকড়ি মেরে চুপ করে থাকে। কুকুরটা তার চীৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, তার শিকারের পথে বাধা পড়েছে বুঝে সে আরো হাঁসফাঁস করে। আবার একবার সে এগিয়ে

এল ঝোপের দিকে। মরা পাতার উপর নিঃশব্দে শুয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে দুজনে। খবরদার, নড়াচড়ায় একটি পাতারও যেন শব্দ না হয়।

কুকুরটা হঠাৎ থেমে পড়ে, শিকারের গন্ধ আর তার নাকে লাগছেনা। ভুলে গিয়েছে কোন ঝোপে গা ঢেকেছিল তার খরগোস। দুজনে শুনতে পেল, ঐ কত দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের চীৎকার, তারপর আরো কতক্ষণ পর—একেবারে স্পন্দহীন অসাড় স্তব্ধতার পাথর। কোথাও একটা শব্দ নেই। শুধু সেই লক্ষ-লক্ষ পতঙ্গ আর সরীসৃপের চঞ্চলতা। নিঃশব্দে, প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বসে আছে দুজনে। কিন্তু কোথাও এতটুকু আশার আভাস নেই, আর ফিরবে না সেই কুকুর। উঠে পড়ছে দুজনে, অমনি একটা খরগোস কোথা থেকে বেরিয়ে প্রায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তারা। খরগোস পাশ কাটিয়ে ছুট দিলে, পড়ি-মরি করে ঢুকলো গিয়ে আরেকটা ঝোপে। ঝরা পাতার খসখসানি আস্তে-আস্তে শান্ত হয়ে এল। নিভৃত আশ্রয় পেয়েছে এতক্ষণে। অমন করে চেঁচিয়ে না উঠলেই পারত, কিন্তু আকস্মিক সেই আনন্দধ্বনি করতে পেরেছিল বলেই এখন তারা আনন্দ করতে পারছে। ভয় পেয়ে কী সাংঘাতিক লাফ দিয়েছিল খরগোস, ক্রিসতফ এখন তাই নকল করবার চেষ্টা করছে। দেখাদেখি অটোও। একে অন্যের পিছু ছুটছে। অটো খরগোস, ক্রিসতফ কুকুর। বনজঙ্গল মাঠ-ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে তারা, লাফিয়ে যাচ্ছে ছোট-ছোট নালা-নর্দমা। কার সর্বের খেত মাড়িয়ে দিয়েছে তারা, তেড়ে এল সেই মাঠের চাষী। ঝগড়া করবার জন্যে তারা অপেক্ষা করল না। আটো ছুটছে আর ক্রিসতফ তাকে কুকুরের মত আওয়াজ করতে-করতে অনুসরণ করছে। এমন নিখুঁত সেই আওয়াজ যে হাসতে-হাসতে অটোর চোখে জল এসে

পড়ছে। হাসতে হাসতে তুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। জায়গাটায় ঢাল ছিল, হাসির ধাক্কায় পাক খেতে-খেতে নামতে লাগল নিচে—সেই সঙ্গে অসম্ভব কলনাদ। গলায় যখন আর আওয়াজ নেই, তখন বসে পড়ল তুজনে, পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল ভয়ে-ভয়ে। তুজনের চোখেই আনন্দের শিশির বিন্দু। এখন তারা সম্পূর্ণ খুশি, তুজনেই স্নান করে উঠেছে প্রসন্নতায়। কারু কাছে কারু আর বীরত্বের হাবভাব নেই, পরস্পরের কাছে এখন তরল সরলতা। তারা আর বীর নয়, তারা শুধু বালক।

ফিরে এল তুজনে। বাহুর সঙ্গে বাহু বাঁধা, অর্থহীন গান তাদের কণ্ঠস্বরে। কিন্তু ঠিক শহরে ঢোকবার মুখে আবার তারা সেই কৃত্রিম মুখোস টানলে, বললে, এই শেষ গাছটার গায়ে আমাদের নামের আদ্যাক্ষরকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রেখে যাই। ছুরি দিয়ে গাছের ছাল কেটে আদ্যাক্ষর খোদাই করলে তুজনে। কিন্তু ট্রেনে উঠে আবার তারা কৃত্রিম ভাবালুতা কাটিয়ে স্পর্শ করল তাদের সেই সরল স্বভাবটিকে। আবার একে অন্যের দিকে তাকাতে গিয়েই হাসতে লাগল। তারপর বিদায় নিলে এক সময়। এমন একটা বৃহৎ উৎসবের দিন তাদের জীবনে আর আসেনি। সেই উৎসব যে কত পরিব্যাপী একে অন্যের সঙ্গহারা হয়েও তা বোঝা যায়।

পরের রবিবার আবার তাদের দেখা হল। সারা সপ্তাহ তারা স্বপ্ন দেখেছে একে অন্যের, পরস্পরকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহিমান্বিত করে তুলেছে। স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের যে অমিল তা লক্ষ্যও করছেনা। মন যেমনটি চায় তেমন করে তবু আঁকবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ।

তারা পরস্পরের বন্ধু—এই গর্বের তাদের অবধি নেই। তাদের

স্বভাবের বৈষম্যই তাদেরকে নিকটতর করেছে। অটোর মত সুন্দর আর কাউকে দেখেনি ক্রিসতফ। তার কমনীয় দুটি হাত, রমণীয় চুল, সজীব রঙ, লাজুক কথা, নম্র স্বভাব, আর তার চেহারার পারিপাট্য—মুগ্ধ করেছে ক্রিসতফকে। আর ক্রিসতফের দুর্বার শক্তি আর স্বাধীনতার মোহে অটো অভিভূত। সমস্ত শাসনকে একটা সসম্মান নতি দেখাতেই অভ্যস্ত অটো, সেটাই তাদের বংশগত বিশেষত্ব। কিন্তু এখন সে এমন একজন সহচরের দেখা পেল যে প্রচলিত ব্যবস্থার বিধি-বন্ধন কিছুই মানতে চায় না। তার সে উদ্ধত অস্বীকৃতিতে কেমন একটা ভয়-মেশানো আনন্দের স্বাদ পাচ্ছে অটো। শহরের গণ্যমান্যদের যখন সে সরাসরি উড়িয়ে দিচ্ছে, কিম্বা যখন নৃশংস উপহাস করছে গ্র্যাণ্ড ডিউককে. তখন অটোর রোমাঞ্চ হচ্ছে রীতিমত! বন্ধুর উপর এই ভাবটা কেমন কাজ করছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে ক্রিসতফ, তাই তার এই কঠোর ভঙ্গিটা সে ইচ্ছে করে ধারালো করছে, মেজাজের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে। সামাজিক যত সংস্কার আর রাষ্ট্রের যত নিষেধ সব কিছু সে ভাঙছে টুকরো করে। সে যেন কোন অতীত যুগের দুর্মদ বিদ্রোহী। বেদনাহতের মত শোনে অটো, কিন্তু মনে মনে আনন্দিত হয়। মৃদুস্বরে তারও ইচ্ছে করে সে এই ধ্বংসস্তোত্রে যোগ দেয়. কিন্তু ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায় কেউ হঠাৎ শুনে ফেলে কিনা।

চলতে চলতে যখনই খেতের ধারে কোনো বেড়া দেখেছে, আর তার গায় দেখেছে ঝোলানো বিজ্ঞাপন : 'বেড়া ডিঙোনো নিষেধ'—তখনই একলাফে সে-বেড়া ডিঙিয়ে গিয়েছে ক্রিসতফ। অন্যের বাগানে ফল ধরেছে, দেয়াল বেয়ে উঠে তাই পেড়ে আনো। অটোর সব সময়ই ভয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে, কেউ ধরে ফেলে। কিন্তু নিজে না পারলেও এই সব উদ্ধত মনোভাব তার মনে একটি মধুর মাদকতা নিয়ে

আসে, বাড়ি ফিরে নিজেকে মনে করে যুদ্ধ-প্রত্যাগত বীরের মত। সাংঘাতিকভাবে ভক্তি করে ক্রিসতফকে। বন্ধুর ইচ্ছাতেই সব সময়ে তার অপ্রতিবাদ সমর্থন—এই বাধ্যতার ভাবটিই তার বন্ধুতায় একটি নিবিড়তা আনে। আনে একটি সমর্পণের মাধুর্য। কখন কি করতে হবে বা না হবে এ বিচার-বিবেচনার যন্ত্রণা অটোর নয়। সমস্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত পরিকল্পনা ক্রিসতফের। কোন দিন কোথায় কি করতে হবে, কি ভাবে ছক কাটতে হবে জীবনের, কী স্বপ্ন দেখতে হবে চোখ ভরে, এ নিয়ে তর্ক চলবে না, গবেষণা চলবে না। সব একা ক্রিসতফই ঠিক করবে। সমস্ত একা ক্রিসতফেরই দায়িত্ব। ঠিক করবে তার বাড়ির লোকদের ভবিষ্যৎ নয়, অটোরও নিজের ভবিষ্যৎ। উপায় নেই, অটো সায় দেয় চুপচাপ। কিন্তু তারও স্তম্ভিত হবার কারণ ঘটে, যখন শোনে তারই টাকায় বিরাট একটা থিয়েটার তৈরি করবার মতলব করেছে ক্রিসতফ। সে-থিয়েটারের সাজপাট কল-কৌশল সব একা ক্রিসতফে-রই ইচ্ছামত। শুধু টাকাটা অটোর।

কিন্তু মুখের উপর প্রতিবাদ করো এমন তোমার সাধ্য কি! ক্রিস-তফের ক্রুদ্ধ, মত্ত কণ্ঠস্বরে ভয় লাগে অটোর। ক্রিসতফের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে অটোর পূর্বাধিকারী যে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করে গেছে তা এর চেয়ে আর মহত্তর কাজে ব্যয় হতে পারে না। কিন্তু সে টাকার ব্যাপারে অটোর নিজের কী ধারণা সে খোঁজে দরকার নেই ক্রিসতফের। তার ইচ্ছা দ্বারা অটোর ইচ্ছা পরাস্ত হচ্ছে কিনা সে সন্দেহ লেশমাত্র তার মনে জাগছে না। অন্তরে অন্তরে সে একজন নৃশংস দস্যু, ভেবেও দেখছে না তার ইচ্ছার প্রতিকূল হতে পারে অটোর ইচ্ছা! তার মনের বিপরীত হতে পারে অটোর মন!

কিন্তু যদি একবার জানত, যদি একবার অটো প্রকাশ করত তার

মনের ইচ্ছাটি, তা হলে কি করত ক্রিসতফ ? অনায়াসে তার ইচ্ছাকে অটোর ইচ্ছার কাছে হাসিমুখে বিসর্জন দিত। শুধু এইটুকু নয়, আরো অনেক কিছু সে আত্মত্যাগ করতে পারত ! অটো একবার কিছু বললেই হয়। তার জন্যে কিছু করবার জন্যে, তার জন্যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেবার জন্যে মরে যাচ্ছে ক্রিসতফ। ব্যাকুল হয়ে নিরন্তর সুযোগ খুঁজছে তার বন্ধুতাকে একবার যাচাই করে প্রমাণিত করতে পারে কিনা। যখন বেড়াতে বেরোয় দুজনে, সর্বক্ষণ আশা করে একটা বিপদ তাদের সামনে এসে দাঁড়াক, আর সে-বিপদের মুখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ুক স্বচ্ছন্দে। অটোর জন্যে মৃত্যু বরণ করতে সে প্রস্তুত। আবার এদিকে তার জন্যে তার উদ্বেগেরও অন্ত নেই। এই বুঝি সে পড়ে গেল পা পিছলে, এই বুঝি কিছু লাগলো এসে তার গায়ে-পায়ে। জায়গায় জায়গায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে লাগল তাকে, সে যেন ছোট একটি খুকি। হয়তো এরি মধ্যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে অটো, হয়তো ঝলসে গিয়েছে রোদে, কিম্বা কে জানে, হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে ! গাছের নিচে যখন এসে বসে, ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, তখন নিজের কোট খুলে চাপিয়ে দেয় অটোর গায়ে। চলবার সময় অটোর ক্লোক সে নিজের হাতে বয়। যদি পারত, অটো-কেই সে বয়ে নিয়ে যেত। প্রেমিকের মত সে চোখ দিয়ে পান করে অটোকে। আর, সত্যি কথা বলতে গেলে, সে প্রেমে না পড়েছে তো কি !

অথচ প্রেম কি, তা ক্রিসতফ জানে না। এবং এ প্রেম কিনা তাই বা কে বলবে। তবু মাঝে মাঝে যখন তারা একত্র থাকে দুজনে, কেমন একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য পেয়ে বসে ক্রিসতফকে—পাইন-বনে তাদের প্রথম বন্ধুতার দিনে যেমন পেয়ে বসেছিল—আর বুকের রক্ত মুখের উপর এসে ছড়িয়ে পড়ে আচমকা, গাল দুটো জ্বালা করে ওঠে। কেমন ভয় করে

তার। তখন কি এক অজানা সহানুভূতিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তারা, একের থেকে অন্যে ছুটে পালায়, একজনের অনেক পিছনে আরেকজন পড়ে থাকে। দূরে-দূরে বেড়ার গায়ে কালোজাম খোঁজার ভান করে। অথচ কি যে এমন করে তাদেরকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ জানে না।

শুধু চিঠিতেই তাদের আবেগ উথলে-উথলে উঠে। তখন বাস্তব ঘটনায় ঘা খাবার কোনো ভয় নেই, ভয় নেই আর অকারণ স্বপ্ন-ভঙ্গের। তপ্ত আবেগে গীতিকাব্যের ভাষায় তারা চিঠি লেখে— সপ্তাহে তিনবার না হলে দুবার তো বটেই। তাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের খবর তাতে নেই, নেই বা আশেপাশের সাধারণ সামান্য জিনিসের। গুরু-গম্ভীর স্বরে জীবনের বৃহত্তর সমস্যার তারা সমাধান বাতলায়। সমস্যাটা যেমন গম্ভীর সমাধানটা তেমনি নৈরাশ্যজনক। উৎসাহ শেষদিকে নেমে আসে অবসাদে। তা হলে কি হয়, একে অন্যকে সম্বোধন করে—"আমার আনন্দ, আমার আশা, আমার ভালো-বাসা, আমার আপনার জন।" তুমি আমার আত্মা—এ প্রয়োগটা অত্যন্ত বেশি চলে তাদের মধ্যে। তাদের বর্তমান জীবন বড় দুঃখী, তারই রঙিন বর্ণনায় ভাষা পঙ্কিল হয়ে ওঠে। বন্ধুর এত দুঃখের মধ্যে আবার নিজে সে তার দুঃখের বোঝা এনে চাপাচ্ছে—এই করুণ হতাশার সুরটাই বড় বেশি উচ্চারিত।

"বন্ধু," লেখে জাঁ-ক্রিসতফ: "তোমার জীবনে আমি আবার আমার দুঃখ নিয়ে আসি এ দুঃখের আর আমার অন্ত নেই। তুমি কষ্ট সইবে এ আমি সইতে পারব না কিছুতেই। এ কখনোই হতে পারবে না। এ কখনোই হতে দেবনা আমি।" (শেষ লাইনটার নিচে সে গভীর করে দাগিয়ে দিলে—এত জোর দিয়ে দিলে যে কাগজ প্রায় ছিঁড়ে

গেল।) "তুমিও যদি কষ্ট পাও তা হলে জীবনধারণের শক্তি আমি কোথায় সংগ্রহ করব? তোমাকে ছাড়া আমার আর কোথাও সুখ নেই। তুমি সুখী হও! দুঃখের সমস্ত বোঝার ভার আমি একলা বহন করব। আমাকে ভুলে যেওনা। আমাকে ভালোবেসো। ভালোবাসা পাবার আমার এত ক্ষুধা জীবনে। এত প্রয়োজন! তোমার ভালোবাসা থেকে যে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় তাতেই আমি সঞ্জীবিত হই। তুমি যদি জানতে, কেমন আমি কাঁপছি। আমার হৃদয়ের মধ্যে হাড়-কাঁপানো কনকনে শীত এসে বাসা নিয়েছে। তাই তোমার আত্মাকে আমি আলিঙ্গন করি। তোমার উত্তাপ-উদ্বেল আত্মা।"

"আমার ভাবনা তোমার ভাবনাকে চুম্বন করে।" উত্তর দেয় অটো।

"আমার দুই হাতে তোমার মুখখানি তুলে ধরি।" লেখে আবার ক্রিসতফ: "যা আমার ঠোঁট দিয়ে কখনো করিনি বা করব না তাই আমার সমস্ত জীবন সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে করি। তোমাকে ভালোবাসি আর তোমাকে চুমু খাই।"

অটো সন্দেহসূচক প্রশ্ন করে পাঠায়: "আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি তুমি কি আমাকে তেমনি ভালোবাসো?"

"হা ঈশ্বর!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্রিসতফ: "তোমার মতন পারব কি করে? তোমার চেয়ে দশ, একশো, হাজারগুণ বেশিই যে ভালো-বাসতে হয় আমাকে। আশ্চর্য! তুমি নিজে সেটা বোঝনা? তোমার হৃদয়ে কি করে সাড়া জাগাব আমাকে বলে দিতে পারো?"

"আমাদের কি অপরূপ বন্ধুত্ব!" আনন্দে বিভোর হয়ে যায় অটো: "পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কি আর দুটি হয়েছে? এ স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মত নতুন! হায়, যেন কোনো দিন না এ মিলিয়ে যায় শূন্যে!

হায় এমন যদি কোনোদিন হয়, তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না ?"

"তুমি কী অসম্ভব মূর্খ, হে বন্ধু!" ক্রিসতফ খোঁচা মারে : "মাপ করো, তোমার এই দুর্বল ভয়ে আমি চটে যাচ্ছি। তুমি কি করে মনে আনতে পারলে, তোমাকে আমি ভালোবাসব না একদিন! আমার পক্ষে বাঁচা মানেই তোমাকে ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার সামনে মৃত্যু পঙ্গু। তুমি নিজে ইচ্ছে করে সে ভালোবাসাকে যদি নষ্ট করে দিতে চাও, তাহলেও তুমি তা পারবে না। যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো, যদি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়ে যাও, আমি প্রসন্ন মনে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েই মরব, তোমার প্রেমের মধুরতায় আমাকে তুমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছ ব'লে। তাই, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান নেই—ওরকম কাপুরুষ সন্দেহ করে আমাকে উত্ত্যক্ত কোরো না।"

হপ্তাখানেক পরে আবার লিখল ক্রিসতফ :

"তিন দিন তোমার চিঠি নেই। আমার ভয় ধরেছে। আমাকে কি ভুলে গেলে? ভাবতেই গায়ের রক্ত শুকিয়ে আসছে।...তাছাড়া আবার কি...নিশ্চয়ই তাই। সেদিন দেখলুম আমার প্রতি তুমি কেমন উদাসীন। তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না। তুমি আমাকে ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবার জন্যে উৎসুক হয়েছ!...শোনো! যদি আমাকে ভুলে যাও, যদি আমার প্রতি কৃতঘ্নতা করো, শোনো, আমি তোমাকে কুকুরের মতন গুলি করে মারব।"

"হে অন্তরবাসী বন্ধু, তুমি আমার উপর অবিচার করছ।" আর্তনাদ করে উঠল অটো : "আমার চোখে জল নিয়ে এসেছ। আমি নিশ্চয়ই এর যোগ্য ছিলুম না। কিন্তু যা তোমার খুশি তাই তুমি করতে পারো আমাকে নিয়ে। আমার উপর তোমার অখণ্ড অধিকার। হৃদয় যদি

ভেঙেও দাও তবু হয়তো একটি কণা কোথাও বেঁচে থাকবে যা অনন্তকাল তোমাকে ভালোবাসবে।"

"হা ভগবান!" কেঁদে উঠল ক্রিসতফ: "আমার বন্ধুকে আমি কাঁদিয়েছি।···আমাকে মারো, আমাকে জর্জর করো অপমানে, আমাকে তোমার পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দাও! আমি হতভাগ্য! নরকের কীট! তোমার ভালোবাসা পাবার আমি যোগ্য নই।"

খামের উপরে ঠিকানা লেখবার নতুন কায়দা তাদের—টিকিট লাগাবে হয়তো উল্টো করে, নয়তো খামের নিচে একেবারে কোণ ঘেঁসে। আর-সকলের মামুলি ঢঙের বাজে চিঠি তো এগুলি নয়। প্রেমের কত মধুর রহস্যে ভরা এ সব চিঠি!

গান শিখিয়ে ফেরবার পথে জাঁ-ক্রিসতফ রাস্তায় একদিন দেখল অটোকে, তারই সমবয়সী এক ছেলের সঙ্গে হাসতে-হাসতে কথা কইতে-কইতে চলেছে। যেন অনেকদিনের মেশামেশি দুজনের মধ্যে। হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল ক্রিসতফ। লুকিয়ে-লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল যতক্ষণ না রাস্তার বাঁক ঘুরে মিলিয়ে গেল ওরা। ওরা দেখতে পায়নি তাকে। একা একা ফিরে চলল বাড়ি। যেন সূর্যের উপর দিয়ে চলে গেল একটা মেঘ। রোদের জগতে হঠাৎ অন্ধকার।

পরদিন রবিবারে আবার যখন তাদের দেখা হল ক্রিসতফ প্রথমেই কিছু বললে না। আধঘন্টা নীরবে হাঁটবার পর সে হঠাৎ রুদ্ধস্বরে বললে, "তোমাকে গত বুধবার দেখলুম ও-পাড়ায়—"

"ও, হ্যাঁ।" লজ্জায় লালচে হল অটো।

"তুমি একা ছিলে না—"

"না, আমার সঙ্গে একজন ছিল।"

ঢোক গিলল ক্রিসতফ। যেন কিছুই নয় এমনি হালকা হবার চেষ্টায় বললে, "কে ও ?"

"সম্পর্কে আমার ভাই। ফ্রাঁজ।"

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ক্রিসতফ। বললে, "কই আমাকে তার কথা বলোনি তো কোনোদিন !"

"বলিনি নাকি ? রিন্‌বাশে ও থাকে।"

"প্রায়ই দেখা হয় তোমাদের ?"

"কখনো কখনো ও আসে এখানে, আমাদের বাড়িতে।"

"তুমিও যাও ওখানে মাঝে মাঝে ? ওর সঙ্গে থাকো ?"

"তা যাই মাঝে মাঝে।"

"তাই—" একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুঝি ক্রিসতফ।

একটা পাখি গাছের ডালে ঠোকর মারছে—তারই দিকে আঙুল দেখাল অটো। পাড়ল অন্য কথা। আগের কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

মিনিট দশেক পরে ক্রিসতফের মুখে আবার শোনা গেল সেই পুরোনো নালিশ :

"ওর সঙ্গে তোমার খুব ভাব ?"

"কার সঙ্গে ?" জানে কার কথা বলছে তবু কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইল অটো।

" তোমার সেই ভাইয়ের সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, ভাব বৈ কি। কেন বলো তো ?"

" না এমনি।"

সে ভাইকে অটোর বিশেষ পছন্দ নয়, কেননা সব সময় আজে-বাজে

ঠাট্টা করে সে বিরক্ত করে অটোকে। কিন্তু অদ্ভুত একটা দুর্বুদ্ধি হঠাৎ পেয়ে বসল তাকে। বললে, "ভারি চমৎকার ছেলে ও।"

"কে?" মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ক্রিসতফ। কে, জানতে আর তার বাকি নেই—তবু যেন জানেনা এমনি ভাব করল মুখের।

"ক্রাঁজ।"

ক্রিসতফ কি বলে তাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল অটো, কিন্তু ক্রিসতফ এমন ভাব করল যেন নামটা তার কানে ঢোকেনি। হ্যাজেল গাছ থেকে একটা কেঁকড়ি কাটছে সে।

অটো বললে, "বড় মজার লোক ক্রাজ। কত রাজ্যের গল্প যে জানে।"

অন্যমনস্কের মত শিস দিচ্ছে ক্রিসতফ।

অটো আবার ঘা মারল: "আর কী চালাকচোস্ত ছেলে! তা ছাড়া একজন নামজাদা লোক।"

ক্রিসতফ ঘাড় ঝাঁকাল। এমন একখানা ভাব—যেন, কি এসে যায় ও ছেলের খবরে। ও ছেলের খবরে তার কী মাথাব্যথা!

তবু আবার খোঁচা মারবে অটো। তখন হঠাৎ ধমকে উঠল ক্রিসতফ। দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে বললে, "ও পর্যন্ত ছুটি এসো দুজনে। দেখি কে আগে যেতে পারে—"

সমস্ত সন্ধেয় আর তারা ও-বিষয়ে কথা বললে না, সাবধান হয়ে গেল যেন ওকথায় না ছিটকে পড়ে। নির্জীব হয়ে পড়ল দুজনে, একটা কৃত্রিম শিষ্টাচারের আশ্রয় নিয়ে। ক্রিসতফের পক্ষে এ ভাবটা বজায় রাখা ভীষণ কষ্টকর। গলায় তার কথা আটকে যাচ্ছে। চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে থেকে থেকে। শেষকালে আর সে সহ্য করতে পারল না। রাস্তার মাঝখানেই অটোর দিকে পিছন ফিরে তাকালো। এগিয়ে

গিয়ে সজোরে তার হাত চেপে ধরল, আর বললে তপ্ত আগুনের মত :

"শোনো অটো! আমি দেব না, দেব না তোমাকে ফ্রাঁজের সঙ্গে ভাব করতে, কিছুতেই না। তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালোবাসবে, আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে এ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না আমি। কিছুতেই না। তুমি জানো, তুমিই আমার সর্বস্ব। তুমি পারো না, কিছুতেই পারো না আমাকে ছেড়ে যেতে। তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, মৃত্যু ছাড়া আমার আর কেউই বন্ধু থাকবে না পৃথিবীতে। আমাকে যদি তুমি ছেড়ে যাও, আমি জানিনা আমি কী করব, কী করতে পারি! আমি আত্মহত্যা করব, তার আগে খুন করব তোমাকে। না, অসম্ভব আমাকে মাপ করো অটো—"

ক্রিসতফের চোখ থেকে পড়তে লাগল জলের ফোঁটা।

এই শোকের সরলতায় অটোর ভিতরটা নড়ে-নড়ে উঠল, যেন একটু বা ভয় হল তার। তাড়াতাড়ি সে শপথ করে বসল জাঁ-ক্রিসতফের মত কাউকে সে ভালোবাসেনি, ভালোবাসবেও না জীবনে, ফ্রাঁজ তার কেউ নয়, কিছু নয়; আর ক্রিসতফ যদি বলে ফ্রাঁজের সঙ্গে সে আর দেখা করবে না কোনোদিন।

অটোর এই সব কথা যেন মদিরার মত মনে হল ক্রিসতফের, তৃষার্তের মত সে পান করলে আকণ্ঠ। তার অসাড় হৃদয়ে যেন নবজীবনের স্পন্দন এল। বুক ভরে সে নিশ্বাস নিল, হেসে উঠল উচ্ছসিত কল-শব্দে। প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিল অটোকে। এমন একটা নাটক করে বসল বলে তার লজ্জার এখন অবধি নেই, কিন্তু যাই বলো, হৃদয় থেকে একটা প্রকাণ্ড পাথর নেমে গেছে। দুজনের মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে,

হাত ধরাধরি করে, তাকাল একে অন্যের চোখের দিকে। নড়ল না, সরল না, ঘুরল না—ঠায় দাঁড়িয়ে রইল তাকিয়ে। চোখে তাদের যেমন আনন্দ তেমনি হয়তো বা একটু লজ্জার ছোঁয়াচ। স্তব্ধতার পর ফিরে পেল আবার তাদের সেই পুরোনো লঘুতা; সেই পুরোনো স্ফূর্তি। আবার মিশে এক হয়ে গেল দুজনে।

কিন্তু এই শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য নয়। অটো বুঝতে পারল ক্রিসতফের উপর সে কতটা শক্তি ধরে, তার উপর তার কতটা প্রভাব। তাই সে শক্তির অভিচার করতে চাইল। সে জানত কোথায় ক্রিসতফের পচা ঘা, তাই তার বারে বারে লোভ হতে লাগলো সেখানে সে তার আঙুলের খোঁচা মারে। ক্রিসতফকে চটিয়ে দিয়ে তার যে বিশেষ আনন্দ তা নয়—বরং তাতে তার কষ্টই হয় রীতিমত—কিন্তু এতে করে ক্রিসতফকে দুঃখ দিয়ে সে তার শক্তির ঝাঁজটা আস্বাদ করতে চায়। এই একরকম একটা নেশা। আসলে অটো মন্দ নয়, তার প্রাণ একটি কোমলহৃদয় খুকির প্রাণ।

যতই কেননা শপথ করুক, দেখতে পাবে ফ্রাঁজের সঙ্গে বা অন্য কোনো সঙ্গীর সঙ্গে বাহুবদ্ধ হয়ে বেড়াতে চলেছে অটো। খুব হৈ-চৈ করছে তারা, হেসে-হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আর সে হাসি তত হাসবার জন্যে নয় যত দেখাবার জন্যে। এই নিয়ে জাঁ-ক্রিসতফ যখন তাকে তিরস্কার করতে এসেছে তখন গোড়ার দিকে মুখ টিপে হেসেছে অটো, ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে কথাটা। কিন্তু যখন দেখতে পেয়েছে চাউনি বদলে যাচ্ছে ক্রিসতফের, ঠোঁট কাঁপতে সুরু করেছে, তখনই কণ্ঠস্বরে মধু আনতে হয়েছে, আবার প্রতিজ্ঞা করেছে আর সে এমন কাজ করবে না। কিন্তু পর দিনই আবার বন্ধু জুটিয়ে আবার তার সেই উচ্চ কলহাস্য।

নিদারুণ চিঠি লিখছে ক্রিসতফ :

"বিশ্বাসঘাতক ! তোমার মুখ যেন আর না দেখি। যেন তোমার কথা আর না কানে আসে। তোমাকে আমি চিনি না, জানি না, দেখিনি কোনোদিন। তোমাকে ও তোমার মত আর সব কুকুরের সর্বনাশ হোক।"

প্রত্যুত্তরে আসে অটোর একটি অশ্রুপূর্ণ কথা, কিংবা তার অনুরক্তির চিহ্নস্বরূপ একটি বা সামান্য ফুল। অমনি অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যায় ক্রিসতফ, মধুরতার রসে কলম সিক্ত করে আবার সে লেখে :

"হে আমার স্বর্গদূত, আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। আমার মূর্খতাকে মার্জনা করো। তুমি অসাধারণ, সর্বোত্তম। তোমার কনিষ্ঠ আঙুলটির দাম গোটা একটা জঁা ক্রিসতফের চেয়েও বেশি। তোমার হৃদয় অফুরন্ত স্বর্গ-স্নেহের ভাণ্ডার। সজল চোখে তোমার ফুলটিকে চুম্বন করি। সেই ফুলটির অভিষেক করি আমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়ের রক্তে। ফুলটিকে বিদ্ধ করতে চাই আমার ধমনীতে, যাতে ফুলের স্পর্শে আমার রক্তপাত হয়। যেন বুঝি তোমার অপার করুণা, অপার মাধুর্য, আর আমার এই জঘন্য মূর্খতা—"

কিন্তু, যে যাই বলুক, ক্রমে ক্রমে দুজনে শ্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল। ছোটখাটো ঝগড়াই বন্ধুতাকে বাঁচিয়ে রাখে। অটো কেন তাকে বারে-বারে এমনি মূর্খের মত চটিয়ে দেয়, তারই জন্যে অটোর উপর রাগ ক্রিসতফের। না, অটোর দোষ কী! সে কেন অমন চটে যাবে অসুরের মত! অটো নয়, তার ঐ আসুরিক রাগই একমাত্র দায়ী। বন্ধুতার পরীক্ষায় ডাক পড়েছিল তার, তার উৎসুক ও আসক্ত হৃদয়ের, আর দাবি করেছিল তার কাছে তার অখণ্ড হৃদয়, তার সমস্ত সত্তা তার অবিভক্ত ভক্তি। কিন্তু কী চমৎকার পরীক্ষাই সে দিল! বয়ে নিয়ে

এল কী চমৎকার উপহার! বন্ধুতার প্রত্যাশাই সে করে, নিজে সে দেখাতে পারল কোন বন্ধুতা!

তবু এই হয়তো ভেবেছিল ক্রিসতফ সে যেমন বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করতে উৎসুক, বন্ধুও তেমনি করে বিসর্জন দেবে নিজেকে, নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে। কিন্তু ক্রমশ সে উপলব্ধি করতে লাগল তার অনমনীয় চরিত্রের মাপেই এ পৃথিবী তৈরি হয় নি। হয়তো এমন জিনিসই সে প্রত্যাশা করেছে যা এ পৃথিবী দিতে পারে না, যা নেই আর কোনো লোকেরই তহবিলে। তখন নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইল ক্রিসতফ। নিজেকেই সে ধিক্কার দিতে লাগল, তার মত এমন অহম্মন্য লোক আর দুটি নেই দুনিয়ায়। বন্ধুর স্বাধীনতায় সে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে চায়, তার সমস্ত স্নেহ সে একলাই একচেটে করে নেবে! মনে যতই কেন লাগুক না, বন্ধুকে সে ছেড়ে দেবে বন্ধন থেকে। যেখানে খুশি সে ঘুরে বেড়াক, যার সঙ্গে তার প্রাণ চায় সে মিশুক। অসম্মানের ধূলো লাগুক তার নিজের গায়ে, সে অটোকে দস্তুরমত পিড়াপিড়ি করতে লাগল যেন ফ্রাঁজকে সে তার কথা শুনে আর তাচ্ছিল্য না করে। তাকে ছেড়ে আর কারও সঙ্গে মিশে আনন্দের সন্ধান যদি সত্যি অটো পায়, তাতেই ক্রিসতফ আনন্দিত।

যেমন বললে ক্রিসতফ, তেমনি তাকে মান্য করলে অটো। এই আশা পালনের মধ্যে ছিল কিছুটা হয়তো বিদ্বেষের সংস্পর্শ। কেননা যখনি সেই আজ্ঞা অবিকল পালন করে অটো, ক্রিসতফ তখন অভিমান দেখিয়ে ক্ষান্ত হয় না, ক্রোধে মারমুখো হয়ে ওঠে।

যদি দরকার হত, তার পরিবর্তে অন্য বন্ধু ধরার জন্যে অটোকে অনায়াসে ক্ষমা করতে পারত ক্রিসতফ। কিন্তু তার জন্যে মিথ্যে কথা কেন? সেই মিথ্যেটাই সহনাতীত। অটো আসলে মিথ্যাবাদী

নয়, নয় বা ভণ্ড, কিন্তু তার পক্ষে ঠিক ঠিক সত্য বলা তোতলার পক্ষে ঠিক ঠিক শব্দোচ্চারণ করার মতই দুরূহ। যা সে বলে তা পুরোপুরি সত্যও নয়, পুরোপুরি মিথ্যেও নয়! হয় স্বাভাবিক ভীরুতা নয় নিজের মনোভাবের অনিশ্চয়তার দরুন কখনো সে নির্দিষ্টরূপে কিছু বলতে পারে না। তার উত্তরগুলো ঝাপসা, অস্পষ্ট, আর তা ছাড়া, কেমন যেন সে একটা ধোঁয়াটে রহস্যের পক্ষপাতী, একটু বা গোপন ফিসফিসানির। এতেই বেশি করে রাগ ধরে ক্রিসতফের। যখন এমনি চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় অটো, আর এসব ছলনা বন্ধুতার নীতিশাস্ত্রে দস্তুরমতো অপরাধ, তখন সরাসরি দোষ স্বীকার না করে উল্‌টে যত সব আষাঢ়ে গল্প পেড়ে বসে। আত্মদোষক্ষালনের যত সব পঙ্গু ওজুহাত। একদিন ক্রিসতফ গুরুতর চটে গিয়ে সটান মেরে বসল অটোকে। ভেবেছিল এইখানেই চিরকালের মত পড়ে যাবে যবনিকা, এই ঔদ্ধত্যের আর ক্ষমা মিলবে না। কিন্তু, না, কতক্ষণ মুখ ভার করে থেকে অটো ফের ফিরে এল গুটিগুটি, যেন কিছুই ঘটেনি সংসারে। ক্রিসতফের এই আঘাতের বিনিময়ে তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই—তাতে অসন্তোষের স্পর্শ না থেকে বরং যেন কোথায় একটু মাধুর্য লেগে আছে! তবু তার এসব ছলনায় ক্রিসতফ যে কেন নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করবে, কিছুতেই ভেবে পায় না অটো। তার মিথ্যা তার, তাতে ক্রিসতফের কী! নিজেকে ক্রিসতফের চেয়ে তার অনেক বড় মনে হয়, মনে মনে অনুকম্পা করে সে ক্রিসতফকে। আর মার খেয়ে নিঃশব্দে কেন হজম করবে অটো, কেন উলটে প্রতিঘাত করবে না, এতে ক্রিসতফও ফণা উঁচিয়ে থাকে।

সেই প্রথম দিনের দৃষ্টিতে পরস্পরকে আর তারা দেখে না আজকাল। তাদের দোষ ত্রুটি বেরিয়ে পড়েছে দিনের আলোতে।

আটোর চোখে জাঁ-ক্রিসতফের সেই স্বাধীনতার দীপ্তিটি আর রমণীয় নয়। যখন এক সঙ্গে তারা বেড়ায়, ক্রিসতফের মত এমন ক্লান্তিকর সহচর আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে হয় না। শালীনতা বা সমীচীনতার দিকে তার এতটুকু নজর নেই। সর্বত্র একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব। যেমন খুশি সে পোষাক পরে, কখনো বা ছুঁড়ে ফেলে দেয় কোট, কখনো বা ওয়েস্ট-কোটের বোতামগুলো খুলে রাখে। কখনো বা কলারের বোতাম আটকায় না, গুটিয়ে নেয় শার্টের হাতা, লাঠির তলায় টুপি ঝুলিয়ে চলে। আর চলে হাওয়াতে বুক চিতিয়ে। যখন চলে হাত দুটো বেজায় দোলায়, শিস দেয়, গলা ছেড়ে গান ধরে বসে। অসম্ভব প্রগলভতায় সারা মুখ লাল হয়ে যায়, ঘামে আর ধূলোয় একাকার হয়ে ওঠে। হাট থেকে ফিরছে কোন এক গেঁয়ো চাষা এমনি মনে হয় ক্রিসতফকে। অভিজাত অটো সারা শরীরে কুণ্ঠিত হয়ে যায়—এমন জংলির কিনা সে সঙ্গী! লোকে দেখতে পেলে কি ভাববে না জানি তাকে। একটা গাড়ি-টাড়ি আসছে দেখলে আলগোছে সে পেছিয়ে পড়ে—প্রায় দশ বারো পা সরে যায়—যাতে এই ধারণা হয় সে একা একা বেড়াতে চলেছে, তার কোনো সঙ্গী-সহচর নেই।

ফিরতি পথে হয় কোনো সরাই নয় কোনো ট্রেনের কামরায় যখন তারা বসে তখন অনর্গল কথা বলা চাই ক্রিসতফের। সে অবস্থাটাও কম বিরক্তিকর নয়। আর, কথা বলবেও তারস্বরে, যা মুখে আসবে তাই, যা মুখে না আসবে তাও। এমন একটা মেলামেশার ভাব দেখাবে অটোর সঙ্গে, অটো মুষড়ে পড়ে। যারা সমাজে-সংসারে নামজাদা তাদের সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলের মতো মতামত দেবে ক্রিসতফ। এমন কি দু-চার হাত দূরে যারা বসে আছে তাদের চেহারার সমালোচনা করবে। নয়তো বাড়ির গেরস্তালির কথা কিম্বা নিজের

ব্যক্তিগত স্বাস্থের কথা পাড়বে। এত খুঁটিনাটিতে ঢুকবে যে মেজাজ বিষিয়ে দেবে। কতবার চোখ পাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে শাসিয়েছে অটো, কিন্তু বৃথা, ক্রিসতফকে দমানো অসম্ভব! ও সব ইশারা লক্ষ্যই করেনা ক্রিসতফ, ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না; একা এলেও যেমনি সঙ্গে বন্ধু থাকলেও তথৈবচ। আশে-পাশের প্রতিবাসীরা হাসে আর অটোর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। ধারণা করে ক্রিসতফ স্থূল, বর্বর—ভেবে পায়না এ লোকের সঙ্গে-সান্নিধ্যে সে আগে-আগে আনন্দ পেত কি করে!

সব চেয়ে গুরুতর হচ্ছে কোনো বিধি-বন্ধনেরই ধার ধারে না ক্রিসতফ। বেড়াই হোক আর রেলিংই হোক, দেয়ালই হোক আর ঘেরা জায়গাই হোক, সে তা জোর করে অতিক্রম করে যাবেই। কোনো নিষেধকে সে মান্য করে না, গ্রাহ্য করে না শাসন বা জরিমানার ভয়কে। যা কিছু তার মুক্তিকে খর্ব করে সঙ্কুচিত করে তারই উপর সে খড়্গহস্ত। যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বার্থপর ভোগের জন্যে সুরক্ষিত রাখতে চায় তারই বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। প্রতি মুহূর্তে অধিকতর ভয়ের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধছে অটো। তার সমস্ত প্রতিবাদ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। তার শাসন-শোধনের দাম নেই কানাকড়ি। শুধু একটা বাহবার নেশায় এমনি ভেসে পড়েছে ক্রিসতফ।

একদিন বাড়ি ফিরছে দুজনে, ক্রিসতফের পিছনে অটো, পথের পাশে পড়ল কার একটা বাগান। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাথায় ভাঙা-কাচের টুকরো বসানো। যেহেতু তীক্ষ্ণ নিষেধ রয়েছে উঁচিয়ে, সে-দেয়াল উত্তীর্ণ হতেই হবে ক্রিসতফকে। অটোকেও পার করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পড় তো পড়, একেবারে বাগানের মালীর মুখোমুখি গিয়ে পড়ল। তেড়ে এল মালী, গালাগালের গোলাগুলি বর্ষণ করতে

লাগল অজস্র। পাকড়াও করলে ওদেরকে, অটোকে রাখলে পুলিশে দেবার ভয় দেখিয়ে। তারপর, শেষ পর্যন্ত, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে। এই অপমানটা অটোর কাছে খুব সন্তোগ্য বলে মনে হয়নি আগাগোড়া। তার ভয় হয়েছে, জেলই তার হয়ে গেল বুঝি, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল তার। বোকার মতন কৈফিয়ৎ দিতে লাগল, ভুল করে সে ঢুকে পড়েছে, কোথায় যাচ্ছে না জেনে অন্ধের মত অনুসরণ করেছে ক্রিসতফকে। তার কোনো দোষ নেই।

তারপর যখন নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছল দু'জনে, আনন্দে আশ্বস্ত না হয়ে রাগে বিষিয়ে উঠল অটো। ক্রিসতফকে তর্জন করে উঠল। তোমারই জন্মে আমার এই অকারণ লাঞ্ছনা। তুমিই আমাকে শুধু শুধু এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলে। ক্রিসতফ তার দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করলে। বললে, "মিনিমুখো!"

চলল কথা-কাটাকাটি। যদি বাড়ি ফেরবার পথ জানা থাকত অটোর, সে সরে পড়ত সরাসরি। উপায় নেই, সঙ্গ নিতেই হবে ক্রিসতফের। কিন্তু এমন ভাবে চলতে লাগল দুজনে, যেন কেউ কারু সঙ্গে যাচ্ছে না।

একটা ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। এতক্ষণের রাগারাগির মধ্যে দুজনে কেউ লক্ষ্য করে নি এই ঘোরঘটা। পতঙ্গের গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠেছে দিশপাশ। হঠাৎ চারদিক কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একটা গম্ভীর স্তব্ধতায় তারা সজাগ হয়ে উঠল। উপরের দিকে তাকাল চোখ তুলে। দেখল সমস্ত আকাশ কাজলের মত কালো হয়ে গেছে, তাল-তাল ভারী মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন, আনম্র। নানা দিক ছুটোছুটি করছে মেঘের বাহিনী, যুদ্ধলিপ্ত সৈন্যবাহিনীর মত। আকাশের কোন অদৃশ্য বিন্দুটি এখনো শূন্য আছে, শুভ্র আছে, তারই

দিকে যেন তাদের একাগ্র লক্ষ্য। কোথাও একটুকু শাদার আঁশ থাকতে দেওয়া হবে না, অখণ্ড আকাশকে কালোয় কালো করে তুলতে হবে। অটোর ভয় করে উঠল। কিন্তু উপায় নেই সে-ভয়ের সংবাদ জানায় ক্রিসতফকে। আর ক্রিসতফ? সে যেন কিছুতেই লক্ষ্য করছে না। এ সব দেখে তার ভয় পাবার বা বিচলিত হবার কি হয়েছে? তার চোখে মুখে নির্মম একটা উপেক্ষার উৎসাহ। হয়তো বা আততায়ীর আনন্দ।

কিন্তু, কথা কেউ কিছু না বলুক, তারা অজান্তে একে অন্যের কাছে সরে এল আস্তে-আস্তে। এই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে তারা ছাড়া আর কেউ নেই, নেই কোথাও আরেকটা মানুষের ছিটেফোঁটা। অনড় স্তব্ধতা চারদিকে। বাতাসে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, গাছের একটা কচি পাতাও কাঁপছে না মৃদু-মৃদু। জ্বরতপ্ত শ্বাসরোধ করে সমস্ত প্রকৃতি যেন ধ্যানে বসেছে।

হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে বাতাসের একটা ঘূর্ণি উঠল, দুলে উঠল গাছের ডালপালা, হেলে পড়ল হাওয়ায় চাবুক খেয়ে। কতক্ষণ পরে আবার নামল সেই অনড় স্তব্ধতা, প্রকৃতি আবার বসল শ্বাসরোধ করে। আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই নৈঃশব্দ্য, ভয়ঙ্কর সেই রোধ-সমাধি।

অটোর গলা কেঁপে উঠল। বললে, 'ঝড় আসছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা উচিত আমাদের।'

'তাই তো যাচ্ছি।' বললে ক্রিসতফ।

কিন্তু, দেরি হয়ে গেছে অনেক। চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, গর্জে উঠল আকাশের সেনানীরা, গড়িয়ে যেতে লাগলো মেঘের তরঙ্গমালা। চকিতে নেমে এল দীর্ঘধারা তীক্ষ্ণ বৃষ্টি। প্রমত্ত ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের উপর, বেষ্টন করে ধরল, বিদ্যুতের কশায় চমকে-

চমকে উঠল, বজ্রের গর্জনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। আর ঘনবর্ষণের অকার্পণ্যে ভিজে গেল আপাদমস্তক। একটা পরিত্যক্ত মাঠের মধ্যে পড়ে আছে তারা, নিকটতম যে বাড়ি তা তাদের থেকে আধঘণ্টার পথ। অন্ধকার চিরে চিরে বিদ্যুতের দ্রংষ্টা, জলের মধ্যে আগুনের হলকা—দুজনে অসম্ভবের আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল। চেষ্টা করল ছুটতে, কিন্তু ভিজে জামা-কাপড় গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে, সহজে হাঁটবারও আর জো নেই। জুতো থেকে পা হড়কে-হড়কে যাচ্ছে—জুতো তো নয় ঢোল! সমস্ত গা বেয়ে বহু রেখায় গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। দাঁতে দাঁতে খটাখট স্নুরু হয়েছে অটোর, রাগে সে দুর্বার হয়ে উঠেছে। আর, সমস্ত রাগ এই হঠকারী ক্রিসতফের উপর। দংশনের মত তীক্ষ্ণ তিরস্কার করছে সে ক্রিসতফকে। বলছে, আর এগোব না আমি। যা হবার তা হোক, এই এখানে বসে পড়লাম। এই ভাবে কি করে এগুনো যায়? চষা মাঠের মাঝখানে ভিজে মাটির উপর সে গা ঢেলে ঘুমিয়ে পড়বে। কোনো জবাব দিচ্ছে না ক্রিসতফ। সে সমানে হেঁটে চলেছে। বিদ্যুৎ আর বৃষ্টি যতই তার দৃষ্টি অন্ধ করে দিক, যতই বজ্র তাকে শাসন করুক, তবু সে বিরত হবে না কিছুতেই। কাজটা একটু কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বীকার করতে রাজি নয় ক্রিসতফ।

আবার, তক্ষুনি, হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। কী অপূর্ব সেই ক্ষান্তি! যেমন আকস্মিক এসেছিল তেমনি চলে গেল আচমকা। কিন্তু ছেলে দুটোর দিকে তাকানো যায় না, তাদের অবস্থা এমন করুণ! আহা, ক্রিসতফের পোশাকের আবার কী উনিশ-বিশ হবে! আগেতেও যেমন ছন্নছাড়া ছিল এখনো প্রায় তেমনি। কিন্তু অটো, যে কিনা এত ছিমছাম এত ফিটফাট, পোষাক-আসাক সম্বন্ধে যার এত খুঁতখুঁতুনি,

তার বড় নাজেহাল চেহারা। যেন পোশাক-পরা অবস্থায়ই সে স্নান করে এসেছে বাথরুম থেকে। আর যতই ঘুরে ঘুরে তাকে দেখে ততই হেসে ওঠে ক্রিসতফ। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। কী চমৎকার ছিরি হয়েছে বন্ধুবরের!

এত ক্লান্ত অটো যে রাগ করবার তার ক্ষমতা নেই। কি হল কে জানে, ক্রিসতফের কেমন করুণা হল, ফুল্ল মনে হালকা সুরে কথা বলা সুরু করলে। চোখের দৃষ্টির ঝাঁজটা তবু মুছে দিতে পারছে না অটো। একটা ফার্মের কাছে এসে ক্রিসতফ দাঁড় করাল অটোকে। প্রকাণ্ড একটা জ্বলন্ত চুল্লীর কাছে বসে তারা জামা-কাপড় শুকিয়ে নিলে, গরম মদ খেলে খানিকটা। এ দুর্দৈব ঘটনাটা ক্রিসতফের কাছে একটা মজার ব্যাপার, হেসেই সেটাকে সে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু অটোর কাছে মোটেই সেটা খেয়ালী হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার মত লঘু নয়, এ সব তার রুচির বাইরে। তাই সে বিষণ্ণ হয়ে রইল, রইল নিঃশব্দ হয়ে। বাকি রাস্তাটা গুমোট হয়ে রইল। ভার-ভার মুখে এতটুকু হাসি ফুটল না কারু। বিদায় নেবার আগে পরস্পরের করস্পর্শ করলে না।

তারপর এক সপ্তাহের বেশি তাদের সাক্ষাৎ নেই। একে অন্যের সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে হল দুজনকে। কিন্তু এক রবিবারের বিচ্ছেদের পরই তারা এত শ্রান্ত হয়ে পড়ল যে রাগের জ্বালা মিলিয়ে গেল— অন্যকে শাস্তি দিতে গিয়ে দেখল যে নিজেই শাস্তি নিয়েছে। যেমন হয়ে থাকে, ক্রিসতফই আগে এগিয়ে এল। বাড়িয়ে দিল হাত। সে হাত ধরবার জন্যে আগ্রহ দেখাল অটো। আর অমনি ফের ভাব হয়ে গেল দুজনের। অবনিবনা সত্ত্বেও, সাধ্য নেই এ ওকে ছেড়ে থাকতে পারে। তারা দুজনেই সমান দোষী, দুজনেই তারা সমান আত্ম-সচেতন। কিন্তু তাদের এই সচেতনাটা সরলতারই নামান্তর—এর

মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির পক্বতা নেই। সে-সচেতনতা নিজের সম্বন্ধেই সচেতন নয়। বাইরে যতই তা প্রখর-মুখর হোক অন্তরে স্বচ্ছ একটি স্নেহের উন্মুখতা জাগিয়ে রাখে।

বালিশে মুখ ঢেকে কাঁদে অটো। নিজেকে নিজে সে গল্প শোনায় মনে মনে। ভাবে সে একজন সাহসী বীর, আর তার উপর ক্রিসতফের অখণ্ড ভক্তি, অবিচল বিশ্বাস। যেন কোনো বিপদে পড়েছে ক্রিসতফ, আর সে সাহসের সঙ্গে তেজের সঙ্গে বীর্যের সঙ্গে ক্রিসতফকে রক্ষা করছে, উদ্ধার করছে। যেন তার প্রতি পূজায় আর প্রশংসায় ক্রিসতফ অবনম্র। আর এদিকে জাঁ ক্রিসতফ যখনই যা কিছু সুন্দর বা আশ্চর্য জিনিস দেখছে বা তার কথা শুনছে অমনি বলে উঠছে : "যদি এ সময় অটো এখানে থাকত!" যেন জীবনের মধ্যে অটোর মূর্তি সে স্থাপন করে অহোরাত্র তাই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সে মূর্তি এত কোমল আর মনোরম, সমস্ত রাগ আর অনুকম্পা সত্ত্বেও, তাতেই সে মশগুল হয়ে থাকছে। কবে কখন কি একটা কথা বলেছে অটো, তাই মনের মধ্যে লেগে আছে, তাইতেই একটু কারিকুরি করছে ক্রিসতফ আর তখুনি তার বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। একে অন্যেকে অনুকরণ করছে, একে অন্যের কাছে প্রিয়তর হবার জন্যে। জাঁ-ক্রিসতফের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, হাতের লেখা সব নকল করছে অটো। আর ক্রিসতফ? অটোর মুখে নিজের কথার প্রতিধ্বনি দেখে বিরক্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু এমন ভাবে আবার নিজের ভাব পরিবেশন করছে যা অটোরই প্রতিচ্ছায়া। নিজে সে লক্ষ্য করছে না কি করে সে আবার অটোকে নকল করছে। পোশাক পরছে অটোর ধরনে, অটোর ধরনে হাঁটছে, শব্দের উচ্চারণ করছে।

একটা মোহের আবেশে আছে তারা। একে অন্যের ভিতর

সঞ্চারিত হয়ে আছে। স্নেহে আর কোমলতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে হৃদয়ের পেয়ালা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ফোয়ারার মত। এ আনন্দের কারণ ক্রিসতফ, ভাবছে অটো। আর ক্রিসতফ ভাবছে এ আনন্দের সৃষ্টিকর্তা অটো ছাড়া আর কে।

কেউই তারা জানে না। এ তাদের কৈশোরের প্রথম অরুণোদয়।

কাগজ-পত্র খুলে মেলে রাখে ক্রিসতফ, কেউই তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। অটোকে যে সে চিঠি লেখে তার সে নকল রাখে। সে নকল আর অটোর উত্তরগুলো একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছে পর-পর। কিন্তু তালা বন্ধ করে রাখেনি। তার এক স্বরলিপির খাতার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল। নিশ্চিন্ত ছিল কারু চোখ যাবে না ঐ পৃষ্ঠার অন্তরালে। ভুল ভেবেছিল। তার ভাইয়েদের হিংসের কথা সে আনেনি হিসেবে।

কয়েকদিন ধরেই দেখছে, ভাইয়েরা তাকে দেখে ফিসফিস করছে, হাসাহাসি করছে। এ ওকে লক্ষ্য করে বক্তৃতার মতন কি বলছে, আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। কথাগুলো ঠিক মত ধরতে পারছে না ক্রিসতফ—আর ওদের সম্বন্ধে যা ওর চিরাচরিত কৌশল—সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে যাচ্ছে। কি ওরা বলে বা করে তাতে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাতেও ক্রিসতফ রাজি নয়। কিন্তু হঠাৎ এমন কতগুলো কথা তার কানে লাগল যেন অত্যন্ত চেনা-চেনা মনে হল। কথাগুলো যেন তারই নির্জন মনের বাসিন্দা। ক্রিসতফের আর সন্দেহ রইল না, ওরা চিঠিগুলো পড়েছে। "আমার প্রাণ", "আমার প্রিয় আত্মা",—এ বলে আর্নেষ্ট আর রুডোলফ পরস্পরকে সম্বোধন করছে। ওসব কি বলছিস রে তোরা? আগ্রহের ভান দেখিয়ে জানতে চাইল ক্রিসতফ।

ওরা মুখ খুললে না। যেন কিছুই বুঝছে না এমনি বোকার মত মুখ করে চেয়ে রইল ভাই দুটো। পরে বললে, যা খুশি আমরা এ ওকে বলে ডাকব, তোমার কী? একবার লুকিয়ে চিঠির তাড়াটা দেখে এল ক্রিসতফ। না, সব ঠিক আছে। তাই ও নিয়ে আর সে মাথা ঘামাল না।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই একদিন আর্নেষ্টকে ধরে ফেলল ক্রিসতফ। চুরি করছে আর্নেষ্ট। টেবিলের যে টানার মধ্যে লুইসা পয়সা রাখে তাই ঘাঁটাঘাঁটি করছে। পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলল ক্রিসতফ, কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। এই সুযোগ—এইবার বল্ আমার সম্বন্ধে কী তোরা জেনেছিস, কি তোরা বলাবলি করিস। আর্নেষ্টের অপরাধের ফিরিস্তি দিতে সুরু করে ক্রিসতফ, কোথায় ও কীসে দুষ্কর্ম করেছে। সে ফিরিস্তি খুব ছোট নয়। এ সব কত্তাত্তি করার তার কোনো অধিকার নেই, সে নিজের চরকায় তেল দিকগে—ঘাড় ত্যাড়া করে মুখ বেঁকিয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠে আর্নেষ্ট। তারপরে আসল ব্যাপারটা বলে ফেলে। খোলাখুলি বলে না, যা বলা উচিত নয় তাই একটা ইঙ্গিত করে বসে। আর সে ইঙ্গিত তার সঙ্গে অটোর বন্ধুত্ব নিয়ে। প্রথমটা কিছুই ঠাহর করতে পারে না ক্রিসতফ। পরে বোঝে, তাদের ঝগড়ার মধ্যে অকারণে অটোকে টেনে আনছে, অটোকে অপমান করবার জন্যে। তার মানে কী? অটোর কথা এখানে আসে কোত্থেকে? কৈফিয়ৎ দাবি করে ক্রিসতফ। মুখ টিপে হাসে আর্নেষ্ট। কিন্তু যখন দেখল ক্রিসতফ রাগে শাদা হয়ে গেছে, তখন আর টু শব্দটিও করতে চাইল না। ক্রিসতফ বুঝল এ ভাবে কোনো কথাই আদায় করা যাবে না। ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। চোখে মুখে কদর্য ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে একবার তাকাল আর্নেষ্টের দিকে,

সে দৃষ্টির আঁচ লেগে আর্নেষ্টের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। আবার উদ্ধত হয়ে উঠল, ক্রিসতফকে আহত করার উদ্দেশ্যে আবার সুরু করল গালাগাল। মুখস্ত করা মন্ত্রের মত অনর্গল। আগে যেটা বলে পরেরটা তার চেয়েও কঠিন, তার চেয়েও জঘন্য। শক্ত হাতে লাগাম ধরে নিজেকে সংযত রেখেছে ক্রিসতফ। দেখা যাক কদ্দূর যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। চোখের সামনে সে সর্বনাশের আগুন দেখলে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল. ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্নেষ্টের উপর। একটা আওয়াজ করবার পর্যন্ত সময় পেল না আর্নেষ্ট। আর্নেষ্টকে নিয়ে ক্রিসতফ তালগোল পাকিয়ে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল, তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা সজোরে ঠুকে দিতে লাগল মেঝেতে। বল, আর বলবি, মুখে আনবি ওসব কথা? প্রাণপণ চীৎকার করে উঠল আর্নেষ্ট, ছুটে এল লুইসা, ছুটে এল মেলশিয়র, ছুটে এল যে যেখানে ছিল যত বাড়ির লোক। সবাই হাত লাগিয়ে ছিনিয়ে নিল আর্নেষ্টকে। তবু শিকারের থেকে হাত ছাড়বে না ক্রিসতফ। সবাই তাকে বলে উঠল, বন্য জানোয়ার কোথাকার! সত্যিই তাই সে আজ, তাই এখন তাকে দেখতে হয়েছে অবিকল। কোটর থেকে চোখ দুটো যেন ছুটে বেরিয়ে আসছে, শোনা যাচ্ছে দাঁতে দাঁত ঘষার কর্কশ শব্দ। আবার কি করে দুই হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে শিকারের উপর এই তখন তার একমাত্র চিন্তা। কি হয়েছে? হল কি? সবাই জিগগেস করতে লাগল ক্রিসতফকে। যতই সেই প্রশ্ন শোনে ততই ক্রিসতফ জ্বলে-জ্বলে ওঠে। বলে, আমি ওকে খুন করব। ওকে খুন না করে আমি ছাড়ব না। তখন সবাই আর্নেষ্টকে জিগ্‌গেস করে, তুই-ই বল না, কি হল, কেন এই মারা-মারি? আর্নেষ্টও নিশ্চুপ।

ক্রিসতফের খাওয়া নেই, ঘুম নেই। জ্বরে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ, বিছানায় শুয়ে সে ভাসছে চোখের জলে। শুধু অটো—অটোর জন্যে তার এই লাঞ্ছনা, এত কষ্ট! তার ভিতরে একটা বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কি সাংঘাতিক ভাবে দাদাকে জখম করতে পেরেছে আর্নেষ্টের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। যা অসত্য ও অসরল, গোপন অন্ধকারে যার বাস—তারই উপর খড়্গহস্ত ক্রিসতফ। তার এই বিরুদ্ধতা এই অসহিষ্ণুতা তার মজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে। তার পনেরো বছরের জীবন যেন একটা নীতির উপর ভিত গেড়ে দাঁড়িয়ে। এই পনেরো বছর বয়সেও তার বিস্ময়কর সারল্য। স্বভাবের শুভতা আর বিরতিহীন পবিত্রতাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সর্বক্ষণ। কিন্তু এখন, এই আর্নেষ্টের কথায়, সে যেন চোখের সামনে একটা বিরাট কালো গহ্বর দেখতে পেল।

একটা নয়, অসংখ্য। নিন্দা আর সন্দেহ, কলঙ্ক আর কদর্যতা। কাছে এগোতে সাহস হয় না, দূর থেকে আভাসে যেটুকু বোঝা যায় তাইতেই নিদারুণ। ভালোবেসে বা ভালোবাসা পেয়ে আর আনন্দ নেই ক্রিসতফের। শুধু অটোর সঙ্গে বন্ধুত্বটাই নয়, বন্ধু হবার বৃত্তিটাই যেন বিষাক্ত হয়ে গেল।

শহরের লোকগুলি যেন তার দিকে কি রকম একটা বিশ্রী কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে—কেউ কেউ বা তাকে নিয়ে যেন বিকৃত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়ছে না। প্রত্যক্ষ কিছু বুঝতে পারছে না ক্রিসতফ। তবু সন্দেহের খোঁচায় নিজেই বিক্ষত করছে নিজেকে। তারপর মেলশিয়র তো সেদিন তার অটোকে নিয়ে একত্র বেড়ানোর কথাটা স্পষ্ট উল্লেখই করে বসল। হয়তো সে প্রশ্নের পিছনে কোনো ইঙ্গিত ছিল না, কিন্তু সব কিছুতেই একটা লুকানো অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্রিসতফ।

কেন কে জানে, নিজেকেই সে অপরাধী বলে ভাবছে। সবাইর চোখে ও ভাষায় যেন তারই সমর্থন।

কি আশ্চর্য, অটোও পড়েছে এমনি সঙ্কটের মধ্যে। তার দিনও এমনি ম্রিয়মান।

গোপনে দুজনের দেখা হলে মন্দ হত না। দেখা হলে কি হবে, তাদের সেই পুরোনো সম্পর্কের নিরুদ্বেগ চাঞ্চল্য আর নেই। নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই হাসিখুশি। বাজনার তারে মর্চে ধরেছে, বেরুচ্ছে না আর সেই সুরধ্বনি। দু দুটি ছেলে এমন পরিচ্ছন্ন স্নেহে ভালবাসত পরস্পরকে, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টানে কেউ কাউকে একটা চুমু খায়নি পর্যন্ত। আবার যে তাদের দেখা হবে, একে অন্যের স্বপ্নের যে ভাগ নিতে পারবে—তারা যে মাত্র বন্ধু, এর চেয়ে বেশি সুখ, বড় সুখ, আর নেই কোথাও সংসারে। সেই তারা আজ যেন স্পষ্ট অনুভব করল মন্দ মনের সন্দেহে তাদের সে সম্পর্কে কলঙ্কের দাগ লেগেছে। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, হাত ধরাধরি করছে—এর মধ্যেও যেন মন্দ। নিজেদেরই লজ্জা হচ্ছে অলক্ষ্যে। তাদের মনেও যেন লেগেছে সেই মন্দের ছোঁয়াচ। এমনতরো সম্পর্ক যে সহনাতীত।

কেউ কাউকে কিছু বলল না। কিন্তু তাদের দেখা করার দিনের সংখ্যা কমে আসতে লাগল। লিখতে চেষ্টা করল পরস্পরকে, কিন্তু ভাষার উপরে এসে পড়ছে গাম্ভীর্যের কড়া পাহারা। কেমন যেন ঠাণ্ডা, বিস্বাদ লাগছে চিঠিগুলোকে। মন ভেঙে পড়তে লাগল দুজনের। জাঁ-ক্রিসতফ লিখলে, কাজের বড্ড চাপ, ঠিক সময়ে লিখতে পারিনি চিঠি। অটো লিখলে, এত তাড়া, রাতদিন এত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, উত্তর দেবার সময় করতে পারছি না। আস্তে-আস্তে বন্ধ হয়ে গেল চিঠি লেখা। কিছুদিন পরেই অটো চলে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবনের

কটি মাস যে বন্ধুত্ব আলো দিয়েছিল, তাপ দিয়েছিল, জুড়োতে-জুড়োতে নিবে গেল শেষকালে।

নতুন আরেক ভালোবাসা পেয়ে বসল ক্রিসতফকে ; মনে হল এ ভালোবাসার কাছে জগতের আর সব আলো ম্লান আর সব আনন্দ বিশীর্ণ।

[তি ন]

মীনা

ষ্টিফেন ফন কেরিশের বিধবা স্ত্রী ফ্রাউ জোসেফা বার্লিন ছেড়ে দেশের বাড়িতে তার মেয়েকে নিয়ে ফিরে এসেছে। এসেছে এই চার পাঁচ মাস, আর তার বাড়ি ক্রিসতফদের বাড়ির থেকে বেশি দূরে নয়। পুরোনো বাড়ি, প্রকাণ্ড বাগান—রাইন নদীর ঢালের দিকে নেমে এসেছে। তার চিলে-ঘরের থেকে সব কিছু দেখতে পায় ক্রিসতফ, দেয়ালের উপর কেমন নুয়ে পড়েছে গাছগুলি—ভারি ভারি শাখায় কেমন পুঞ্জ পুঞ্জ পাতা। আর ঘনায়িত পাতার ফাঁক দিয়ে কেমন দেখা যাচ্ছে লাল টাইলের ছাদের উপরে ঘরের চূড়াটি, তার গায়ে শ্যাওলার আস্তরণ পর্যন্ত। বাগানের দেয়াল ঘেঁসে বাইরের দিকে একটা সরু গলি চলে গেছে, সেখানে গিয়ে যদি ঐ খুঁটিটার উপর দাঁড়াও, তবে দেয়ালের ওপারটা দেখতে পারো স্পষ্ট। এমন একটা সুবিধে কাজে না লাগিয়ে ছাড়বার পাত্র ক্রিসতফ নয়। সে উঁচু হয়ে উৎসুক চোখে দেখে সব চারদিক। দেখে ঘাসের রাস্তা, ঘাস ভরা ছোট-ছোট মাঠ, জড়াজড়ি করে রাজ্যের গাছ আর

লতা রয়েছে দাঁড়িয়ে আর সব কিছুর সামনে একটা বাড়ির চিত্রার্পিত চেহারা। তার সামনের জানলা-দরজার খড়খড়ি কি নির্মমভাবে আঁটা। বছরে একবার কি দুবার মালী দরজা-জানলা খুলে বাড়িটাকে হাওয়া খাওয়ায়। ব্যস, তারপরেই আবার যথাপূর্ব। আবার বাগান ভরে প্রকৃতির বন্য দৌরাত্ম্য, আবার নীরন্ধ্র নিঃশব্দতা।

সেই নীরবতাটি বড় ভালো লাগে ক্রিসতফের। প্রায়ই চোরের মত চুপি চুপি সে যায় তার খুঁটিটার কাছে, খুঁটিটা বেয়ে উঠে পড়ে দেয়ালটা ধরতে চায়, লম্বা হবার চেষ্টা করে। প্রথমে চোখ, ক্রমে নাক, শেষ পর্যন্ত মুখ এসে পৌঁছয় দেয়াল বরাবর—তারপর যদি পায়ের আঙুলের ডগায় দাঁড়াতে পারে, তবে হাত এনে রাখতে পারে দেয়ালে। যদিও এভাবে দাঁড়ানোটা মোটেই আরামের নয়, তবু দেয়ালে চিবুক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ক্রিসতফ—দেখে, শোনে, ছোঁয় সেই নিঃশব্দতাকে। ছোট-ছোট সোনার জলের তরঙ্গ তুলে সন্ধ্যা নেমে আসে আকাশ থেকে, পাইনের ছায়ায় সুরু হয় নীলাভ আলোর ঝিকিমিকি। তন্ময় হয়ে কতক্ষণ যে অমনি দাঁড়িয়ে থাকত ক্রিসতফ, যদি না গলিতে শোনা যেত কারু পায়ের শব্দ। বাগানের চারদিকে সৌরভ ছড়িয়ে নেমে আসে রাত্রি, বসন্তে লিলাক, গ্রীষ্মে য়্যাকাশিয়া, আর শরতে মরা পাতার ভিড়। রাজপ্রাসাদ থেকে সন্ধ্যের পর যখন ফেরে ক্রিসতফ, যতই কেননা সে শ্রান্ত হোক, একবার অমনি দাঁড়ায় দেয়াল ধরে, নিশ্বাস ভরে সেই সুগন্ধ-সুধা একবার পান করতে—এ গন্ধ ছেড়ে তার ঘরের গন্ধে যেতে কিছুতেই তার মন ওঠে না। কতদিন, যখন খেলা করত ক্রিসতফ, কেরিশদের বাড়ির ফটকের সামনের ঘাসভরা ছোট মাঠে কত খেলে গেছে। ফটকের দুদিকে দুটো বাদাম গাছ, প্রায় একশো বছর বয়েস হবে। কতদিন ঠাকুরদা এসে হয় এটার নয় ওটার নিচে বসে পাইপ টেনে গেছে

চুপচাপ। আর, ছেলেরা বাদাম কুড়িয়েছে আর বাদাম ছুঁড়ে মেরেছে খেলাচ্ছলে।

একদিন, যাচ্ছে সে গলি দিয়ে, যেমন তার অভ্যেস, খুঁটি বেয়ে উঠে সে মুখ বাড়াল। কি সব ভাবনায় বোঝাই ছিল মন, তাই এমনি তাকিয়েছিল অমনস্কের মত। নেমে যাচ্ছে খুঁটি থেকে অমনি কি রকম খেয়াল হল ঠিক যেন সব আগের মতন নেই, কোথায় যেন একটু নতুন-নতুন লাগছে। বাড়ির দিকে তাকাল সে ব্যগ্র হয়ে। জানলাগুলো খোলা। তাদের ভিতর দিয়ে সূর্য তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, হাত-ভরা অকৃপণ আনন্দ। ঘরের ভিতর কাউকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু পনেরো বছরের ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে মৃতপুরী। শুধু জেগে ওঠেনি জাগা-চোখে হাসছে অফুরন্ত। এ কি অঘটন! মনে মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল ক্রিসতফ।

রাতে খাবার সময় বাবা কথা পাড়ল, যা এখন পাড়ার প্রধান কথা। ফ্রাউ কেরিশ আর তার মেয়ে এসেছে, আর সঙ্গে এনেছে পর্বতপ্রমাণ মাল। বাদামতলার জমিটা রাজ্যের কুলিতে ভরে গিয়েছিল, রাশি-রাশি গরুর গাড়ি খালাস করেছে। খবর শুনে মনে মনে উত্তেজিত হল ক্রিসতফ—তার ছোট সীমাবদ্ধ জীবনে এ একটা চমকপ্রদ ঘটনা। নিজের কাজে গেল বটে, কিন্তু বাবার থেকে শোনা গল্পের খেই ধরে কল্পনা করতে লাগল ঐ মন্ত্রমোহন বাড়ির বাসিন্দারা না জানি কী বিচিত্রতরো জীব! যতক্ষণ ডুবে ছিল কাজের মধ্যে, ভুলে ছিল সব। কিন্তু সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এক পলকে সব মনে পড়ে গেল। অদম্য কৌতূহল হল খুঁটি বেয়ে উপরে উঠি, আর দেখি উঁকি মেরে কী সব অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটছে দেয়ালের ও-পিঠে। যেমন ভাবা তেমনি করা। কই, কিছুই নেই তো! সেই শান্ত ঘাসের পথ, সেই নিশ্চল গাছগুলি

সূর্যের শেষ কিরণে স্নান করছে। চারদিকে সেই পরিচিত প্রকৃতির বিশ্রাম।

কয়েক মুহূর্ত পরে ভুলে গেল ক্রিসতফ কেন আর কী সে আজ দেখতে এসেছিল! ধীরে ধীরে, আগে যেমন করত, তেমনি সেই স্তব্ধতার মধুরতার কোলে নিজেকে ঢেলে দিল। একটা ন্যাড়া খুঁটির মাথায় বিপজ্জনক ভাবে বসে স্বপ্ন দেখছে সে। সেটা একটা স্বপ্ন দেখবার জায়গা বটে! নোংরা ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে এই রৌদ্রে-হাসা অপরূপ সবুজ মাঠটি স্বপ্ন ছাড়া আর কি! যেন কোন বাজিকরের রচনা। কোন এক সাম্য ও শান্তির রাজ্যে তার মন চলল ডানা মেলে. তার বুকের মধ্যে সুর বেজে উঠল। তাকে যেন কে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে সে সময়, ভুলে যাচ্ছে সে সংসার—মনে হয় কেবল কান পেতে শুনি মনের গুঞ্জরণ।

হাঁ করে খোলা চোখে স্বপ্ন দেখছে ক্রিসতফ। কতক্ষণ ধরে সে স্বপ্ন দেখছে কিছুই তার খেয়াল নেই। কেন না কিছুই আর তার স্থূলদৃষ্টিতে ধরা নেই। হঠাৎ সে আঁৎকে উঠল। তার সামনে, তারই দিকে তাকিয়ে, দুইটি নারীর মুখ। একটি মহিলা আর একটি বছর পনেরোর মেয়ে। মহিলাটি দীর্ঘকায়, সম্ভ্রান্ত, পরনে কালো পোষাক, মাথায় সুন্দর চুল, ভঙ্গিটিতে একটি নির্ভয় ঔদাস্য—তার দিকে হাসিভরা দয়ার্দ্র চোখে চেয়ে আছে নীরবে। আর মেয়েটি, মেয়েটিরও পরনে গভীর শোকের কালো পোশাক. কিন্তু তার দিকে এমন দুরন্ত কৌতূহলে চেয়ে আছে যেন সে এখুনি হাসির বন্যাতায় ফেটে পড়বে। মায়ের কিছুটা পিছনে সে দাঁড়ানো, তার দিকে না তাকিয়েই মা তাকে শান্ত থাকতে সঙ্কেত করছেন। দু হাতে মুখ চেপে ধরেছে মেয়েটি, তা নইলে এখুনি সে বিদীর্ণ হয়ে পড়বে। রুদ্ধ করতে পারবে না সে হাসির উত্তালতা।

পাতলা ফুরফুরে দেখতে মেয়েটি, দুধে আলতায় মেশানো মুখখানি টকটক করছে। ছোট নিটোল নাক,ছোট নিটোল চিবুক, ছোট নিটোল মুখখানি! নিখুঁত দুটি ভুরু, জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটি। মাথা বেয়ে একরাশ চুল ফুলে-কেঁপে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘাড়ের উপর। দেখা যাচ্ছে বুঝি বা নিটোল ঘাড়ের আভাস, মসৃণ শুভ্র কপালটি।

ভূত দেখেছে যেন ক্রিসতফ। পাথর হয়ে গেল এক নিমেষে। যেন নেমে যাবার শক্তি নেই, খুঁটির সঙ্গে আঠা দিয়ে কে তাকে আটকে রেখেছে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। তার দিকে দেখি এগিয়ে আসছে ভদ্রমহিলা—চোখে সেই দয়ালু বিদ্রূপ—কি সর্বনাশ, তাকে ধরে ফেলবে নাকি? অমনি নিজেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিচে লাফ দিল ক্রিসতফ। গলির ওদিকে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। দেয়ালের একরাশ ভাঙা আস্তর ঝরে পড়ল তার সঙ্গে। অমনি শুনতে পেল কে যেন সস্নেহ কণ্ঠে বলে উঠল···'দুষ্টু ছেলে!' আর কে একজন যেন পাখির গানের মত সরল-তরল শব্দে হেসে উঠল। এক মুহূর্তে হকচকানির ভাব কাটিয়ে গা-হাত-পা ঝেড়ে উঠে পড়ল ক্রিসতফ। আর তখুনি ছুট দিলে। প্রাণপণে ছুট দিলে। প্রতিক্ষণে মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে, এখুনি ধরে ফেলবে বুঝি পিছন থেকে।

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল ক্রিসতফ। নিজের ঘরে চলে এসে সে-লজ্জার মুখোমুখি সে আর দাঁড়াতে পারছে না। ছি ছি, পরের বাড়িতে কেন সে উঁকি মারতে গিয়েছিল, কিসের প্রলোভনে! তারপরে আর তার সাহস হল না সে-গলি দিয়ে সে হাঁটে। ভয় হয়, কেউ যেন সেখানে ওৎ পেতে আছে তাকে ধরবার জন্যে। যদি কখনো যেতে হয় ও-বাড়ির কাছ দিয়ে, দেয়াল ঘেঁসে মাথা নুইয়ে গুটিসুটি সে চলে যায়—আর কতদূর এগিয়েই কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ছুট দেয়। তা হলেও,

আশ্চর্য, কিছুতেই ও দুটি মুখ সে ভুলতে পারে না, সর্বক্ষণ সে-দুটি মুখ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। খালি পায়ে নিঃশব্দে উঠে যায় সে ছাদের চিলে কোঠায়, স্কাই-লাইট দিয়ে সোজা তাকায় কেরিশদের বাড়ির দিকে, বাগানের দিকে, যদি কিছু আভাস মেলে। চোখ ক্ষয় করে ফেলেও কিছু দেখতে পায় না। দেখতে পায় শুধু—গাছের মাথা-গুলো আর উঁচু উঁচু চিমনি।

মাসখানেক পরে, একদিন থিয়েটারে নিজের তৈরি কনসার্ট বাজাচ্ছে ক্রিসতফ, এসেছে শেষ লহরের দিকে, হঠাৎ দেখতে পেল বক্সে বসে আছে ফ্রাউ আর ফ্রলিন কেরিশ। বসে আছে একেবারে তার মুখের দিকে চেয়ে। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি তাদেরকে এখানে দেখতে পাবে। হতভম্ব হয়ে গেল ক্রিসতফ, ভুল হয়ে গেল বুঝি সুরের শেষ চরণ। সমাপ্তি পর্যন্ত একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের বশেই সে বাজিয়ে চলল। বাজনা শেষ হবার পর দেখল, যদিও ওদের দিকে ঠিক সে তাকায়নি, ফ্রাউ আর ফ্রলিন কেরিশ একটু অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে হাততালি দিচ্ছে—যেন ভাবখানা এই, তুমি দেখ, কেমন হাততালি দিচ্ছি তোমাকে তারিফ করে। স্টেজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ক্রিসতফ।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, লবিতে দেখল ফ্রাউ কেরিশকে। কয়েক সার লোকের পরেই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে যেন ক্রিসতফের প্রতীক্ষায়। তার দিকে এর পর না তাকানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কিছুতেই তাকাবে না ক্রিসতফ। গায়ের ধাক্কা দিয়ে পথ করে দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে গেল পাশের দরজা দিয়ে।

বেরিয়েই নিজের উপর রাগ হতে লাগল তার। কেননা সে ঠিক জানত মনে মনে ফ্রাউ কেরিশ কোনোই অনিষ্ট করত না তার। কিন্তু যাই কেননা এখন বলুক, আবার অমনি অবস্থায় পড়লে ঠিক অমনি আচরণই

সে করবে। কিছুতেই ফ্রাউ কেরিশের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারবে না। পাছে রাস্তায় তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এই তার দুরন্ত ভয়। তার মতন চেহারার কাউকে যদি সে রাস্তায় দেখে অদূরে, অমনি সে সামনের গলিতে ঢুকে গা-ঢাকা দেয়।

ফ্রাউ কেরিশই একদিন নিজে চলে এল গায়ে পড়ে। খুঁজে পেতে বাড়ি বয়ে তাকে পাকড়াও করলে।

একদিন রাত্রে খেতে এসেছে ক্রিসতফ, লুইসা বললে কে একটা লোক, চাপরাশপরা খানসামা জাতীয় লোক, তার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছে। কালো-পাড়ের চওড়া একটা খাম, উপরে কেরিশদের শীলমোহর আঁকা। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা খুলে ফেলল ক্রিসতফ। কাঁপা গলায় পড়তে লাগল: "আজকে সাড়ে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়িতে চায়ের মজলিশ। যদি দয়া করে সুবাদক জাঁ-ক্রিসতফ ক্রাফ্‌ট আসেন তবে ফ্রাউ জসেফা ফন কেরিশ অনুগৃহীত হন।"

"আমি যাব না।" হুমকে উঠল ক্রিসতফ।

"সে কি?" লুইসা চমকে উঠল: "আমি বলে দিয়েছি যাবি।"

রেগে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসল ক্রিসতফ। মাকে বললে, যা নিজে কিছু বোঝ না তার মধ্যে নাক ঢোকাতে আস কেন? তোমার কী মাথা ব্যথা?

"চাকরটা দাঁড়িয়ে ছিল উত্তরের জন্যে। আমি বলে দিলাম আজ সন্ধ্যাটি তোমার ফাঁকা। তোমার আজ কোনো কাজ নেই।"

বৃথাই মেজাজ দেখাচ্ছে ক্রিসতফ। যতই সে মাতামাতি করুক সে যাবে না, ততই তার মন মেতে উঠতে চাইল। কিছুতেই নিমন্ত্রণের মোহ থেকে সে ছাড়াতে পারছে না নিজেকে। নির্দ্ধারিত সময় যখন

এল তখন বাইরে সে যতই গর্জন করুক না কেন অন্তরে-অন্তরে সে এই গর্জন করার জন্যে অখুশি।

ফ্রাউ ফন কেরিশের চিনতে দেরি হয়নি পিয়ানোবাদককে। ঐ সেই দুষ্টু ছেলে যে সেদিন তাদের বাগানের দেয়ালের উপর থেকে তাদের বাড়ির দিকে মুখ বাড়িয়েছিল। প্রতিবেশীদের থেকে খোঁজ নিয়ে সে জানলে যা জানবার। জাঁ-ক্রিসতফদের বাড়ির আদ্যোপান্ত ইতিহাস। আর জেনে-শুনে এই সাহসী বালকের ক্লেশময় জীবন সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য জাগ্রত হল। ইচ্ছে হল ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করি।

কী পোশাকই পরেছে ক্রিসতফ! একটা কিম্ভূতকিমাকার কোট চড়িয়েছে গায়ে, দেখাচ্ছে যেন গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত চাষা। লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে সে ঢুকল বাড়িতে। মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছে, একদিন অল্পক্ষণ একটু দেখে ফ্রাউ আর ফ্রলিন কেরিশ নিশ্চয়ই তার চেহারা মুখস্ত করে রাখেনি। তা ছাড়া এই পোশাকে তাকে চেনে কার সাধ্যি! পুরু কার্পেট বিছানো লম্বা একটা বারান্দা দিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল চাকর। জুতোর এতটুকু একটু আওয়াজ হল না। নিয়ে গেল একটা কাঁচের দরজাওয়ালা ঘরে, বাগানের দিকে মুখ-করা। অল্প-অল্প বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, একটু বা ঠাণ্ডা পড়েছে, চুল্লিতে সুখকর আগুনের উষ্ণতা। জানলার কাছে—জানলার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মেরে ক্রিসতফ দেখে নিল বৃষ্টির কুয়াশায় ভিজছে কেমন গাছগুলো—বসে আছে ভদ্রমহিলা আর তার মেয়ে। ফ্রাউ কেরিশ বুনছে আর তাকে কী পড়িয়ে শোনাচ্ছে তার মেয়ে। ক্রিসতফ ঘরে ঢুকতেই মায়ে-মেয়েতে চোখ চাওয়া-চাওয়ি হল—সে দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতুক।

"আমাকে চিনতে পেরেছে বোধ হয়।" ভাবল ক্রিসতফ। মরমে মরে গেল।

থপ থপ করে এগুতে লাগল সে ভয়ে ভয়ে।

ফ্রাউ ফন কেরিশ প্রফুল্লমুখে হেসে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিল।

"শুভদিন হে প্রিয় প্রতিবেশী! তোমাকে দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে। সেদিন কনসার্টে তোমার বাজনা শোনা অবধি কেবল ভাবছি কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কী সুন্দর তুমি বাজাও! আর আমার শোনার সেই আনন্দ কি করে জানাই তোমাকে! তাই তোমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে এনেছি। তার জন্যে কিন্তু মার্জনা চাই আমি।"

মামুলি অভ্যর্থনার সম্ভাষণ, কিন্তু করুণা ও আন্তরিকতায় ভরা। প্রচ্ছন্ন একটু বিদ্রূপ আছে কিনা কে জানে, কিন্তু মনের গোপনে যেন নিশ্চিন্ত হল ক্রিসতফ।

"আমাকে চিনতে পারেনি বোধহয়—।"

মেয়েকে এগিয়ে দিল ফ্রাউ কেরিশ। ফ্রলিন কেরিশ বই বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে। কৌতুকে ও কৌতূহলে জ্বল জ্বল করছে দুটি চোখ।

"আমার মেয়ে মীনা, বললে ফ্রাউ কেরিশ, "তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ভারি উন্মুখ।"

"কিন্তু মা, এর আগে আমাদের কি দেখা হয়নি?" বলেই মীনা হেসে উঠল উচ্চরোলে।

"সর্বনাশ! চিনতে পেরেছে আমাকে।" মন ভেঙে পড়ল ক্রিসতফের।

"সত্যি, দেখা হয়েছে বৈকি।" ফ্রাউ কেরিশও তাকালেন হাসিভরা চোখে। "যেদিন আমরা প্রথম এখানে আসি সেদিন তুমি এসেছিলে আমাদের বাড়ি।"

"বাড়ি?" চমকে উঠল ক্রিসতফ।

"ঠিক বাড়ি নয়, বাগানের দেয়ালের উপর বসেছিলে।"

খিল খিল করে হেসে উঠল মীনা। করুণ মূর্তিতে তাকিয়ে রইল ক্রিসতফ। যতই সেই চেহারার দিকে তাকায় ততই মীনা হাসির ফুলঝুরি ছড়ায়। কিছুতেই হাসির বেগ রোধ করতে পারছে না। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যাচ্ছে। ও কি, ফ্রাউ কেরিশ বাধা দিতে চাইলেন মেয়েকে, কিন্তু নিজেই পা পিছলে পড়ে গেলেন সেই হাসির স্রোতে। যদিও কোনঠাসা হয়ে গেছে ক্রিসতফ কিন্তু হাসি এমন ছোঁয়াচে যে এত কষ্টের মধ্যে সেও হেসে উঠল। এ একটা অপ্রতিরোধ আনন্দ—এতে ক্ষুব্ধ হবার আহত হবার নেই কিছু। আগাগোড়া এ একটা স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতা। কিন্তু হাসলেও চোখে চোখে তাকাবার মত ক্রিসতফের মুখ নেই। মীনা দম নিলে, শেষ পর্যন্ত জিগগেস করলে, কি করছিলে ঐ দেয়ালের উপর বসে? আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্রিসতফ। সেই আড়ষ্টতাটুকুই উপভোগ করতে চায় মীনা। বলো না কি করছিলে? কি একটা বলতে চেষ্টা করল ক্রিসতফ, স্বর ফুটল না। রক্ষা করলেন ফ্রাউ কেরিশ, পেয়ালায় চা ঢালতে শুরু করলেন, ঘুরিয়ে দিলেন কথার মোড়।

তার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন ফ্রাউ কেরিশ, সুরটি সহৃদয়। কিন্তু কিছুতেই যেন আশ্বস্ত হতে পারছে না ক্রিসতফ। ভাল করে বসতে পারছে না, পেয়ালাটা ধরতে পারছে না জুৎ করে, ফসকে পড়ে যাবে বুঝি এক্ষুনি। আর ওরা যতই এগিয়ে দিচ্ছে জল বা দুধ বা চিনি বা কেক, ক্রিসতফ ভাবছে তাড়াতাড়ি একটা ধন্যবাদ বলে সোজা বাড়ি পালাই। আর পালাবার চেহারাটাও বা কী খুবছুরৎই হবে! কলারে-টাইয়ে বাঁধা, ফ্রক-কোটে আঁটা—যেন খোলার মধ্যে বন্ধ আস্ত একটি কচ্ছপ—ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার উপায় নেই, ঘাড় ফেরাবার উপায় নেই!

মীনা তো অনবরত তাকে বিদ্ধ করছে চোখের খোঁচায়, আর খোঁচাগুলি পড়ছে তার চেহারার উপর, তার নড়াচড়ার উপর, তার পোশাক-আশাকের উপর। ফ্রাউ কেরিশের ব্যবহারের উষ্ণতা তাকে চাঙ্গা করতে পারছে না, শীতে সে জমাট হয়ে যাচ্ছে মীনার চাহনির তুষারে! যতই ওরা তাকে সহজ করবার চেষ্টা করে ততই সে জটিল হয়ে ওঠে, যতই তরল করতে চায় ততই আসে তার আড়ষ্টতা। মীনার ফাজলামো-ভরা চাউনিও তাকে দেয় না কোনো আশ্বাসের ইঙ্গিত।

প্রশ্ন করে-করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ফ্রাউ কেরিশ। পাচ্ছেন শুধু একাক্ষর উত্তর—হ্যাঁ, কিংবা না। এভাবে কি কথা চলে মন খুলে? তখন তিনি বললেন, তার চেয়ে একটু পিয়ানো বাজাও।

থিয়েটারে হল ভর্তি লোকের সামনে বাজাতে তার ভয় নেই। কিন্তু অপরিচিত দুটি নারীর অদ্ভুত সঙ্গ তাকে লজ্জায় যেন অভিভূত করে ফেলছে। কুণ্ঠিত হয়ে বসল সে পিয়ানোর সামনে, ঘেমে উঠল সর্বাঙ্গে। শেষে আস্তে আস্তে একটা মোজার্টের গৎ ধরলে। তার মনের মধ্যে একই সঙ্গে যে লজ্জা আর আনন্দ, আশা আর বিষণ্ণতা বেজে উঠছে তাই যেন এই সুরের কোমলতা ও স্নেহের সঙ্গে মিশ খেয়ে বাতাসে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। যেন একটি যৌবন-স্পন্দিত বসন্তের অবতারণা হয়েছে চারপাশে—ছড়িয়ে পড়ছে সে-বসন্তের ইন্দ্রজাল। বাজনা থামলে পর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ফ্রাউ কেরিশ, প্রশংসায় তাকে প্লাবিত করে দিলেন। একটু বাড়াবাড়ির প্রাথর্য নিশ্চয়ই আছে। তবুই মনোহর মুখের স্তুতি কী মধুর! মীনা কিছুই বলছে না, শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ভাবছে জিহ্বায় যে এত আড়ষ্ট সে আঙুলে কি করে এত মুখর হতে পারে! কথায় যে অসাড়, সুরে সে প্রগলভ, প্রচুর। এ কি করে সম্ভব হয় সংসারে!

সাহস বেড়ে গেল ক্রিসতফের। বাজনার পর বাজনা চালাতে লাগল। জীবন্ত হয়ে উঠল রক্তস্রোত। হঠাৎ এক সময় মীনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ না তুলে অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, "সেদিন এই করছিলাম দেয়ালের উপর বসে।"

তার মনে হচ্ছিল, কেন মনে হচ্ছিল কে জানে, নিভৃত বাগানের দিকে তাকিয়ে তার প্রাণে যে গান বেজে উঠত নিঃশব্দে তাই যেন আজকের সুরধ্বনিতে প্রতিমূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই শান্ত ছন্দটির গন্ধ এসে তার নাকে লাগছে। সেই সব পাখির কাকলী, পশুদের অস্ফুট শব্দ, ডাল-পালা-মেলা বড় বড় গাছের সেই সুগম্ভীর ঘুম, সেই সূর্যাস্তের বিষণ্ণতা।

শ্রোতা দুটির মুখে চোখে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল, শুনতে লাগল তন্ময় হয়ে। বাজনার শেষে তার দুই হাত আবেগে জড়িয়ে ধরলেন ফ্রাউ কেরিশ, উত্তাল কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। মীনা শুধু হাত-তালি দিয়ে উঠল, বললে, "চমৎকার! দেয়ালে বসে-বসে যদি এমনি সব বাজনা সৃষ্টি করতে পারো তবে দেয়াল পর্যন্ত একটা মই খাটিয়ে দেব 'খন।"

"ওর ফাজলামোতে কান দিও না।" বললেন ফ্রাউ কেরিশ। বললেন, যখন খুশি সে যেন বেড়াতে আসে তাদের বাগানে। আর তাদেরকে যদি তার বিশেষ ভালো না লাগে, বাড়ির মধ্যে আসার কোনো দরকার নেই।

"খবরদার! আমাদের সঙ্গে দেখা করবার তোমার দরকার নেই।" মীনা চোখ বড় করল। "তবু যদি তুমি না আস, দেখাব মজা।" ভয় দেখাল আঙুল নেড়ে।

এমন নয় যে রোজ ক্রিসতফ এসে তার সঙ্গে দেখা করুক, এমনও নয় যে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শিষ্টাচারসঙ্গত আইনকানুন মানবার

তার প্রয়োজন আছে, তবু কেন কে জানে এমনি একটা ফোড়ন দেবার ইচ্ছে করল মীনার। মনে হল এমনি একটা কিছু বললেই যেন সুন্দর করে বলা হল!

মুখে লজ্জা পেল ক্রিসতফ। মার কথা ঠাকুরদার কথা তুলে ফ্রাউ কেরিশ তাকে আরো কাছে টেনে আনলেন। ঠাকুরদার সঙ্গে ফ্রাউ কেরিশের নাকি আলাপ ছিল। ছোঁয়াটি ঠিক হৃদয়ে এসে লাগল ক্রিসতফের। অন্তরের সম্পদ সব সময়েই বাইরের সম্পত্তির নিচে চাপা পড়ে মারা পড়ে না। নইলে এত নাগরিক হয়েও কেমন এরা সরল, এত বড়লোক হয়েও কেমন এরা বড় মানুষ! মন খুলে গেল ক্রিসতফের। স্থূল সারল্যের সঙ্গে সে বলতে লাগল তার ভবিষ্যতের আশার কথা, তার বর্তমানের দুর্দশার কথা। খেয়ালই হয় নি কতক্ষণ কেটে গেছে, হঠাৎ ডিনারের কথা বলতেই বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল ক্রিসতফ। কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে পালাবার কোনো কারণ নেই, ফ্রাউ কেরিশ বললেন, এখানেই খেয়ে যাও আজ। তাদের মধ্যে যখন ভাব হয়ে গেল তখন আর ভাবনা কি। ক্রিসতফের আড়ষ্টতা আনন্দে গলে গেল নিমেষে।

মা আর মেয়ের মাঝখানে জায়গা হল ক্রিসতফের। কিন্তু পিয়ানোতে তার যেমন প্রতিভা, হায়, তেমন প্রতিভা তার নেই টেবিলের ছুরি-কাঁটায়। সেদিকের শিক্ষাটা তার উপেক্ষিত হয়েছে বরাবর। ক্রিসতফ ভেবে পায় না, খাবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে খাওয়া, কি-ভাবে-খাওয়া নিয়ে লোকে কেন মাথা ঘামায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তু, পদ্ধতি নয়। কিন্তু সে কথা মীনা মানতে চায় না। ঠোঁট ওলটাচ্ছে সে বারে-বারে, আতঙ্কিত হবার ভাব করছে।

সাপারের পর ক্রিসতফ চলে যাবে এই আশা করেছিল মা-মেয়ে। কিন্তু দিব্যি ওদের পিছু পিছু সে ছোট ঘরটিতে এসে ঢুকেছে, দিব্যি

বসেছে চেয়ারে, গল্প সুরু করেছে দিব্যি। বাড়ি যাবার নামটি নেই। ছোট ছোট হাই চাপছে মীনা, মাকে ইসারা করছে। সে সব নজরে পড়ছে না ক্রিসতফের, সুখে সে এমন অসাড়। তার কেবল মনে হচ্ছে এরা তার আপনারই লোক, এক বাড়ির লোক। তাই একবার যখন বসেছে চেয়ারে চেপে, ভেবে পাচ্ছে না কি করে ওঠা যায় জায়গা ছেড়ে। চাই কি এমনি চুপচাপ বসে থাকতে পারে সে সারা রাত।

"এবার বাড়ি যাও।" ফ্রাউ কেরিশকে শেষ পর্যন্ত বলতে হল মুখ ফুটে।

চলে গেল ক্রিসতফ, কিন্তু হৃদয়ে তার কোমলাভ দুটি আলো জলতে লাগল। একটি ফ্রাউ ফন কেরিশের বাদামী চোখের আলো ; আরেকটি, মীনার দুটি নীল নয়নের। তার হাতে নরম আঙুলের স্নেহল সংস্পর্শ— যেন ফুলের মত, মৃদু একটি সৌরভের আন্দোলনের মত। এমন গন্ধ আর লাগেনি তার নিশ্বাসে। এই গন্ধের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে বোধ হয় ?

দুদিন পরে আবার গেল একবার ক্রিসতফ। কথা ছিল মীনাকে সে বাজাতে শেখাবে এক-আধটু, হয়তো তারই ওজুহাতে। ব্যবস্থাটা পাকাপাকি হয়ে উঠল। সপ্তাহে দুদিন সকাল বেলা তাকে বাজনা শেখাতে হবে, আর প্রায়ই বিকেলের দিকে যেতে হবে নিজে বাজাবার জন্যে, হয়তো বা এ-ও-তা কথা বলার জন্যে।

বুদ্ধি আর সহানুভূতি দুই-ই আছে ফ্রাউ কেরিশের। স্বামী যখন গত হলেন তখন তাঁর বয়েস পঁয়ত্রিশ। দেহে আর মনে যদিও তিনি যৌবনবতী, বিয়ের পর যদিও তিনি সম্ভোগের পথে অনেক দূর এগিয়েছিলেন, এখন নিজেকে ফের স্বস্থানে সরিয়ে নিয়ে আসতে তাঁর

বেগ পেতে হয় নি। সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে, বুঝেছেন জীবনে খাব-আর-পাব দুইই হতে পারে না এক সঙ্গে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অক্ষুণ্ণ আছে। খুব একটা প্রেমের আকর্ষণ যে অনুভব করেন তাঁর জন্যে তা নয়—কিন্তু একসঙ্গে অনেকদিন সহৃদয় প্রতিবেশিতায় কাটিয়ে ছিলেন দুজনে—এই স্মৃতিটুকুই যথেষ্ট।

মেয়েকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করে তোলাই তাঁর এখন একমাত্র ব্রত। কিন্তু একমাত্র মেয়ে বলে আদর-প্রশ্রয়ের আতিশয্য দেখাতে তিনি প্রস্তুত নন। যে পরিমিতি-বোধ নিজের প্রেমকে সংযত রেখেছে, তাই আবার শাসন করছে তাঁর মাতৃস্নেহের অন্ধতাকে। মীনাকে তিনি ভালোবাসেন খুব, কিন্তু তাই বলে স্নেহবশে তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দেন না। নিজের মনকে যেমন তিনি চোখ ঠারতে নারাজ, তেমনি মেয়ের দোষ-ত্রুটির উপরে তাঁর সজাগদৃষ্টি। রসিক আর চতুর বলে পরের গলতি-গলদ তাঁর নজরে পড়ে সহজেই. বিদ্বেষের লেশমাত্র না রেখে দিব্যি প্রসন্ন মনে তিনি সমালোচনা করতে পারেন, এবং সেই সমালোচনা লোকে গায়ে না মাখলেও সেই সমালোচনা থেকে গা বাঁচাবার জন্যে সকলেই শশব্যস্ত। চিত্তের সংশোধনের সঙ্গে মিশে আছে তাঁর চিত্তের প্রসাধন।

জাঁ-ক্রিসতফ যেমন স্নেহকে নাড়া দেয় তেমনি নাড়া দেয় বুঝি সমালোচনাকে। ফ্রাউ কেরিশ বাজনা ভালোবাসেন কিন্তু নিজে বাজাতে পারেন না। বাজনাটা দেহে-মনে এমন একটা মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়, মন দিব্যি মধুর বিষণ্ণতায় ডুবে যেতে পারে। ক্রিসতফ বাজাচ্ছে, আর আগুনের ধারে একখানা বই নিয়ে বসে তিনি শুনছেন, ক্রিসতফের আঙুলগুলির দ্রুত চলাফেরা দেখছেন—মুখে মৃদু হাসি কিন্তু মন ভ্রান্তপথে কোথায় কোন উদাস-বিধুর অপরিচিত দেশে চলে গিয়েছে। কোন বা সেই ধূসর অতীতের ছায়ালোকে।

বাজনার চেয়ে বাজনদারের প্রতিই তাঁর বেশি আকর্ষণ। ক্রিসতফের মৌলিকতাটুকু আবিষ্কার করবার মত দৃষ্টির সূক্ষ্মতা তাঁর না থাকলেও তার বিশিষ্ট ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তার ভিতরে সহসা কী দীপ্তশিখা প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে তা তিনি দেখতে পান, সেটা তাঁর কাছে একটা কৌতুকের মতই মনে হয়—একটা শুকনো কাঠ সহসা কেমন একটা রং-মশাল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া তার সৎগুণগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তার সারল্য তার সাহস তার দার্ঢ্য, তার কষ্ট-সহিষ্ণুতা—এইটুকু একটা ছেলের মধ্যে কেমন করুণ লাগে। কিন্তু তাই বলে তার দোষত্রুটি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। তার গ্রাম্যতা তার স্থূলতা—তার সব হাস্যকর অঙ্গ-ভঙ্গি—সমস্ত তিনি টুকে নেন তাঁর হিসেবের খাতায়। এক-এক সময় তাঁর মনে হয়, সব ঠিক আছে ছেলেটার, শুধু মাথার দু-একটা ইস্ক্রুপ আলগা হয়ে পড়েছে। কেমন যেন সঙ্গতি-সামঞ্জস্যহীন। কেমন যেন আধ-পাগলা। থেকে-থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, গলার জোরে না বলে কখনো বা গায়ের জোরে কথা কয়, এমন সব রসিকতা করার চেষ্টা করে যা শুধু অদ্ভুত নয়, কিম্ভূতকিমাকার! লঘুভাবে বিদ্রূপ করেন ফ্রাউ কেরিশ, ও-সব অনুধাবন করার ধৈর্য তার নেই, ফ্রাউ কেরিশের স্নেহ আর দয়ায় সে ভরপুর। কেউ তাকে দয়া করেছে এই অনুভূতিটাই তো তার কাছে অভিনব! যদি রাজপ্রাসাদের আওতায় বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার সংস্পর্শ ঘটেছে, রীতি-নীতি ধরন-ধারনে সে পুরোদস্তর শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি। সে যেন এখনো কেমন বন্য ও গ্রাম্য আছে। কি করে তাকে কাজে লাগাবে এরই জন্যে রাজপ্রাসাদ ব্যস্ত, কি করে তাকে মানুষ করবে সে জন্যে নয়। প্রাসাদে সে যায়, পিয়ানো নিয়ে বসে, বাজায়, বাজনা শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসে। মামুলি কটা প্রশংসার বুলির বাইরে কেউ তার সঙ্গে দুটো কথাও কয় না। ঠাকুরদা মারা যাবার পর

বাড়িতে বা বাইরে এমন একজনও নেই যে তাকে একটু কায়দা-তুরস্ত করে দিতে পারে, শেখাতে পারে সভ্য-ভব্য হবার আচরণ। তার স্বভাবের এই স্থূলতা তাকে পীড়িত করে, লাঞ্ছিত করে তাকে তার অজ্ঞান, অশিক্ষা। নিজে নিজে কিছুতেই সে গড়ে তুলতে পারছে না নিজেকে, অহরহ এই যন্ত্রণায় সে হাহাকার করে। বই, কথাবার্তা, শালীনতা—সব কিছুতেই সে দীন। এই দারিদ্র্যের কথা বলতে পারে এমন একজন বন্ধুও তার নেই। অটোকেও বোঝাতে পারেনি তার এই তুঃখ। যে-মুহূর্তে কিছু বলতে গিয়েছে অটোকে, অটো এমন একটা মসৃণ আভিজাত্যের দৃষ্টি হেনেছে যে সেটা জলন্ত শলাকার মত বিদ্ধ হয়েছে মর্মমূলে।

কিন্তু ফ্রাউ কেরিশের হাতে সমস্ত কিছু সহজ হয়ে এল। নিজের থেকেই তিনি সস্নেহে সংশোধন করতে সুরু করলেন ক্রিসতফকে। এমন ভাবে অগ্রসর হলেন যাতে ক্রিসতফের অভিমান না ক্ষুণ্ন হয়, যাতে কোনোমতেই তাকে ছোট বা অধম না দেখায়। কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় তাই শেখাতে লাগলেন সবিনয়ে। শেখাতে লাগলেন কি ভাবে সে পোশাক পরবে, কি ভাবে খাবে চলবে কথা কইবে। যেখানেই তার ভঙ্গির বা রুচির বা ভাষার ত্রুটি হচ্ছে তাই দেখাতে লাগলেন চোখে আঙুল দিয়ে—কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু আহত হবার সুযোগ দিলেন না ক্রিসতফকে। এমন লঘু ও মৃতু, এমন স্নেহদ্রব তাঁর হাতের স্পর্শটুকু। ছেলেটার ঠুনকো অভিমান কোথাও একটুও চিড় খেলনা। ক্রমে ক্রমে তার লেখাপড়ারও ভার নিলেন ফ্রাউ কেরিশ, ঠিক প্রত্যক্ষভাবে নয়, তার লেখাপড়া শেখায় তাঁর কি মাথাব্যথা! তার যে অবিশ্বাস্য অজ্ঞান তাতে তিনি আশ্চর্য নন মোটেই, জীবনে যে সুবিধে পায়নি তার নিজের কী দোষ! তার পক্ষে ভুল-ভ্রান্তি করাটাই তো স্বাভাবিক। এই ভাবে ক্ষেত্র তিনি প্রথমে স্নেহসিক্ত করে রাখলেন, পরে ছড়িয়ে দিলেন বীজ। যখনই

যেখানে তার ভুলচুক দেখতে পেলেন শুধরে দিতে লাগলেন সাবধানে। কঠিন শব্দের জাঁক দেখিয়ে তাকে আতঙ্কিত করে লাভ নেই—তার চেয়ে নিজে পড়ো এই ইতিহাসের অংশটকু, কিংবা কোনো জার্মান বা বিদেশী কবির কবিতা। জাঁ-ক্রিসতফ না পড়তে চায়, মীনা পড়ুক, তুমি শোনো, জাঁ-ক্রিসতফ!

জাঁ-ক্রিসতফ যেন এ বাড়িরই এক ছেলে। ফ্রাউ কেরিশের কণ্ঠস্বরে হয়তো বা সেই অন্তরঙ্গতার আভাস—একটু বা প্রচ্ছন্ন অভিভাবকত্বের সুর, যেটকু ধরতে পারে না ক্রিসতফ। বিশেষ করে তার পোশাকের দিকেই বেশি মনোযোগ ফ্রাউ কেরিশের, নতুন পোশাক তাকে তিনি উপহার পর্যন্ত দিয়েছেন, পশমের কম্ফর্টার বুনে দিয়েছেন নিজের হাতে—দিয়েছেন ছোট-খাটো প্রসাধনের দ্রব্য—এমন ভাবে দিয়েছেন যাতে ক্রিসতফের এতটুকু না দ্বিধা হয় গ্রহণ করতে। হঠাৎ একটা অনাথ ছেলের লালন-পোষণের ভার হাতে এসে পড়লে স্নেহপ্রাণ মেয়েরা যেমন তার যত্ন নেয় তেমনি স্বতোৎসারিত হয়েই ক্রিসতফকে দেখাশোনা করেছেন ফ্রাউ কেরিশ। ক্রিসতফ ভাবছে এসব স্নেহ-যত্ন তার ব্যক্তিগত প্রাপ্য, একটা ভাবকে নয় একটা ব্যক্তিকেই তিনি ভালোবাসছেন। তাই তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এই কৃতজ্ঞতার প্ররোচনায় মাঝে মাঝে সে লম্বা বক্তৃতা ফেঁদে বসে। সে সব আবার কেমন বেসুরো শোনায় ফ্রাউর কানে। ভাবেন শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হতে এখনো ঢের বাকি। তবু কেন কে জানে তার ও সব অশিক্ষিত বক্তৃতায় কোথায় যেন আবার একটু মধুরতা আছে।

কিন্তু মীনার সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে অন্য ধরনের। যখন প্রথম দিন মীনাকে ক্রিসতফ বাজনা শেখাতে আসে, তখনো পূর্ব সন্ধ্যার স্মৃতির মদিরা তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। মীনার দুটি নরম চোখের চাহনি মনে রচনা করে রেখেছে অপূর্ব সুরমাধুরী। কিন্তু কয়েকঘণ্টা যেতে না যেতেই

এ কী তার বিচিত্র মূর্তি। তার দিকে মীনা ফিরেও তাকায় না, শুনতেও চায় না কী সে বলতে বা বোঝাতে চাইছে। যদি কখনো বা চোখের সঙ্গে চোখ এসে মিলছে, দেখছে মীনার চোখ বরফের মত ঠাণ্ডা—তার ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা পর্যন্ত উঠছে কনকন করে। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে যন্ত্রণা দিতে লাগল ক্রিসতফ, কোথায়, কোথায় সে অপরাধ করেছে নতুন, কি ভাবে হঠাৎ আঘাত দিয়েছে মীনাকে! খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ ধরতে পারছে না—সে কী ভয়াবহ যন্ত্রণা! অনেক চেষ্টা করেও কিছু আবিষ্কার করতে পারল না ক্রিসতফ। না, কোনো আঘাতই দেয়নি সে মীনাকে, অপমান করবার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে মীনা আগের দিন যেমন ছিল আজো তেমনি আছে, আজকের চেয়ে আগের দিনটিতে তার মনোভাব এমন কিছু অনুকূল ছিল না। সেদিনও যেমনি উদাসীন ছিল আজো তেমনিই নির্বিকার আছে। প্রথম দিন সে যদি একটু হেসে থাকে সেটা তার স্বাভাবিক চাপল্যের জন্য। যে কেউই প্রথম পরিচিত হতে আসত, তার দিকেই অমনি করে তাকিয়ে হাসতো সে স্বচ্ছন্দে। লোক কেন, পথহারা একটা কুকুর এলেও তাই।

প্রথম দিনের পরিচয়েই সমস্ত কৌতূহল হারিয়ে বসেছে মীনা। তীক্ষ্ণ চোখে সে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে ক্রিসতফকে। দেখেছে সে নেহাৎই একটা বাজে ছেলে, কুৎসিত, দরিদ্র, অশিক্ষিত। পিয়ানো একটু বাজাতে পারে বটে কিন্তু হাত দুটো কী কদর্য! খাবার টেবিলে কী জঘন্যভাবে সে কাঁটা ধরে, আর কী ভীষণ কথা, ছুরিতে করে সে মাছ খায়! তা ছাড়া ছেলেটার মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই, কি রকম যেন ভোঁতা, নিষ্প্রভ! ওর কাছ থেকে যদি সে বাজনা শিখতে চেয়ে থাকে, শুধু ওকে নিয়ে একটু মজা করবার জন্যেই। কেননা এখানে এখন তার আর কোনো সঙ্গী-সাথী নেই, আর, যদিও সে এখন বড় হয়েছে বলে

ভারিক্কিপনা দেখাচ্ছে, তবুও মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মতই মনটা খেলাধূলায় মেতে উঠতে চায়। কিন্তু এ কি একটা খেলাধূলা করার মত ছেলে! যেন একটা গৃহপালিত পশু, যাকে বলে ভ্যাড়াকান্ত! যদি কখনো সে তার দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়েও থাকে, তবে তা সে ভুলে নাচিয়েছে—হয়তো আর কিছু ভাবছিল, হঠাৎ নাচিয়ে ফেলেছে চোখ, কিংবা যাতে অভ্যেসটা ঠিক বজায় থাকে তারি জন্যে। সেই জন্যে তার মাথাব্যথা কিসের?

কিন্তু সেই যে চোখ নাচিয়েছিল সেই সঙ্গে ক্রিসতফের হৃদয়ও নাচিয়েছিল মীনা। সে কি জানে সেই খবরটুকু? দরকার নেই মীনার সেই বাজে খবরে। সে নিজের স্বপ্ন নিয়েই মশগুল। তার এখন সেই বয়স যে-বয়সে বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি-স্বপ্নে কল্পনা-কানন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। দিনরাত সে প্রেমের চিন্তায় বিভোর, যে প্রেমের রেখা নেই ছায়া আছে, সীমা নেই আছে শুধু কোমল ধূসরতা। অজ্ঞানের জন্যে নির্দোষ যে প্রেম। আর যে প্রেমের পরিণতি বিবাহ। বিয়ে ছাড়া আবার প্রেম কি, আর বিয়ের কথা ভাবতে হলেই বরের কথা মনে আসে। কার সঙ্গে তার বিয়ে হবে না জানি! হয়তো বা লেফটেনেণ্টের সঙ্গে কিংবা কোনো কবির সঙ্গে, শীলারের মতন যে মহান! এক কল্পনা এসে আরেক কল্পনাকে গ্রাস করে আর শেষের কল্পনাটাকে মনে হয় প্রথম কল্পনার মতই চিত্তাকর্ষক।

কিন্তু বাস্তব যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কল্পনাপ্রবণ মেয়েরা সেই বাস্তবকেই মেনে নেয়; যদিও তা সেই স্বপ্নের তুলনায় দীন—তবু সেই-ই তো নিশ্চিত।

এই জটিল যন্ত্র—প্রচ্ছন্নে যতটা হয়তো নয় প্রত্যক্ষে তার চেয়ে বেশি জটিল—নারী-হৃদয় সম্বন্ধে জাঁ-ক্রিসতফের বিন্দুবিসর্গ জ্ঞান নেই।

বন্ধুদের ব্যবহারে অনেক সময় সে বিচলিত হয়েছে বটে, কিন্তু ওদের স্নেহ সে কখনো অবিশ্বাস করেনি। যদিও দুঃখ পেয়েছে তাদের ব্যবহারে, ভাবতে অভাব ছিল না যে আমি যেমন ওদের ভালোবাসি তেমনি গভীর ওদেরও ভালবাসা। মুখের একটি কথা, স্নেহপূর্ণ একটি দৃষ্টিই তাকে ভরে তুলেছে আনন্দে। কখনো কখনো বা চোখে জল নিয়ে এসেছে।

ছোট স্তব্ধ ঘরে টেবিলের ধারে বসে আছে জঁা-ক্রিসতফ—কয়েক গজ দূরে বসে ল্যাম্পের আলোতে সেলাই করছে ফ্রাউ কেরিশ—টেবিলের অন্যদিকে বসে বই পড়ছে মীনা। কেউ কথা কইছে না। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাগানের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে জঁা-ক্রিসতফ। কাঁকরের গুঁড়োগুলো চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। নম্র একটি মর্মর উঠেছে গাছের শাখায়-পাতায়। যেন কোন গভীর প্রসুপ্তির সুর! সহসা ক্রিসতফের বুক আনন্দে ভরে উঠল। কোনো কারণ নেই, সহসা সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে এসে বসে পড়ল ফ্রাউ কেরিশের পায়ের তলায়। চেপে ধরল তাঁর দু'হাত—হাতে ছুঁচ আছে কি নেই লক্ষ্য না করেই সে দু'হাত চুম্বন করতে লাগল, সেই দুখানি হাত নিয়ে চেপে ধরতে লাগল তার ঠোঁটে তার গালে তার চোখে, আর কাঁদতে লাগল অঝোরে। এত স্নেহ এত সুখ যেন সে আর কোথাও কোনোদিন পায়নি। কপালে চোখ তুলল মীনা, অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকাল, হয়তো বা মুখ ভেঙচাল পরোক্ষে। বড় হয়েছে ছেলে, তবু পায়ের কাছে বসে দীনতা করছে, করুণায় একটু হাসলেন ফ্রাউ কেরিশ, হাত মুক্ত করে তার মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলেন; বললেন, তাঁর সেই সুন্দর সস্নেহ গলায়:

"এ কী, বুড়ো ছেলে, এ তোমার কী হল?"

কিন্তু মীনার মন উধাও হয়েছে কাব্যরাজ্যে। আহা সেই স্বর, সেই

স্তব্ধতার স্বর, সেই নিরুচ্চার শান্তি, সেই ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ—যেখানে চীৎকার নেই, প্রবলতা নেই, রূঢ়তা নেই—জীবনের রুক্ষ মরুভূমিতে সেই একটু সবুজ নিকুঞ্জ—সেই কবিতানিকেতন। সেই দেশের প্রজ্বলন্ত আলোয় পৃথিবীর বস্তু আর শক্তি স্বর্ণদীপ্ত হচ্ছে—সেই সাম্রাজ্য যা শুধু মহান কবিদের লেখা পড়েই আবিষ্কার করা চলে। গ্যয়টে, শীলার আর শেকসপিয়র—যাঁরা সব সাহস আর বেদনা আর প্রেমের প্রস্রবণ!

বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কিশোরকণ্ঠে আবৃত্তি করে মীনা, উচ্চারণের উত্তেজনায় তার মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে ওঠে, যোদ্ধা আর রাজার ভূমিকায় সে যেন নেমেছে রঙ্গমঞ্চে। কথনো কখনো বই নিজের হাতে টেনে নেন ফ্রাউ কেরিশ, তাঁর কোমল করুণ স্বর ইতিহাসের সেই সব মহান পরাভবের উপরে একটি আধ্যাত্মিক লাবণ্য বিস্তার করে। বেশির ভাগ শুনতেই তিনি ভালোবাসেন—কোলের উপর অফুরন্ত সেলাই নিয়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটিই মনোরম। নিজের ভাবনাগুলির দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসেন। যখনই যে কোনো বইই তিনি পড়ুন না, সেই ভাবনাগুলি কোত্থেকে হঠাৎ ভেসে-ভেসে আসে।

পড়তে চেষ্টা জাঁ-ক্রিসতফও করেছিল বারকতক, ছেড়ে দিতে হয়েছে। তার সাধ্য নেই যে পড়ে। তোতলামি করতে থাকে, কথার উপরে হোঁচট খেয়ে পড়ে, কখনো বা যতির ছোট-ছোট স্তব্ধতাগুলোকে বাক্যস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, প্রকৃত বা নিহিতার্থ কিছুই বোঝে না, অথচ দুঃখের জায়গাগুলো পড়তে-পড়তে কখনো একেবারে নির্লজ্জের মত কেঁদে ফেলে। চকিতে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় টেবিলে, আর তাই দেখে দুই বন্ধু হাসিতে ফেটে পড়ে।

সত্যি, কত সে ভালোবাসে ওদের। সবখানে ওদের মনোময়ী মূর্তি দুটি বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেন ওরা শেকস্‌পিয়র আর গ্যয়টের

শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে—কারু থেকে কাউকে সে আলাদা করে নিতে পারছে না। কবিদের সেই সুগন্ধে-ভরা কথাগুলি হৃদয়ের গভীরতা থেকে একটা অন্ধ আতীব্র আবেগ উথলে তোলে। সেই সুবাসিত কথাগুলিও যা, আর যে-ঠোঁট দুখানি থেকে ঐ কথাগুলি বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে সে ঠোঁট দুখানিও তাই। ঐ ঠোঁট দুটি ছিল বলেই তো সে জীবনে শুনতে পেল এই প্রথম কবিকলস্বর। কুড়ি বছর পরেও যখন সে কখনো এগমণ্ট বা রোমিও পড়েছে বা অভিনীত হতে দেখেছে, কোনো কোনো জায়গায় মনে পড়েছে সেই কবেকার শান্ত কটি সন্ধ্যা, সেই অস্পর্শ কটি সুখের স্বপ্ন আর ফ্রাউ ফন কেরিশ ও মীনার দুখানি প্রীতিসুন্দর মুখ।

দুজনে যখন ওরা পড়ে তখন ওদের দিকে চেয়ে-চেয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় ক্রিসতফ। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বোজা চোখে জেগে-জেগে যখন স্বপ্ন দেখে তখন মনে পড়ে সেই মুখ; দিনের বেলা যখন অর্কেস্ট্রায় নিজের জায়গাটিতে বসে যন্ত্রচালিতের মত বাজনা বাজাতে বাজাতে আধবোজা চোখে স্বপ্ন দেখে, তখনও। ওদের জন্যে মনে একটা উৎসারিত উজ্জ্বল কোমলতা—এই কোমলতার কী অর্থ তা সে জানে না। ভাবে এই বোধ হয় প্রেম। একেই বোধ হয় প্রেম বলে। কিন্তু কার সঙ্গে যে প্রেম, মার সঙ্গে না মেয়ের সঙ্গে, ঠাহর করতে পারে না। খুব গম্ভীর হয়ে সে চিন্তা করে দেখেছে, কিন্তু কাকে ছেড়ে কাকে যে নির্বাচন করবে কে বলে দেবে! কিন্তু, এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, যত কষ্টই হোক একজনকে ছাড়তে হবে, দুজনকে রাখা চলবে না, কিন্তু কাকে যে ছাড়বে কাকে যে ধরবে মন কিছুতেই স্থির হয় না। মনটা একবার ফ্রাউ ফন কেরিশের দিকে ঝুঁকল, সহজেই আবিষ্কার করে ফেলল যে তাঁকেই সে ভালোবেসেছে। ভালোবেসেছে তাঁর দ্রুত দুটি চোখ, আধ-খোলা ঠোঁট দুটির উপর ঈষৎ-উদাসীন একটি হাসির আলস্য, তাঁর স্বচ্ছসুন্দর কপাল,

চুলের এক পাশে বাঁকা করে সিঁথি কাঁটা—আর কী ঘননম্র তাঁর চুল! একটু মোটা গলার আওয়াজ, কখনো বা তাতে একটু কাশির ঝাঁজ মেশানো, তাঁর জননী-সুলভ বিশাল দুটি করতল। তাঁর চলাফেরার সমৃদ্ধ গাম্ভীর্য—আর তাঁর রহস্যময় অশরীরী আত্মা! ভালোবেসেছে, নিশ্চয়ই সে ভালোবেসেছে। তাঁর পাশটিতে যখন সে বসে, কখনো কখনো করুণায় তিনি তাকে বই থেকে কিছু পড়ে শোনান, ব্যাখ্যা করে মানে বুঝিয়ে দেন—অর্থ সে কিছুই বোঝে না, তবু তাঁর করুণায় তাঁর কণ্ঠস্বরে সে রোমাঞ্চিত হয়। কখনো তিনি তার কাঁধের উপর হাত রাখেন, তাঁর আঙুলের উষ্ণতা সে যেন স্পষ্ট অনুভব করে, তার গালের উপর তাঁর নিশ্বাস লাগে। তাঁর গায়ের গন্ধটি তাকে আচ্ছন্ন করে ধরে। আনন্দে বিভোর হয়ে সে শোনে, বইয়ের কথা সংসারের কথা সমস্ত ভুলে যায়, বাক্য আর অর্থ কিছুরই কোনো অর্থ থাকে না। এ ভাবটা বুঝি ধরে ফেলেন ফ্রাউ কেরিশ, বলেন,—কী বললাম বলো দিকি? তখন কিছুই সে বলে না, কিছুই তার বলবার নেই। তখন খুব রেগেছেন এমনি ভাব দেখান ফ্রাউ কেরিশ, কিন্তু রাগের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেও সারা মুখ ঝলমল করে ওঠে। বই দিয়ে তার নাকে একটা টুশকি মারেন ফ্রাউ কেরিশ, তাকে গাধা বলে তিরস্কার করেন। যতক্ষণ ক্রিসতফ ফ্রাউ কেরিশের গাধা আছে ততক্ষণ তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, ততক্ষণ আর কারুর সে তোয়াক্কা করে না সংসারে। প্রতিবাদ করার ভাব দেখান ফ্রাউ কেরিশ—বলেন, সে যদিও একটা বিশ্রী গাধা, আর অত্যন্ত বোকা, তবু তাকে তাঁর রাখতে আপত্তি নেই, এমন কি একটু ভালোবাসতেও আপত্তি নেই—যদিও সে একটি নিরেট অপদার্থ—শুধু সে যদি নিছক ভালো হয়, ভালো থাকে।

তারপর দুজনে তারা হাসে। ক্রমে সে-আনন্দের হ্রদে সাঁতার কাটে ক্রিসতফ।

যখন বুঝল ফ্রাউ ফন কেরিশকেই সে ভালোবাসে তখন অনায়াসে ছেড়ে দিল মীনাকে। এমনিতেই গোড়া থেকেই তার কাঠিন্য ও উপেক্ষায় বিরক্ত ছিল ক্রিসতফ, ঘন ঘন দেখা হচ্ছে বলে তারও সাহস ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—ক্রমেই বেশ সহজ ও হালকা হতে পেরেছে মীনার সামনে—এমন কি তার প্রতি যে ক্রিসতফ বিরক্ত এটুকু গোপন করবারও আর ইচ্ছে হচ্ছে না। ক্রিসতফকে দংশন করতে সব সময়েই উন্মুখ মীনা, ক্রিসতফও আজকাল ফেরাফিরতি হুল ফুটাতে পিছপা হয় না। পরস্পরকে প্রতিনিয়তই তারা কঠিন কথা বলে যাচ্ছে। মজা পেয়ে হাসেন শুধু ফ্রাউ কেরিশ। কথা-কাটাকাটিতে ক্রিসতফ মোটেই তীক্ষ্ণ নয়, তার নেই সেই ঝাঁজ আর ঝাল, তাই সে-ই বেশি ক্রুদ্ধ, বিধ্বস্ত হয়। এমন একটা ভাব করে যেন মীনার মত ঘৃণ্য আর নেই কেউ সংসারে। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে ফ্রাউ কেরিশের জন্যেই তার ও-বাড়িতে যাওয়া। নইলে ভারী তার দায় পড়েছিল!

তবু আগের মতই বাজনা শিখিয়ে চলেছে মীনাকে। সপ্তাহে দুদিন, সকাল নটা থেকে দশটা—মেয়েটার সুর আর তাল-মানের সে তদারক করে। যে ঘরে বসে চলে এই পড়াশোনা সেটা মীনার স্টুডিয়ো। তার মেয়েলী মন যেমন খামখেয়ালী, তেমনি বিশৃঙ্খল তার ঘর।

টেবিলের উপর বাজন্ত কতগুলি খেলনা-বেড়াল—একটা গোটা অর্কেস্ট্রা-পার্টি, কেউ বেহালা কেউ বা খঞ্জনী বাজাচ্ছে, ছোট একটা পকেট-আয়না, লেখবার জিনিস, প্রসাধনের টুকিটাকি। সব এলোমেলো করে সাজানো। তাকের উপরে প্রসিদ্ধ সুরকারদের ছোট-ছোট আবক্ষ

মূর্তি, ভুরু কুঁচকে আছে বীঠোফেন, মখমেলের টুপি পরা হ্বাগনার আর এদিকে একটি এপোলো বেলভিডিয়র দাঁড়িয়ে। কুলুঙ্গির মধ্যে একটা ব্যাঙ পাইপ টানছে, আছে একটা কাগজের পাখা তাতে বেরুথ্ থিয়েটরের ছবি আঁকা। বইর তাকে কয়েকখানা বই—মমসেন, শীলার, জুলস ভার্ন, মন্তেইন। দেয়ালে ম্যাডোনার প্রকাণ্ড ছবি, নীল আর সবুজ ফিতের বর্ডার দেয়া। সবচেয়ে বেশি যা চোখে পড়ে, চোখকে যা পীড়া দেয়, প্রহার করে, তা হচ্ছে এখানে-সেখানে কোণে-কানাচে অগুনতি ফোটো-গ্রাফ—কোথাকার কোন সরকারী কর্মচারীর, জমিদারের, পাদ্রী-সাহেবের, মেয়ে-বন্ধুর। এত ছবি যে লেখাজোখা নেই। সব চেয়ে যা চক্ষুশূল তা হচ্ছে প্রত্যেকটি ছবির নিচে কি সব লেখা। আর সে-সব লেখা পদ্য, কিংবা অন্তত তাই, জার্মানীতে যাকে পদ্য বলে। আর সব চেয়ে যা বিরক্তিকর তা হচ্ছে পিয়ানোর উপরেই ছোট-ছোট কটা বাঁদর।

দেরি করে ঘরে ঢোকে মীনা, ঘুমে চোখ দুটি ফুলোফুলো, মুখখানি ভার-ভার। জ াঁ-ক্রিসতফের দিকে হাত একটু বাড়ায় কি না-বাড়ায়, শুকনো গলায় অভিবাদন করে কি না-করে। নিঃশব্দে নিটোল গম্ভীর হয়ে, সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে এসে পিয়ানোয়। যখন মীনা একা-একা বাজায় তখন যে কোনো পর্দায় সে সুরের ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে মত সুরের জাল বুনে-বুনে সে গড়তে পারে স্বপ্নের নিদ্রাপুরী। কিন্তু জ াঁ-ক্রিসতফ এলেই সব মাটি। ক্রিসতফ তার মনের এই খেয়ালীপনাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, সে মাস্টার, সে মীনাকে বিশেষ কোনো একটা অনুশীলনে আবদ্ধ করে রাখে। রাগ হয়ে যায় মীনার, কি করে প্রতিশোধ নেবে ভেবে পায় না। শেষে যা-তা করে বিশ্রী করে বাজিয়ে অকৃতকার্য হবার ভান করে। এমনিতে বাজিয়ে মন্দ নয় মীনা, কিন্তু অনেক জার্মান মেয়ের মতই বাজনা সে ভালোবাসে না। কিন্তু জার্মান মেয়েদের

মতই মনে করে বাজনাটা তার পছন্দ করা উচিত, তাই মনোযোগ দিয়ে শেখবারও তার আগ্রহ আছে—কিন্তু যেমন মাস্টার একজন জুটেছে, তাকে মানতে তার মন ওঠে না। একেক সময় এমন একটা দুষ্টু খেয়াল জাগে যে ইচ্ছে হয় রাগে অন্ধ করে দিই মাস্টারকে। মীনা জানে, আর কিছু নয়, শুধু নীরব উপেক্ষা দিয়েই যথেষ্ট ক্ষিপ্ত করতে পারে সে ক্রিসতফকে। কিন্তু একেক সময় সমস্ত মতলোব ভেস্তে যায় যখন মীনা ভাবে এই সুরের মধ্যে আত্মাকে ঢেলে দিতে হবে, কিংবা আত্মার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে দিতে হবে এই সুরধ্বনি, তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। তখনই তার মন কেমন শূন্য মনে হয়। তখনই সে ভাবাকুল হয়ে ওঠে।

তার পাশে বসে জাঁ-ক্রিসতফও বিশেষ শিষ্টাচার দেখায় না। প্রথমত প্রশংসা করে না বিন্দুমাত্র—কোনো সময়ে না। তাই এমন একটাও মন্তব্য সে করতে পারে না যার প্রত্যুত্তরে মীনা না খোঁচা মারে। যা সে বলবে কোনোটাই মেনে নেবে না মীনা, তর্ক করবে আর যদি কখনো মীনা ভুল করে, জোর দিয়ে বলবে, বইয়ে যেমন আছে তেমনি বাজিয়েছে হুবহু। চটে যায় ক্রিসতফ। তারপর সুরু হয় নির্দয় কথার ঢিল-ছোঁড়াছুঁড়ি—এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে না গিয়ে শেষে একেবারে গায়ে এসে লাগে। পিয়ানোর চাবির দিকে চোখ রাখলেও বাঁকা চোখে তাকিয়ে মীনা দেখে ক্রিসতফের রাগ, আর তার জ্বালাটা উপভোগ করে। এক-ঘেয়ে বিরক্তির থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে নানারকম কৌশল সৃষ্টি করে মীনা—আর কোনো উদ্দেশ্যে নয়, যেন মাস্টারিটা একটু ক্ষান্ত হয়, যেন ক্রিসতফকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সে একটু মজা পায় ফাঁকতালে। কখনো বা বিষম খায় মীনা, কখনো বা কাশতে সুরু করে, কখনো বা ঝিকে কি-একটা জরুরি কথা বলবার জন্যে উঠে যায় ঘর ছেড়ে। জাঁ-ক্রিসতফ বেশ

বোঝে, ছলনা করছে মীনা আর মীনাও বেশ বোঝে তার এই ছলনাটা দিব্যি বুঝতে পেরেছে ক্রিসতফ। বেশ লাগে মীনার, কেননা ক্রিসতফের মনে এখন কী হচ্ছে তা বলার সাধ্য নেই ক্রিসতফের।

একদিন এমনি মজার খেলায় মেতে উঠেছে, হঠাৎ রুমালে মুখ লুকিয়ে কাশতে লাগল মীনা। এমন ভাবে কাশতে লাগল যেন দম আটকে যাবে এক্ষুনি। আসলে কিন্তু চোখের কোণ থেকে দেখছে ক্রিসতফের বিরক্তির তাপটা কতদূর ওঠে! হঠাৎ কি এক দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এল, রুমালটা ফেলে দিল মেঝের উপর। এমনভাবে ফেলল যাতে ক্রিসতফ তুলে দেয় আলগোছে। দিলও তাই, কিন্তু ঘোরতর বিরক্তির সঙ্গে। "ধন্যবাদ।" খুব একটা গম্ভীর ও বদান্য ভঙ্গি করে বললে মীনা। ভাব দেখে রাগে ক্রিসতফ প্রায় ফেটে পড়ে।

এই খেলাটা এত ভালো যে পুনরাবৃত্তি চলে। পরদিন আবার অমনি রুমাল ফেলল মীনা। জাঁ-ক্রিসতফ এবার নড়ল না, এক ইঞ্চিও না, রাগে ফুটছিল তার রক্ত। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মীনা, শেষে আহত ভঙ্গিতে বললে, "দয়া করে আমার রুমালটা একটু তুলে দেবে?"

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না ক্রিসতফ। রুক্ষকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি তোমার চাকর নই। নিজের রুমাল নিজেই তুলে নাও।"

রাগে রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেল মীনা। টুল থেকে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল, টুলটা ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে গেল মেঝেতে।

"অসহ্য!" পিয়ানোর উপর প্রবল একটা থাবা বসিয়ে রাগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ক্রিসতফ। ফিরল না মীনা। নিজের ব্যবহারে লজ্জায় মরে যেতে লাগল ক্রিসতফ—একটা অসভ্যের মত সে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, তাকে

নিয়ে মীনার এই উদ্ধত বিদ্রূপের কোনো অর্থ হয় না। ভয় হতে লাগল যদি মার কাছে মীনা নালিশ করে, আর তাঁর মন থেকে ক্রাউ কেরিশ যদি তাকে মুছে ফেলেন। কি করবে ভেবে পেল না ক্রিসতফ; যদিও তার এই বর্বরতার জন্যে সে দুঃখ প্রকাশ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে সে প্রস্তুত নয়। তাকে ক্ষমায় আনত করতে পারে এমন কোথাও কোনো শক্তি নেই পৃথিবীতে।

কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়ায় দেখবার জন্যে পরদিন আবার এসেছে ক্রিসতফ। মীনা নিশ্চয়ই আজ পড়তে আসবে না। কিন্তু মীনা অমন ঠুনকো ছিঁচকাদুনে মেয়ে নয়। সে এত গর্বিত যে কারুর কাছে নালিশ করে না। নালিশ করে যেচে বকুনি খেতে সে রাজি নয়। তাই সটান পড়তে এল মীনা। কিন্তু যতক্ষণ সাধারণত অপেক্ষা করে ক্রিসতফ তার চেয়ে পাঁচ মিনিট বেশি তাকে বসিয়ে রাখল। শক্ত ঋজু হয়ে পিয়ানোর কাছে বসল টুলের উপর। ঘাড়ও ফেরালনা, টু আওয়াজও করল না—যেন তার কাছে জঁা-ক্রিসতফের অস্তিত্বের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু শেখবার বেলায় বুদ্ধিমানের মত ঠিক-ঠিক সব শিখে নিলে। মুখে যাই বলুক মনে-মনে মীনা জানে ওস্তাদ বাজিয়ে জঁা-ক্রিসতফ, যদি ভালো চায় এই বেলা সে কাজ বাগিয়ে নিক, পরের পর শিখে নিক গৎগুলো। আর ভালো বাজনদার হবার সখ তার কত দিনের। সংস্কৃতির ছাপ-মারা আধুনিক কানুন-দুরস্ত শিক্ষিত মহিলা হবার।

কিন্তু কী অসম্ভব নীরস এই ছেলেটা।

মার্চ মাসের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাত—পাখির পালকের মত বরফের কুচি উড়ছে বাতাসে, ওরা দুটিতে বসেছিল স্টুডিয়োতে। দিনের আলো বলা যায় না সে-অপূর্ব অস্পষ্টতাকে। একটা ভুল আওয়াজের সপক্ষে

তর্ক করছিল মীনা। বলছিল, "লেখা আছে তেমনি।" স্পষ্ট বুঝতে পারছে ক্রিসতফ, মিথ্যা কথা বলছে মীনা, তবু তীক্ষ্ণ চোখে বইটা দেখবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়ল। বইয়ের র‍্যাকের উপর মীনার হাতখানা নিশ্চল হয়ে আছে। আর সেই হাতের কাছেই ক্রিসতফের ঠোঁট। পড়তে চেষ্টা করল ক্রিসতফ, পারল না। তার চোখ যেন আর কিছু দেখছে, দেখছে যেন সদ্যস্ফুট স্বচ্ছ সুন্দর একটি ফুল! হঠাৎ—কী ভাবছিল কিছুই সে জানে না—সেই ছোট নিরীহ হাতখানির উপর তার ঠোঁট দুটো সে জোরে চেপে ধরল।

দুজনেই হতভম্ব হয়ে গেল মুহূর্তে। ধাক্কা খেয়ে পিছনে হটে এল ক্রিসতফ, এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল মীনা—দুজনেই লজ্জায় বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। কেউ কারু সঙ্গে কথা কইল না, তাকাল না পরস্পরের দিকে। স্তম্ভিত স্তব্ধতাটা কাটলে আবার বাজনা নিয়ে বসল মীনা—কেমন অস্বস্তি লাগছে তার, কিসের একটা ভারে তার বুক ওঠা-নামা করছে। একের পর এক ভুল চাবিতে আঙুল ফেলছে। এসব দেখেও দেখছে না ক্রিসতফ—মীনার চেয়েও বেশি সে বিচলিত। তার কপালের শির দুটো দপ দপ করছে। কোনো শব্দই তার কানে ঢুকছে না, কী বাজাচ্ছে মীনা কে জানে। তবু এই মৌনের ভারটা হালকা করবার জন্যে প্রায় বোবা গলায় কটা মামুলি মন্তব্য করলে ভয়ে-ভয়ে। মীনার কাছে তার নাম চিরদিনের মতো ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বুদ্ধি লোপ পেয়ে কী যে হঠাৎ সে করে বসল কল্পনা করতে পারে না। সে কী ভীষণ অভদ্র আর মূর্খ! নিজেকেই ধিক্কার দিল সে শতকণ্ঠে। পড়ার ঘণ্টা শেষ হয়ে যেতেই মীনার দিকে না তাকিয়েই বিদায় নিল সে, যাবার আগে অভিনন্দনের কথাটুকুও মনে এল না। কিছু মনে করেনি মীনা। জ'া-ক্রিসতফ যে অশিষ্ট-অভদ্র এমন কথা আর তার মনের কোণেও উঁকি

মারছে না। বাজাতে বসে একধার থেকে কত ভুল করছিল সে—তার কারণ আর কিছুই নয়, চোখের কোণের থেকে ক্রিসতফকে দেখছিল সে একদৃষ্টে—হয়তো বা খানিকটা বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে, এবং—এই প্রথম, একটু-বা সহানুভূতির সঙ্গে।

যখন তাকে একা রেখে চলে গেল ক্রিসতফ, আর-আর দিনের মত সে মার কাছে ছুটে গেল না, ঘর বন্ধ করে সে ভাবতে বসল। ভাবতে বসল, মুহূর্তে কী একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে। দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে আয়নার সামনে বসে আছে। তার চোখ দুটিকে মনে হচ্ছে নরম আলোতে ঝলমল করছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা একটু কামড়ে ধরে ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করল একবার। আয়নাতে নিজের মুখ দেখছে আর মনে-মনে সৃষ্টি করছে সেই দৃশ্যটুকুকে আর সঙ্গে-সঙ্গেই লজ্জায় রাঙা হচ্ছে আর হাসছে। দেখছে তার শান্ত মুখ কি করে হঠাৎ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠতে পারে! খাবার সময় তাকে ভারি প্রফুল্ল দেখাল, শুধু প্রফুল্ল নয়, আনন্দ-দীপ্ত। বিকেলের খানিকটা একা-একা কাটালো ড্রয়িংরুমে; হাতে কিছু সেলাই ছিল, তাই নিয়ে বসল সে অন্যমনস্কের মত। কিন্তু দশটা ফোঁড় দিতে একটা অন্তত ভুল হয়ে যাচ্ছে। হোক না ভুল, কী হয় ভুল হলে! ঘরের কোণে মার দিকে পিঠ করে বসে হাসল সে আপন মনে। হঠাৎ কী খেয়াল হল, ইচ্ছে হল নিজেকে আনন্দে বিকীর্ণ করে দি, মুক্তি দি আনন্দের হাওয়ায়। হঠাৎ ঘরময় সে নাচ সুরু করে দিল, গান ধরল গলা ছেড়ে। মা চমকে উঠল, ভাবল মেয়েটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে বুঝি। হাসতে হাসতে মার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মীনা, চুমু খেতে লাগল মাকে।

সন্ধ্যেয় যখন নিজের ঘরে ঢুকল, অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, শুতে

গেল না। আয়নায় কেবল নিজেকে দেখতে লাগল বারে-বারে, ঘটনাটা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল—সারা দিন ঐ একই কথা ভেবে-ভেবে এখন আর কিছুই মনে করতে পারছে না। আস্তে-আস্তে কাপড় ছাড়তে লাগল—কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে হাসতে লাগল থেকে-থেকে, মনে আনতে চেষ্টা করল, জ্যঁা-ক্রিসতফ সত্যি কেমনতরো দেখতে! যেন এক স্বপ্নের জ্যঁা-ক্রিসতফ, এক কুহকের জ্যঁা-ক্রিসতফ তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বারে-বারে। এখন আর তাকে একেবারেই কিম্ভুতকিমাকার লাগছে না। বিছানায় ঢুকে আলো নিভিয়ে দিল মীনা। দশ মিনিট পরে আবার সকালের সেই ঘটনার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, অমনি হেসে উঠল সে সশব্দে। শব্দ শুনে মা জেগে পড়লেন, নীরবে এসে দরজা খুললেন, নিশ্চয়ই তার কথার অবাধ্য হয়ে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে মেয়ে। কিন্তু উঁকি মেরে দেখলেন চুপচাপ শুয়ে আছে মীনা, অস্পষ্ট মোমের আলোয় চোখ বড় করে চেয়ে রয়েছে।

"কী হল? হাসছিস কেন?"

"কিছু না।" গম্ভীর সুরে মীনা বললে: "একটা কথা মনে পড়ছিল, মা।"

"যাক, সুখী তুই, নিজের সঙ্গটুকুই তোর এত ভালো লাগে। নে, চুপচাপ ঘুমো।"

"হ্যাঁ, মা।" মীনা বললে বিনয়ীর মত। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে গর্জন করছে: "চলে যাও, তোমার পায়ে পড়ি, চলে যাও শিগগির।" দরজা বন্ধ করে মার চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে সেই স্বপ্নের সরোবরে ডুব দিতে পাচ্ছে না।

মধুর তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে মীনা। এইবার চলে এসেছে সে সেই সুখঘন ঘুমের প্রান্তে। হঠাৎ সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল:

"আমাকে ও ভালোবাসে···কী আনন্দ! আমিও ওকে ভালোবাসি। কত সুন্দর ও!···"

বালিশে চুমু খেতে লাগল মীনা, ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন তাদের দেখা হল ফের, মীনার সৌজন্যে জাঁ-ক্রিসতফ আশ্চর্য হয়ে গেল। তাকে "শুভদিন" জানালে, গায়ে পড়ে জিগগেস করলে গলাটা তার এমন একটু বসে গেছে কেন? পিয়ানোতে গিয়ে যখন বসল, যেন কেমন সুন্দর লক্ষ্মী মেয়েটি। বেশ বিনীত ছাত্রী, বাধ্য ও বিজ্ঞ। ইস্কুল-মেয়ের দুরন্তপনার কূটকৌশল কিছুই আর তার জানা নেই। জাঁ-ক্রিসতফ যা বলছে তাই শুনছে ভক্তিমতী হয়ে, স্বীকার করে নিচ্ছে ক্রিসতফের কথাই সব সত্যি! যখনই কোনো ভুল করছে, ভয়ার্ত করুণ শব্দ করে উঠছে লজ্জায়, আবার তক্ষুনি শুধরে নিচ্ছে ভুলগুলো। সব ধাঁধা লাগছে ক্রিসতফের কাছে। অল্প সময়ের মধ্যেই অবিশ্বাস্য উন্নতি করে ফেলল মীনা। শুধু বাজনাই সে এখন ভালো বাজাচ্ছে না, বাজনার মধ্যে ভাব এনে ফেলেছে, এনে ফেলেছে তার অন্তরের আবেদন। কাউকে খোসামোদ করতে অভ্যস্ত নয় ক্রিসতফ, তবু মীনাকে দু'একটা প্রশংসার কথা না বলে পারল না। আনন্দে অরুণ হয়ে গেল মীনা, ক্রিসতফের দিকে চেয়ে তাকে ধন্যবাদ দিলে, তার চোখের দৃষ্টিটি কৃতজ্ঞতায় টল টল করছে। আজকাল বেশি করে ও বেশিক্ষণ ধরে সে প্রসাধন করে—সব ঐ ক্রিসতফের জন্যে—নানারকম রঙের রেশমী ফিতে বাঁধে, ক্রিসতফকে ছোট-ছোট হাসি ও চাউনি উপহার দেয়। এ সব ক্রিসতফের ভালো লাগে না, কেমন অস্বস্তি আনে, কেননা এসব তার প্রাণের গভীর মূলে এসে নাড়া দেয়, বাজনা বাজায়। এখন মীনাই আগ বাড়িয়ে কথা কয়, কিন্তু তার কথার মধ্যে আর সেই অর্থহীন ছেলে-

মানসি নেই—কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে সে, খুব ভারিক্কি চালে কবিতা আওড়ায়। কোনো উত্তরই ক্রিসতফের মুখে আসে না, অন্তরে বসে ছটফট করে। এই মীনা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ অজানা। এ তাকে শুধু বিস্মিতই করছে না, বিচলিত করছে।

সর্বক্ষণ তাকে দেখছে মীনা। যেন কিসের জন্যে সে প্রতীক্ষা করে আছে···কিসের জন্যে? ···মীনা কি জানে না সে কী চায়? জানে, সে চায় জাঁ-ক্রিসতফ আবার তাই করুক যা সে সেদিন করেছিল। কিন্তু বড় হুঁসিয়ার হয়ে গেছে ক্রিসতফ, সে বুঝেছে তার সেদিনের ব্যবহার অসভ্যের মত হয়েছিল—আর সে-চিন্তা সে মনের কোণেও স্থান দিচ্ছে না। কিন্তু মীনা চঞ্চল, অস্থির হয়ে উঠেছে। একদিন চুপচাপ বসে আছে ক্রিসতফ, মীনার ছোট-ছোট ধারালো থাবা থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যবধান রেখে সে বসে আছে, হঠাৎ একটা ব্যাকুলতা মীনাকে পেয়ে বসল, কী করছে না করছে কিছুই স্পষ্ট না বুঝে তার একখানি হাত ক্রিসতফের ঠোঁটের কাছে মেলে ধরল। ভয়ে পিছিয়ে গেল ক্রিসতফ, মরে গেল লজ্জায়। কিন্তু তবুও, ধরল সে সেই হাতখানি, নিবিড় আনন্দে তাকে চুম্বন করলে। মীনার ব্যবহারে রাগে এত অসহায় বোধ হল যে ইচ্ছে হল তক্ষুনি সেখান থেকে সরে পড়ে।

কিন্তু পারল না সরতে। ফাঁদে পড়ে গেল। ভাবনার ঘূর্ণি উঠেছে মনের মধ্যে, তাদের দিশ-পাশ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাঠের মধ্যে থেকে যেমন কুয়াশা ওঠে তেমনি উঠছে, উড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে সেই স্বপ্নের কুয়াশা। ভালোবাসার সেই কুয়াশার মধ্যে এখানে-ওখানে সে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যাই সে করুক, যেখানেই সে যাক, সমস্তক্ষণ একটি অস্পষ্ট অথচ স্থির কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই সে আবর্তিত হচ্ছে। সে তার একটি অপরিচিত বাসনা, ভয়ঙ্কর অথচ মনোমোহন—

পতঙ্গের কাছে বহ্নিশিখা। আদিম অন্ধ প্রকৃতির আকস্মিক স্বতঃস্ফূরণ।

একটা প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে দুজনে। একে অন্যকে লক্ষ্য করছে, কামনা করছে, একে অন্যের সম্বন্ধে রয়েছে একটা আতঙ্কে। থাকছে একটা রুদ্ধশ্বাস অস্বস্তির মধ্যে। তার জন্যে ছোটখাটো খুনশুটি বা মান-অভিমানের অভিনয় করতে তারা ছাড়ছে না, বরং তাদের মধ্যে নেই যেন আর সেই ঘনিষ্ঠতা—তারা স্তব্ধ হয়ে গেছে ভিতরে-ভিতরে। নিভৃতে তারা যার-যার প্রেমের মন্দির নির্মাণ করছে।

প্রেমের বিপরীত আচরণ। সামনে যেতে সে পিছনকেও টেনে নিয়ে চলে। যে-মুহূর্তে ক্রিসতফ আবিষ্কার করল মীনাকে সে ভালোবাসে, অমনি সে স্থির করলে চিরকালই তাকে সে ভালোবেসে এসেছে। গত তিনমাস ধরে প্রায় প্রত্যহ তাদের দেখাশোনা হচ্ছে, তার মধ্যে প্রেমের নাম-গন্ধও কেউ কোনোদিন টের পায়নি। কিন্তু যেদিন সত্যি-সত্যি ক্রিসতফ ভালোবাসল সেদিনই তার মনে হল, কোন আদিকাল থেকেই এমনি সে ভালোবেসে এসেছে মীনাকে। শুধু অনুভূতি নয়, প্রত্যয়। অনুমান নয়, স্থির সিদ্ধান্ত।

যাই হোক, এতদিনে যে বুঝতে পেরেছে কাকে সে সত্যি ভালোবেসেছে, তাই একটা পরম শান্তি। এত দিন সে শুধু ভালোবেসেই এসেছে, শুধু জানতে পারেনি, কাকে। যেন একটা যন্ত্রণার উপশমের মত মনে হচ্ছে! যেন একটা অস্পষ্ট রোগে সে ক্লিষ্ট হচ্ছিল, এখন যেন যন্ত্রণাটা শরীরের একটা বিশিষ্ট অংশে সীমায়িত হয়েছে। ভালোবাসবার লোক নেই অথচ ভালোবাসা—তার মত ক্লান্তিকর আর কিছু নেই। যেন ঘুসঘুসে জ্বরের মত শরীরের হাড়-মাস কুরে-কুরে খায়। পরিচিত

যে আবেগ তা প্রাবল্যের দিকে মনকে ধাবিত করে সন্দেহ নেই, তবু বোঝা যায় কার জন্যে সেই প্রমত্ততা। সে একটা প্রাচুর্য মাত্র, বিশীর্ণতা নয়। উপচে পড়া মাত্র, নয় ক্ষয় হয়ে যাওয়া। সেটা আর যাই হোক, নয় শূন্যগর্ভ আর্তনাদ।

মীনা যদিও বুঝতে দিয়েছে যে সে ক্রিসতফের প্রতি উদাসীন নয়, তবু কেন কে জানে, এই কেবল ভাবছে ক্রিসতফ, মীনা তাকে ঘৃণা করে। সেই ভাবনায় নিজেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে অকারণে। কারুর সম্বন্ধে কারুরই স্পষ্ট ধারণা নেই তা ঠিক, তবু মনের এই অস্পষ্ট আলোছায়ার লুকোচুরিটাই বুঝি সব চেয়ে মিথ্যে। আলোর সঙ্গে ছায়ার যেন সঙ্গতি নেই, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ,যেখানে আলো সেখানে ছায়ার লেশ নেই, আবার যখন ছায়া আসে ঘনিয়ে তখন দেখা যায় না আলোর উঁকিঝুঁকি। এই এখন, এমন সুন্দর আর কারু হতে নেই সংসারে, আবার তক্ষুনি, কী বোকা, কী বাজে, কী নিরেট ! যখন দূরে-দূরে থাকে, বড় মোহনীয় লাগে, আবার যখন কাছাকাছি হয়, তখন মনে হয় পরস্পরের দোষের বুঝি অন্ত নেই।

কী যে তারা কামনা করে কিছুই জানে না। জা-ক্রিসতফের কাছে এই প্রেম—একটা সর্বগ্রাসী কোমলতার জন্যে তৃষ্ণা, একটি পরিপ্লাবী উত্তাল স্নেহের জন্যে। ছেলেবেলা থেকে এই ক্ষুধাই তাকে দগ্ধ করে মেরেছে। যা সে পরের থেকে গায়ের জোরে দাবি করতে চেয়েছে, যা বা গায়ের জোরে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে পরের উপর। স্নেহ—কোমলতা ! ইচ্ছে হয়েছে নিজেকে নিঃশেষে বিসর্জন করে দি, অন্যেও বিসর্জন করুক স্বচ্ছন্দে। কি একটা অজাত নৃশংস কামনার ঝড়ে সে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে সব কিছু সে উড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসে। মীনা শুধু একটি রহস্য-রোমাঞ্চের ভক্ত, তার কল্পনা ও

ভাবালুতাকে তৃপ্ত করার জন্যেই তার এই বেদনা-বিলাস। তাদের প্রেমের অধিকাংশই কাব্যিক। যে সব বই তারা পড়েছে তারই উপর তারা ভাবের বনেদ গড়ে। যেসব অনুভব তাদের নয়, তাই আরোপ করে নিজেদের চরিত্রে। একে অন্যেকে অধিকতর করে দেখে: হয়তো বা অধিকতর করে দেখায়।

কিন্তু এমন একটি মুহূর্ত হয়তো আসবে যখন ঐ সব ছোটখাটো মিথ্যে ও অহঙ্কার প্রেমের দিব্য জ্যোতির ছটায় বিলীন হয়ে যাবে। হয়তো একটি দিন—একটি ঘণ্টা—কিংবা একটি মুহূর্ত—তাই শাশ্বত হয়ে থাকবে কালের পটপত্রে…এবং তা হয়তো আসবে আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত…

একদিন, সন্ধ্যের সময়, দুটিতে বসে কথা বলছে নির্জনে। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। তাদের কথাবার্তা গম্ভীর হয়ে এসেছে ক্রমশ। তারা তখন অনন্তের কথা বলছে, জীবন আর মৃত্যুর কথা। তাদের ক্ষুদ্র আকুলতার অনুপাতে তৈরি করছে বৃহত্তর আধার, হয়তো বা মুক্ততর আকাশ। আমি খুব নিঃসঙ্গ, নালিশ করছে মীনা, আর জাঁ-ক্রিসতফ বলছে, তুমি যতটা নিজেকে একা-একা ভাবছ ততটা একলা তুমি নও।

"না।" মাথা নেড়ে মীনা বললে, "কথার কথা বললে শুধু একটা। সকলেই নিজের-নিজের জন্যে বাঁচে। তোমার জন্যে কারু কোনো আগ্রহ নেই, কেউ তোমাকে ভালোবাসে না।"

স্তব্ধতা…

"কিন্তু আমি?" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ক্রিসতফ। আবেগে ম্লান তার কণ্ঠ।

"তুমি?" মীনা লাফিয়ে উঠল, চেপে ধরল ক্রিসতফের হাত।

তখুনি দরজা খুলে গেল। দুজনে ছিটকে গেল দু'পাশে। ঘরে ঢুকলেন ফ্রাউ কেরিশ। জাঁ-ক্রিসতফ তাড়াতাড়ি একটা বই টেনে নিয়ে তার মধ্যে ডুবে গেল, কিন্তু হায়, বই সে উল্‌টো করে ধরেছে। মীনা বসল তার সেলাই নিয়ে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ছুঁচ বিঁধেছে আঙুলে।

সে-সন্ধ্যের বাকি সময়টা আর তারা থাকতে পেল না একসঙ্গে—একসঙ্গে থাকতেও কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। পাশের ঘরে কি একটা আনতে উঠে যাবেন ফ্রাউ কেরিশ, মীনা—এমনি যে কোনোদিন যায় না—ছুটে গেল তা নিয়ে আসতে। তারপর, কোন সময় একটু উঠে গিয়েছেন ফ্রাউ কেরিশ, সেই ফাঁকে কাউকেও শুভরাত্রি না জানিয়ে কেটে পড়ল ক্রিসতফ।

পরদিন আবার দেখা হল তাদের, ছেঁড়া কথার খেই ধরবার জন্যে দুইজনেরই অধীর ঔৎসুক্য। সফল হল না। কিন্তু ভাগ্য অনুকূল ছিল, ফ্রাউ কেরিশ তাদেরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। কত কথা বলবার সুযোগ তখন তাদের। কিন্তু কেন কে জানে, কোনো কথাই মুখে আসে না ক্রিসতফের ; মনে তার সুখ নেই এক ফোঁটা। কী কথা কইবে, থেকে-থেকে সে সরে যাচ্ছে মীনার থেকে। আর, এ অসৌজন্য মীনা যেন দেখেও দেখছে না, অথচ ভেতরে-ভেতরে খোঁচা খাচ্ছে। তারপর কখন এক ফাঁকে কী-কটা কথা বলেছে ক্রিসতফ, এমন একটা কঠিন ঠাণ্ডা মুখ করে রইল মীনা, কথাটা শেষ করতে পারল না। এইবার শেষ হয়ে এল বেড়ানো—এইবার সরে পড়তে হবে। সময় চলে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে। ম্লান শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রিসতফ—এমন একটা সুযোগের সে সদ্ব্যবহার করতে পারল না।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। মনে হল একে অন্যের প্রতি অনুভূতির আস্বাদে বোধহয় তাদের ভুল হয়েছে। ঠিক হয়নি বোধহয় বর্ণবিচার।

সেই সন্ধ্যাটি হয়ত স্বপ্নের রঙে রাঙা—আর হয়ত কোনোই তার বাস্তবতা নেই। ক্রিসতফের বিরুদ্ধে চটে আছে মীনা। মীনার সম্পর্কে ভয় ধরেছে ক্রিসতফের। ক্রমশই তারা জুড়িয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে সেদিন। বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আছে দুজনে, কেউ কারু সঙ্গে কথা কইছে না। বই পড়ছে, হাই তুলছে, জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে বাইরে—মন-মেজাজ তিক্ত-বিরক্ত হয়ে আছে। বিকেল চারটের সময় আকাশ একটু পরিষ্কার হল। বাগানে ছুটে এল দুজনে। দেয়ালে কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়াল পাশাপাশি। নদীর দিকে গড়ানো সমতল মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। মাটির থেকে ধোঁয়া উঠছে, কুয়াশা হয়ে উড়ে যাচ্ছে সূর্যের দিকে, ঘাসের ডগায় ঝলমল করছে টাটকা বৃষ্টির ফোঁটা। ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশছে ফুলের গন্ধ—গুন গুন করছে সোনালী মাছির ঝাঁক। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, অথচ কেউ কারু দিকে তাকাচ্ছে না এক পলক। এমন স্তব্ধতা ভাঙতেও যেন কষ্ট হয়! বৃষ্টিতে ভরপুর একটি ফুলের গায়ে একটা মাছি এসে ঘা মারল, কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল দুজনের উপরে। হেসে উঠল দুজনে এবং সেই মুহূর্তেই তাদের মনে হল একে অন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। আবার তারা বন্ধু হয়ে গেছে সহজে। তবু, কেন কে জানে, তাকাতে পাচ্ছে না একে অন্যের দিকে। হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, ক্রিসতফের হাত ধরল মীনা। তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, "এসো।"

বাগানের মাঝখানে যেখানটায় ছোট্ট একটা আঁকাবাঁকা পথ, সেখানে তাকে নিয়ে এল মীনা। ভেজা মাটিতে পা ফেলে-ফেলে এগুতে লাগল দুজনে, তাদের মাথার উপরে গাছগুলি তাদের বৃষ্টিসিক্ত শাখা প্রসারিত করে ধরল। প্রায় শেষ প্রান্তে এসে মীনা দাঁড়াল স্তব্ধ হয়ে, বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

"দাঁড়াও···থামো···" নিশ্বাস নিতে নিতে নিম্নস্বরে বললে মীনা।

তার দিকে তাকাল ক্রিসতফ। অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে আছে মীনা, হাসছে, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে,—ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। ক্রিসতফের মুঠোর মধ্যে কাঁপছে তার হাতখানা। তাদের যুক্ত হাতের সঙ্গমে রক্ত তপ্ত হয়ে উঠেছে। তপ্ত হয়ে উঠেছে আঙুলের প্রান্তগুলিতে। চারদিক নিঃশব্দ। রৌদ্রের স্পর্শে গাছের কচি কিশলয়গুলি কাঁপছে মৃদু-মৃদু। পাতা থেকে ধীরে-ধীরে ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ বৃষ্টির রূপোলি শব্দ। আর আকাশ ভরে যাচ্ছে সোয়ালোর ডাকে।

ক্রিসতফের দিকে মুখ ফেরাল মীনা—একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত। তার গলা দুই হাত দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল, তার সেই উন্নত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রিসতফ।

"মীনা—মীনা—ডার্লিং—"

"তোমাকে আমি ভালোবাসি ক্রিসতফ, ভালোবাসি।"

ভেজা একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসল দুজনে। প্রেমে তারা প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, যে প্রেম মধুর, গভীর, কিন্তু অসম্ভাব্য। আর-সব মিলিয়ে গেছে শূন্যে। নেই আর অহঙ্কার আর অভিমান, নেই এতটুকু গাম্ভীর্য-গোপনতা। ভালোবাসা, ভালোবাসা—তাদের দুটি হাসিভরা সাশ্রু চোখ শুধু তাই বলছে নীরবে। সেই চপলপক্ষ মেয়ে আর সেই গর্বোদ্ধত ছেলে সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল কত বড় আত্মত্যাগ করতে পারে তারা, পরস্পরের জন্যে নিজেকে রিক্ত করতে পারে, কত দুঃসহ দুঃখ স্বীকার করতে পারে, মরতে পারে অকাতরে। যেন কেউ কারু সঙ্গে লিপ্ত নয় আর, পরিচিত নয় পরস্পরের কাছে। যেন সমস্ত কিছু বদলে গিয়েছে নিমেষে—তাদের হৃদয়, তাদের মুখ, তাদের চোখ সমস্ত কিছু এক

অনির্বচনীয় দয়ায় আর স্নেহে বিভাসিত হয়ে উঠেছে। পবিত্রতার মুহূর্ত, আত্মদানের মুহূর্ত—নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করে দেবার শুভক্ষণ। এ ক্ষণটি কি আর আসবে কখনো জীবনে ?

কেউ কাউকে ছাড়বে না, ভুলেও বিচ্যুত হবে না বিচ্ছেদে, তাই তারা বলতে চাইল শব্দের অস্ফুটতায়, আবেগের ফেনিলতায়। বলতে চাইল চুম্বনে, আনন্দের অসংলগ্ন উচ্ছ্বাসে। দেখল, অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভয় পেয়ে ছুট দিল বাড়ির দিকে। হাতে হাত ধরা। হোঁচট খেয়ে পড়ছে বুঝি মাটিতে, গাছের ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছে না। আনন্দের মদিরায় তারা অন্ধ, তারা উন্মাদ।

মীনার থেকে বিদায় নিয়ে সটান বাড়ি ফিরল না ক্রিসতফ। কেননা আজ ঘুম আসবে না কিছুতেই। শহর ছেড়ে চলল সে মাঠের দিকে। রাতের অন্ধকারে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল দিশেহারা। বাতাসের স্পর্শটি কী সজীব—সমস্ত মাঠঘাট অন্ধকার, জনহীন। একটা পেঁচা ডেকে গেল কর্কশ কণ্ঠে। যেন নিশিতে পেয়েছে ক্রিসতফকে, তেমনি হাঁটতে লাগল উদ্‌ভ্রান্তের মত। দূরে শহরের বাতিগুলি ঝকঝক করছে, অন্ধকারে আকাশে ঝকঝক করছে তারার হীরের টুকরো। রাস্তার পাশে ছোট একটা দেয়ালের উপর সে বসল। সহসা কেঁদে ফেললে। কেন কাঁদছে কে বলবে। সে ভীষণ সুখী—আর তার এই আনন্দের প্রাচুর্য বিষাদ আর প্রসন্নতার সংমিশ্রণ। এ চোখের জলে আরো অনেক কিছু মিশে আছে। মিশে আছে কৃতজ্ঞতা, তার এই আনন্দের জন্যে অভিবাদন। মিশে আছে করুণা, যারা জীবনে পায়নি এই সৌভাগ্যের আস্বাদ তাদের জন্যে, মিশে আছে বা বিষণ্ণতা, সমস্ত কিছুর ক্ষণিকতা ও ভঙ্গুরতার জন্যে, প্রাণধারণের এই প্রমত্ততার জন্যে। আনন্দে কাঁদছে ক্রিসতফ, আর সেই কান্নার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। যখন জাগল, প্রভাত উঁকি

মারছে পূব দিগন্তে। নদীর উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে শাদা কুয়াশা, সমস্ত শহরকে আবৃত করে ধরেছে। যে শহরের এক কোণে ক্লান্তকায়ে ঘুমিয়ে আছে মীনা, যার হৃদয়ে আঁকা আছে এই আনন্দের হাসিটি।

পরদিন সকালে এক ফাঁকে আবার তাদের দেখা হল বাগানে। আরেকবার জানাল তাদের ভালোবাসা—কিন্তু সেই দিব্য আবেশটুকু যেন আর নেই, সেই দিব্য অচৈতন্য। মীনা যেন সজ্ঞানে একটু অভিনয় করছে প্রেমে-পড়া মেয়ের মত, আর ক্রিসতফ, যদিও সে তুলনায় অনেক সরল ও স্বচ্ছ, সেও একটু অভিনয় করছে। জীবন তাদের কি ভাবে গড়ে উঠবে তারই আলাপ করে এখন। নিজের দারিদ্র্য ও হীনাবস্থার কথা ভেবে পরিতাপ করে ক্রিসতফ। মীনা বদান্য হবার ভান করে, যেন উপভোগ করে তার নিজের মহানুভবতা। বলে টাকার কথা সে এতটুকুও ভাবে না, টাকার জন্যে তার মাথাব্যথা নেই। কথাটা সত্যি, কেননা টাকার বিষয় জানবারই তার কোনো সুযোগ হয়নি—কাকে বলে টাকা না থাকার দুঃখ! প্রকাণ্ড একজন শিল্পী হবে সে ভবিষ্যতে, তারই সঙ্কল্প ঘোষণা করে ক্রিসতফ, আর তার দিকে মীনা মুগ্ধনেত্রে তাকায়। যেমনটি উপন্যাসে লেখে, ঠিক তেমনি। মীনা মনে করে প্রেমে-পড়া মেয়ের মত ভাবভঙ্গি করলেই তাকে ভালো মানাবে। কবিতা পড়ে মীনা, ভাবে গদ্গদ হয়ে ওঠে। ছোঁয়াচ লাগে ক্রিসতফের রক্তে। পোশাক-আশাক সম্বন্ধে সে সবিশেষ সতর্ক হয়ে ওঠে, কথার উপরে উদ্যত পাহারা দেয় সব সময়, কৃত্রিমতায় গম্ভীর হয়ে থাকে। ফ্রাউ কেরিশ তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখেন আর হাসেন, আর ভাবেন ছেলেটা দিন-দিন অমন বোকা হয়ে যাচ্ছে কেন?

যাই বলো, কাটছে কিন্তু অপূর্ব কবিতার আশ্চর্য মুহূর্ত কটি। ম্লান

দিনের বিমর্ষতার মধ্যে থেকে ফুটে উঠছে কবিতা, যেমন কুয়াশার মধ্যে থেকে রোদের ঝলকানি। একটি চাউনি, একটি ভঙ্গি, একটি বা অর্থহীন কথা—আর তারা আনন্দে অবগাহন করে উঠছে। সন্ধ্যেবেলায় সিঁড়ির আবছায়ায় দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানানোর মুহূর্তটি কী অপরূপ! একের চোখ দুটিকে অন্যের চোখ দুটি দিয়ে খুঁজে বেড়ানো, সেই আধো-অন্ধকারে পরস্পরের হৃদয়ের ভাষাটুকুর মানে খুঁজে পাওয়া—তারপর অলক্ষ্যে কখন একজনের হাতের মধ্যে আরেকজনের হাতের প্রত্যাশাটি স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে-স্তব্ধতায় সে-স্পর্শে রোমাঞ্চ লাগে রক্তে। গলা কেঁপে যায়। অর্থহীন খুঁটিনাটি আচরণ রাত্রির নিদ্রাহীনতাকে মধু দিয়ে ভরে রাখে। ঘুমটা গভীরে নেমে যেতে চায় না, নেমে যেতে চায় না বিস্মৃতিতে, ঘড়ির প্রতিটি ঘণ্টার বাজনা শুনতে পায়, আর সেই সঙ্গে হৃদয়ও বেজে ওঠে: "আমাকে ভালোবাসে।" যেন একটি ঝর্ণা কুলকুল করে বেজে চলেছে সেই অনুভূতিতে।

আহা, সমস্ত বস্তু, চারদিকের সমস্ত কিছুতেই ইন্দ্রজাল। পাতায় পুষ্পে বসন্তের হাসিটি কি মনোহর! আকাশ কী উজ্জ্বল, বাতাস কী কোমল! এমনটি যেন কেউ কোনোদিন জানেনি-শোনেনি। সমস্ত শহর—লাল রঙের ছাদ, পুরোনো দেয়াল, পাথুরে রাস্তা—সমস্ত কী দয়ার্দ্র চোখে দেখছে ক্রিসতফকে—ক্রিসতফের হৃদয় দুলে-দুলে ওঠে। রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বিছানা থেকে উঠে মীনা জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়, ঘুমহারা তপ্ত চোখে বাইরে চেয়ে থাকে। তারপর কোনো বিকেলে ক্রিসতফ যদি না আসে, তখন একা-একা দোলনায় দোল খায় মীনা আর আধ-বোজা চোখে স্বপ্ন দেখে। হাঁটুর উপর বই পড়ে থাকে আপন মনে, মদির আলস্যে একটি গাঢ় তন্দ্রার আনন্দে সে যেন ডুবে যাচ্ছে, বসন্তের বাতাসে মন ছুটেছে পাখা মেলে। পিয়ানোতে বসে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় মীনা, তার সেই ধৈর্য—অন্যের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে—একই সুর একই গৎ বারে বারে বাজিয়ে যায়। অন্য লোক ক্লান্ত হয় বটে কিন্তু পুনরুক্তির গাঢ়তায় একটা রক্তাক্ত আবেগ মীনাকে অভিভূত করে ফেলে। যখন সুম্যান-এর বাজনা শোনে তখন চোখে জল আসে। সংসারে সমস্ত প্রাণীর উপর তার অবর্ণনীয় মায়া পড়ে। সবাইকে ভালো লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। ক্রিসতফেরও তাই। রাস্তায় গরিব দেখলে দুজনেই লুকিয়ে পয়সা দেয়—একে অন্যের সঙ্গে সেই করুণানিষিক্ত দৃষ্টিটির বিনিময় করে। তাদের এই করুণায়ও তারা খুশি।

সত্যি কথা বলতে কি, এই দয়ার ঝোঁকটা আচম্বিতে আসে। হঠাৎ মীনা আবিষ্কার করে বসে বুড়ি ফ্রিদা-র এই দীন জীবনটি কী করুণ। তার মার ছেলেবেলা থেকে চাকরানি এই ফ্রিদা। যেই এ ভাবটি পেয়ে বসল একবার, অমনি ছুটে গিয়ে মীনা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। রান্নাঘরে বসে ফ্রিদা জামা সেলাই করছিল, সে তো আকাশ থেকে পড়ল! কিন্তু তাই বলে কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘণ্টার আওয়াজ শুনে চটপট কেন আসেনি ফ্রিদ্রা, এই কারণে তাকে ধমকাতে একটুও কসুর করল না। আর এদিকে জাঁ-ক্রিসতফ, সমস্ত বিশ্বের প্রতি যে প্রেমে ভরপুর, একটি সামান্য পোকাকে যে পায়ে মাড়াবে না, সে তার নিজের পরিবারের প্রতিই উদাসীন। বরং বাইরের লোকের প্রতি তার যতটা প্রীতি, ঠিক সেই অনুপাতেই বাড়ির লোকের প্রতি তার বিরাগ আর বিরক্তি। তাদের কথা সে চিন্তাও করতে চায় না। কাটা-কাটা কথা কয় সবার সঙ্গে, মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। মীনা আর ক্রিসতফের মধ্যে এই যে করুণার উচ্ছ্বাস এ শুধু তাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহোচ্ছ্বাসেরই রূপান্তর। আসলে তারা দুজনে যার-যার মতই

অহংমনা—মনে শুধু এক ধ্যান, এক ধারণা—সমস্ত কিছুই সেই রঙে রঙ-করা।

মীনার মুখখানিতেই ক্রিসতফের সমস্ত ভুবন পরিপূর্ণ হয়ে আছে। দূরে তার ফ্রকের প্রান্তটুকু দেখলেই বুকের রক্ত চল্‌কে পড়ে। থিয়েটরে বসে যখন শুনতে পায় ওদের বক্সের দরজাটা খুলে গেল, কিংবা ফ্রাউ কেরিশের নাম কেউ ঘোষণা করলে অনুচ্চস্বরে, তখন দেখতে না পেলেও বেজে ওঠে সমস্ত দেহ। কানে ভেসে আসে সেই ঠাট্টা-মাখা মিহি গলার ঝাঁজটুকু। শুধু মীনার একটু উপস্থিতির চেতনাতেই সারা দেহে রক্ত ছুটোছুটি করতে থাকে, মনে হয় কী সব অজানা দস্যু হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে বসেছে! তাকে এখুনি বুঝি পরাস্ত করে ফেলবে।

কত রকম ছলাকলাই জানে সেই দুরন্ত জার্মান মেয়ে। একতাল ময়দার মধ্যে তার আংটি লুকিয়ে রাখে আর ক্রিসতফকে বলে দাঁত দিয়ে তা বের করে আনো, কিন্তু খবরদার নাক যেন শাদা না হয়! একটা বিস্কুট গর্ত করে তার ভেতর একটা সুতো চালিয়ে দেয়, সুতোর এক প্রান্ত সে দাঁত দিয়ে টেনে ধরে, আরেক প্রান্ত ক্রিসতফকে অমনি দাঁত দিয়ে টেনে ধরতে বলে। সুতোটাকে দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে এগিয়ে এসো, কে আগে বিস্কুটের নাগাল পায়। তাদের মুখ দুটো ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে, মুখের উপর একে অন্যের নিশ্বাস লাগে, কোথায় বিস্কুট, এর ঠোঁট ওর ঠোঁটে এসে মেশে, আর অমনি যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে জোর করে হেসে ওঠে দুটিতে। হাসে বটে কিন্তু হাত আর পায়ের তালু ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বরফের মত ঠাণ্ডা। জাঁ-ক্রিসতফের ইচ্ছে হয় দংশন করে, আহত করে, কিন্তু কি ভেবে পিছিয়ে পড়ে এক ঝটকায় —আর তাতে আবার মীনা আরেক পশলা হাসির বৃষ্টি ঝরায়। আবার দূরে-দূরে সরে পড়ে দুজনে, যেন কেউ কাউকে চেনে না এমনি

উপেক্ষার ভান করে, অথচ চুরি করে দুষ্টু চোখে তাকায় এ ওর চোখের দিকে।

এই সব দুষ্টুমি-ভরা খেলাগুলো বিষম আকর্ষণের জিনিস। খেলতেও চায়, আবার খেলতে এসে চায় পিছিয়ে যেতে। জাঁ-ক্রিসতফের তো বেশ ভয়-ভয় করে, তারই জন্যে ফ্রাউ কেরিশের বা আর কারুর কাঠখোট্টা সান্নিধ্যে সে শান্তি পায়। আর কেউ উপস্থিত থাকলে তাদের এই প্রচ্ছন্ন প্রেমের পরিচ্ছন্নতাটুকু নষ্ট হবে না কিছুতেই, বরং তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কাঠিন্যে তাদের ভালোবাসাটি আরো গভীর আরো নিবিড় ভাবে আস্বাদনীয় হবে। সব কিছুরই মূল্য বেড়ে গেছে অকস্মাৎ— একটি সামান্য কথা, ঠোঁটের একটি ভঙ্গুর ভঙ্গি, একটি বা অকারণ চাহনি —এই যেন যথেষ্ট, তাদের সাধারণ সামান্য জীবনকে অমূল্য সম্পদে শ্রীমন্ত করে তুলতে। আর কিছুই চাই না, শুধু এই একটু হাসা আর চেয়ে থাকা, এই একটু কথা বলা বা ঠোঁট ফুলোনো। তাদের স্বাদগন্ধহীন জীবনের বিবর্ণতার আকাশে এ কী সুন্দর সূর্যোদয়! এ সূর্যকে, এ আনন্দময় রৌদ্রকে তারা ছাড়া আর কেউই দেখতে পায় না, তাদের গোপন রহস্যে একান্ত করে তারাই শুধু আত্মহারা। তাদের কথাবার্তা ড্রয়িং-রুমের তুচ্ছ সংলাপের বাইরে আর কী! তবু তারা শুনতে পায় সেই কথাবার্তাই অফুরন্ত একটি ভালোবাসার গান। খোলা বই যেমন পড়া যায় তেমনি যেন তারা পড়ে নিতে পারে কার মুখে কখন কী ছায়া খেলে যাচ্ছে, গলার স্বরে কখন বাজছে কী মনের সুরটি! চোখ মেলে রাখারও তাদের দরকার হয় না। চোখ বুজেই তারা একে অন্যের হৃদয়ের ঢেউ শুনতে পারে, শুনতে পারে নিজের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। জীবনকে বিশ্বাস করতে সাধ হয়, বিশ্বাস আসে আনন্দের অনিবার্যতায়। নিজেদের পর্যন্ত মনে হয় বিশ্বাসের উপযোগী বলে। আশা মনে হয় অন্তহীন।

তারা ভালোবাসেনি শুধু, তারা ভালোবাসা পেয়েছে। তাদের সুখ শুধু একটি শিখা, তাতে ছায়া নেই ধোঁয়া নেই। যে সুখে সন্দেহ নেই, ভাবনা নেই ভবিষ্যতের। বসন্তের দিন কটিতে কী চমৎকার প্রসন্নতা! এক বিন্দু মেঘ নেই আকাশে। এমন একটি সজীব প্রত্যয় যা কখনোই কোনো কিছু মলিন করতে পারবে না। এত অজস্র আনন্দ যা কখনোই কোনো কিছু নিঃশেষ করতে পারবে না। তারা কি সত্যি বেঁচে আছে? না কি জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে তারা? স্বপ্নই দেখছে নিশ্চয়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের এই স্বপ্নের নিশ্চয়ই কোনো মিল নেই। তবু কোথা থেকে আসে সেই ক্ষণিক ইন্দ্রজাল, জীবনকে স্বপ্নময় করে তোলে। জীবন স্বপ্নময় ছাড়া আর কী! প্রেমের স্পর্শে সমস্ত জীবন স্বপ্নে গলে-গলে পড়ছে।

বেশি দিন গেল না, ফ্রাউ কেরিশ ধরতে পারলেন তাদের এই প্রেমের লুকোচুরি খেলা। তারা ভাবছে খুব সূক্ষ্ম ভাবে বুঝি খেলা চলছে, কিন্তু আসলে তা নয়। গোড়াগুড়ি থেকেই মীনার সন্দেহ হয়েছিল, যেদিন তাদের কথা বলার মাঝখানে মা হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। মনে সেদিনই খটকা লেগেছিল। সেদিন ঠিক দূরে-দূরে বসে কথা বলছিল না, বরং দাঁড়িয়েছিল ঘেঁষাঘেঁষি করে, যতটা কাছাকাছি হতে পারে ততটা। খুট করে দরজার আওয়াজ শুনতেই চকিতে সরে গিয়েছিল তারা দুভাগ হয়ে, কিন্তু ঘাবড়ানোর ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দেখেও কিছু দেখেননি এমনি ভাব করেছিলেন ফ্রাউ কেরিশ। মীনা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বরং মার সঙ্গে একটা ঝগড়া করার সুযোগ পেলে ভালো হত। সেটা মনে হত আরো বেশি রোমান্টিক।

তেমন সুযোগ যাতে সে না পায় এই শুধু সতর্ক দৃষ্টি ফ্রাউ কেরিশের।

এই ব্যাপারে তিনি চিন্তিত হবেন বা এই নিয়ে কিছু মন্তব্য করবেন এমন বোকা তিনি নন। কিন্তু মীনার সামনে ক্রিসতফ সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে কথা বলার একটা মারাত্মক অভ্যাস তিনি হঠাৎ আয়ত্ত করে বসলেন। নির্মম হয়ে উঠলেন ক্রিসতফের অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরে। অল্প কটি কথায় ক্ষণে-ক্ষণে ভূমিসাৎ করতে লাগলেন তাকে। ইচ্ছা করে বা চেষ্টা করে এটা তিনি করছেন না। এটা তিনি করছেন নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ঝোঁকে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বাসহন্ত্রী মেয়েরা যেমন করে থাকে সচরাচর। এ সবে বাধা দিতে যাওয়া মীনার পক্ষে অর্থহীন। তাকে মানায় না মুখ-ভার। প্রতিবাদে রূঢ় হবারও তার কিছু নেই, কেননা মা যা বলছেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মনের যেখানটাতে মমতার একটি ক্ষমতা পোষণ করছে মীনা, মা বারে-বারেই তাইতেই খোঁচা মারছেন। জঁা-ক্রিসতফের বুট জুতো কী ভারী আর প্রকাণ্ড, কী কুৎসিত তার পোষাক-আশাক,—তার উপরে ব্রাশ-না-করা টুপি, তার কথায় প্রাদেশিক টান, তার নমস্কার করার গ্রাম্যতা, তার চেঁচিয়ে কথা বলার ইতরামো—যা-যা শুনলে মনে-মনে দগ্ধ হবে মীনা, কিছুই তাদের ভুলছেন না ফ্রাউ কেরিশ। এমনি কথা বলার মাঝে মাঝে এ সব সমালোচনার খোঁচা ছড়িয়ে থাকে, গায়ে লাগেনা। কিন্তু এ যেন তৈরি-করা একটা ঢালা বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে অসহ্য হয়ে মীনা যখন তার উত্তর দেবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন ফ্রাউ কেরিশ আলগোছে বিষয়ান্তরে চলে যান। কিন্তু তাঁর ঘা মর্মে গিয়ে বসেছে, সেই জ্বালায় পুড়ে মরছে মীনা।

জঁা-ক্রিসতফের দিকে কেমন যেন একটু অকরুণ চোখে তাকায়। সে-চাউনিটা যেন গায়ে খোঁচা মারে। জিগ্গেস করে ক্রিসতফ :

"ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন?"

"কিছু নয়, এমনি।"

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, যখন ক্রিসতফের মেজাজ প্রফুল্ল দেখা যাচ্ছে, তখন হঠাৎ তাকে ঝাঁজিয়ে ধমকে ওঠে মীনা—কেন অমন উঁচু গলায় হাসছ? লজ্জা পায় ক্রিসতফ, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি মীনার সঙ্গে হাসতে গিয়ে অমন করে গলা ছাড়া যাবে না। মুহূর্তে সমস্ত প্রফুল্লতার উপরে কে কালি ঢেলে দিলে। হয়তো এক সময় নিজের মনে স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাচ্ছে ক্রিসতফ, তাকে থামিয়ে দিয়ে মীনা হঠাৎ তার পোশাক সম্বন্ধে একটা কদর্য টিপ্পনি কেটে বসল—হয়তো বা তার কথার মধ্যে শব্দের ছটার জন্যে। তখন আর কথা বলার অভিলাষ থাকে না, স্রোতের মত তরতরে মেজাজ সহসা পঙ্কিল হয়ে ওঠে। তখন এই বুঝিয়েই মনকে সান্ত্বনা দেয়, তার সমস্ত ব্যাপারে, তার ভাষায়, পোশাকে, তার চাল-চলনে সমস্ত কিছুতে মীনা সর্বব্যাপী আগ্রহ নিচ্ছে। মীনাও এমনি করে বোঝায় নিজেকে, ক্রিসতফকে দস্তুরমত দুরস্ত করে তোলা চাই। নম্র হয়ে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে ক্রিসতফ। কিন্তু কিছুতেই মীনার মনের মতন হয় না। কিছুতেই পারে না সে সেই চকচকে জৌলুস আনতে।

কিন্তু পরোক্ষে ধীরে-ধীরে কী পরিবর্তন আসছে মীনার মধ্যে তা ক্রিসতফ দেখতে পাচ্ছে না—মীনাও নয়! ইস্টার এসে গেল। মীনা তার মায়ের সঙ্গে হ্বাইমারে বেড়াতে যাচ্ছে।

বিচ্ছেদের সপ্তাহখানেক আগে আবার তারা তাদের সেই প্রথম দিনের ঘনিষ্ঠতার এলেকায় চলে এল। পা টিপে-টিপে কখন যে চলে এল গণ্ডির বাইরে কেউ টের পেল না। মীনা স্নেহে যেন আরো দ্রব আরো আর্দ্র হয়ে এসেছে। যেন আরো অভিনব। পার্কে অনেকটা বেড়াবার জন্যে বেরিয়েছে তারা—প্রায় পথ ভুলিয়ে ক্রিসতফকে মীনা

নিয়ে গেল একটা ঝোপের পাশে। ছোট্ট একটা গন্ধ-মাখা থলে ক্রিসতফের ঘাড়ের উপর রাখল আলগোছে—সেই থলের মধ্যে মীনার ক'টি চুল। আবার তারা সেই শাশ্বত প্রতিজ্ঞা ক'টি আবৃত্তি করলে : একদিন অন্তর একদিন পরস্পরকে চিঠি লিখবে তারা, মাথার কিরে কাটলে। আকাশ থেকে নির্বাচন করলে একটা তারা, ঠিক করলে প্রতি সন্ধ্যেয় ঠিক একই সময়ই তারাটির দিকে তারা চেয়ে থাকবে।

এল সেই শেষ দিন। রাতে প্রায় দশ-দশবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে ক্রিসতফ : "কাল এমন সময় ও কোথায় ?" এখন ভাবছে : "সেই শেষ দিন আজ। ভোরবেলাটিতে ও এখানে আছে, সন্ধে হলেই আর ও নেই।" আটটা বাজবার আগেই ও-বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল ক্রিসতফ। মীনা তখনো ওঠেনি ঘুম থেকে। পার্কে বেড়াতে লাগল আপন মনে। পারল না বেড়াতে। ফিরে এল। ঘরের প্যাসেজগুলো মালে-পত্রে বোঝাই, ঘরের এক কোণে বসে পড়ল। শুনতে লাগল পায়ের শব্দ, দরজা খোলার শব্দ। শুনে পরখ করতে লাগল কার পায়ের শব্দ কোনটা। ফ্রাউ কেরিশ চলে গেল তার সামনে দিয়ে, একটু হাসল। থামল না, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ভরা ছোট্ট একটু অভিবাদন করলে। শেষকালে মীনা এল—মুখখানি ম্লান. চোখের পাতা দুটি ফোলা-ফোলা। ক্রিসতফের মতনই রাত ভরে ঘুমোয়নি সে এক ফোঁটা। চাকরদের ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হুকুম দিয়ে ফিরছে, হঠাৎ এক সময় জাঁ-ক্রিসতফের দিকে নিজের হাত-খানি বাড়িয়ে ধরল, আবার হঠাৎ কথা সুরু করল ফ্রিদার সঙ্গে। ফ্রাউ কেরিশ এসে পড়ল সেখানে। একটা টুপির বাক্স নিয়ে কথা কাটাকাটি সুরু হল মায়ে-মেয়েতে। ক্রিসতফের দিকে মীনার আর দৃষ্টি নেই—পিয়ানোর কাছে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিসতফ, বিস্মৃত, নির্বাসিত। মার সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেল মীনা, আবার ফিরে এল ; দরজার

কাছ থেকে মাকে আবার ডাকলে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলে। এখন তারা সম্পূর্ণ একা। মীনা ছুটে এল ক্রিসতফের কাছে, নিজের হাতের মধ্যে ওর একখানা হাত তুলে নিল, পাশের দরজা দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ছোট্ট কুঠুরিতে। সে ঘরের জানলার শার্সি আঁটা। তারপর নিজের মুখখানা ধীরে ধীরে ক্রিসতফের মুখের কাছে তুলে ধরল—তারপর প্রবল প্রাচুর্যে ক্রিসতফকে চুমু খেল।

অশ্রুভরা চোখে বললে, "বলো বলো তুমি আমাকে চিরদিন ভালোবাসবে?"

নীরবে কাঁদল দুজনে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সেই ফোঁপানিকে চেপে রাখতে, যাতে আর কেউ না শুনতে পায়। কার পায়ের শব্দ কাছাকাছি হতেই দুজনে সরে গেল বিচ্যুত হয়ে। চোখ মুছল মীনা, আবার চাকর-বাকরদের নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখাতে লাগল, কিন্তু গলার স্বরটি ভারাতুর।

রুমালটি এক সময়ে ফেলে দিয়েছে মীনা, ক্ষিপ্র হাতে তাই কুড়িয়ে নিল ক্রিসতফ। তার সেই ছোট্ট নোংরা রুমাল, চোখের জলে ভেজা, কোঁচকানো।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে স্টেশনে গেল ক্রিসতফ। মুখোমুখি বসেছে মীনা আর সে, কিন্তু একে-অন্যের দিকে তাকাতে-পারছে না, পাছে ফেটে পড়ে কান্নায়। হাতের মধ্যে হাত চলে গিয়েছে অলক্ষ্যে। সারাক্ষণ ধরে রইল, যতক্ষণ না ব্যথা করে উঠল। অদ্ভুত মজা পাচ্ছেন এমনি ভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন ফ্রাউ কেরিশ, কিন্তু মুখে এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব যেন কিছুই লক্ষ্য করছেন না। এল সেই নির্ধারিত সময়। ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিসতফ, ট্রেন ছেড়ে দিলে। ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে সেও ছুটতে লাগল—জানে না কোথায়

কতদূর যাবে। কুলিদের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, সেদিকে দৃষ্টি নেই—তার দৃষ্টিটি শুধু মীনার চোখের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু চলে গেল ট্রেন, আর দেখা গেল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিয়ে গেল দৃষ্টি থেকে, সমানে ছুটল ক্রিসতফ। তারপর থামল এক সময়, হাঁপাতে লাগল। চারদিকে চাইল—সব বাজে লোকের জনতা—সমস্ত কিছুই যেন অনর্থক। বাড়ি ফিরে গেল—ভাগ্যিস কেউ নেই এখন বাড়িতে—সারা সকালটা বসে বসে সে শান্তিতে কাঁদলে।

জীবনে প্রথম এই জানল ক্রিসতফ কাকে বলে বিচ্ছেদের বেদনা—ভালোবাসার অনুষঙ্গ কী দুঃসহ এই দাবদাহ! সমস্ত পৃথিবী এখন শূন্য, হৃদয় এখন রিক্ত—সমস্ত কিছু এখন অর্থহীন। কে যেন শক্ত মুঠিতে প্রাণটাকে চেপে ধরেছে, নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না—মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা হচ্ছে। জীবনধারণ করাই অসম্ভব—যখন চারপাশেই তোমার প্রিয়তমার সঙ্গস্পর্শের চিহ্ন রয়েছে বিকীর্ণ হয়ে। যখন চারপাশের ছায়া থেকে গড়ে উঠছে তার সেই সোনার প্রতিমা। যখন এই পরিবেশের মধ্যেই খানিক আগে তোমরা দুটিতে বিচরণ করেছ। সেই পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে নিশ্বাস ফেলবে কি করে? কোথায় তোমার সেই জীবন্ত সুখ, তোমার জলন্ত সুখ! মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট গহ্বর তোমার পায়ের নিচে হাঁ করে আছে, তুমি যেন ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছ। মাথা ঘুরে যাচ্ছে তোমার—এই তুমি পড়ে গেলে! মনে হচ্ছে একেই বলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। হ্যাঁ, বিচ্ছেদই সেই মৃত্যুর মুখ। তোমার প্রাণের যে প্রিয়তমা সে চলে গেল তোমার হাতের কাছ দিয়ে—জীবন মুছে গেল মুহূর্তে—শুধু একটা কালো গহ্বর পড়ে রইল। পড়ে রইল একটা নিষ্প্রাণ মিথ্যা, সীমাহীন শূন্য!

যন্ত্রণায় আরো সে ভুগুক—তারই জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেইসব স্নেহসিক্ত জায়গাগুলো, যেখানে একসঙ্গে কেটেছে কিছুক্ষণ। বাগানের চাবি ক্রাউ কেরিশ তাকে দিয়ে গেছেন দয়া করে, যাতে মাঝে-মাঝে সে একটু তদারক করতে পারে। ওদের বিদায়ের দিনটিতেই সে গেল—যাতে সে একটু কাঁদতে পারে সেখানে। মনে হল যে সত্যি চলে গিয়েছে তার কিছুটা যেন সে সেখানে কুড়িয়ে পাবে। কিছু অংশ কোথায়, পেয়ে গেল যেন অনেকাংশ। সমস্ত মাঠময় তার মূর্তিটি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাগানের রাস্তার প্রতিটি আনাচে-কানাচে যেন তার প্রসন্ন মুখটি নিখুঁত করে আঁকা। জানে সে এখানে আবির্ভূত হবে না সশরীরে—তবু কে জানে কোথায় কী ঘটে যাবে ইন্দ্রজাল, এমনি অসম্ভব আশায় নিজেকে সে ক্ষতবিক্ষত করে। শুধু বাগানের পথ ধরেই সে হাঁটে না, সে প্রেমের স্মৃতিপথে ঘুরে বেড়ায়। সেই আঁকাবাঁকা নিরিবিলি রাস্তাটি, সেই ফুল-ঝরানো সবুজ গালচে, সেই ঝোপের পাশে বসবার জায়গাটি। "এক সপ্তাহ আগে···তিন দিন আগে···মোটে গতকাল—গতকাল ও এখানে ছিল···কাল কেন? আজ। আজ সকালবেলাটিতে···" দুঃখের সঙ্গে মিশল এখন রাগ, কেন সে অমূল্য সময় কত অকারণে অপব্যয় করেছে! কতগুলি মিনিট, কতগুলি ঘণ্টা—তাকে দেখেছে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে তাকে আঘ্রাণ করেছে, ক্ষুধা মিটিয়েছে তৃষ্ণার্ত চক্ষুর, উপবাসী শ্রবণের। পরিধিহীন অবধিহীন আনন্দে সাঁতার কেটেছে। কিন্তু হায় কিছুই হয়তো উপভোগ করেনি, আস্বাদন করেনি। সমস্ত বুঝি তার বৃথায় বয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি মুহূর্তের কণায়-কণায় যতটুকু মধু সঞ্চিত ছিল সবটুকুই যেন সে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু এখন?···এখন আর সেই সময় কই? অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে তার। এ ক্ষতির আর হিসেব হয় না।

বাড়ি ফিরে গেল ক্রিসতফ। সমস্ত পরিবার তার কাছে ঘৃণার্হ মনে হল। ওদের মুখ যেন সে সহ্য করতে পারে না, ওদের ভঙ্গি, ওদের মূর্খ কথাবার্তা। কাল যেমন বলেছে, পরশু যেমন বলেছে—চিরকাল যা বলেছে, সেই কুৎসিত পুনরাবৃত্তি। একই ভাবে জীবন কাটিয়ে চলেছে তারা—জীবনের এমন একটা দুঃখ-দুর্ভাগ্যের খবরের তারা ধার ধারে না। আর. এদেরই মত বাকি সমস্ত শহর, এদেরই মত বুদ্ধিমান। প্রতিদিনের মতই হাসাহাসি করছে, প্রতিদিনের মতই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গোলমাল করে চলেছে। সেই প্রতিদিনের মতই ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আকাশে রোদ উঠেছে। সমস্ত কিছুর প্রতি ঘৃণায় বিষ হয়ে আছে মন—চার দিকের এই জাগ্রত অহংমন্যতার ভাবটা তাকে পিষে ফেলছে। অহংমন্য নিজেই বা সে কম কিসে! কিছুরই তার কাছে মূল্য নেই। কারুর প্রতি তার দয়া নেই এক বিন্দু। কাউকে সে ভালবাসে না। এ অহংমন্যতা ছাড়া আর কি!

শোকাকুল ক'টা দিন কাটল ক্রিসতফের। কাজ দিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখল, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে কাজের প্রতি তার আর মোহ নেই।

একদিন বাড়িতে রাত্রে বসে আছে, এমন সময় পিওন এসে তার নামের একটা চিঠি দিয়ে গেল। হাতের লেখাটি দেখবার আগেই বুঝতে পেরেছে ক্রিসতফ, কে লিখেছে। আর সবাই খাচ্ছে তার সঙ্গে—চার-জোড়া চোখ একসঙ্গে তার মুখের দিকে ধাবিত হল—ঐ চোখগুলিতে নগ্ন ও নির্লজ্জ কৌতূহল। ভাবখানা, চিঠিটা এখুনি পড়ে ফেলুক, একটু নতুন ধরণের কথাবার্তায় তাদের এই দৈনন্দিন একঘেয়েমির কিছু লাঘব হোক। ক্রিসতফের প্লেটের পাশেই চিঠিটা পড়ে রইল, খোলবার যেন কিছু তাড়া নেই; ভাবখানা, কী আছে ঐ চিঠিতে সমস্ত আমার মুখস্ত। কিন্তু তার ভাইরা এ ভঙ্গিটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়—কেবলই

বারে-বারে উঁকি মারছে চিঠির দিকে। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ আবার এক যন্ত্রণা।

তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল ক্রিসতফ। তার সেই বিমর্ষ স্তিমিত হৃদয় এমন লাফালাফি সুরু করে দিল যে খোলবার ব্যস্ততায় চিঠিটা সে প্রায় ছিঁড়েই ফেলল। কী আছে চিঠিতে ভাবতেও বুকটা কাঁপছে, কিন্তু প্রথম ক'টি লাইন পড়তেই বুক ভরে গেল আনন্দে।

ক'টি অনির্বচনীয় স্নেহের শব্দ। গোপনে চুরি করে এই চিঠি লিখছে মীনা। সম্বোধন করেছে 'প্রিয় ক্রিসৎলিন' বলে। লিখেছে, কত কেঁদেছে তার জন্যে, রোজ সন্ধ্যায় তাকিয়েছে তারাটির দিকে। ফ্রাঙ্কফার্টে গিয়েছিল, চমৎকার শহর, কত আশ্চর্য দোকান, কিন্তু সারাক্ষণ তার কথা ভেবেছে বলে কিছুই দেখেনি। চিরকাল যে সে ভালোবাসবে এই কথাটি মনে করিয়ে দিয়েছে, আর যতদিন মীনা বাইরে থাকে ততদিন আর কারু সঙ্গে যেন সে না মেশে, সারাক্ষণ যেন মীনার কথাই ভাবে। যেন খুব ভাল করে কাজ করে যাতে সে যশস্বী হতে পারে, তার যশ হলে মীনারও যশ। চিঠি শেষ করবার আগে লিখেছে, চলে আসবার দিন সকালে যে ছোটঘরটিতে তাদের দেখা হয়েছিল, যেভাবে তারা পরস্পরের থেকে বিদায় নিয়েছিল, তা যেন তার মনে থাকে। চিরকালই মীনা তার চিন্তায় বাস করবে আর চিরকালই বিদায় নেবে অমনি করে। চিঠির শেষে ইতিতে সই করেছে—"তোমার চিরদিনের—" শেষে আবার একটু যোগ করে দিয়েছে পুনশ্চ: কুচ্ছিত ফেল্ট হ্যাটটি ছেড়ে সে যেন একটা স্ট্র-হেট কেনে—সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকই পরে আজকাল স্ট্র-হ্যাট—বেশ একটু মোটা মজবুত টুপি, আর তার ধার ঘেঁষে নীল ফিতে।

বিষয়টা বুঝতে গিয়ে চার-চারবার পড়ল ক্রিসতফ। এত সে অভিভূত হয়ে পড়ল যে অনুভবটার স্বাদ সুখ কিনা বুঝতে পেল না। এত ক্লান্ত লাগতে লাগল নিজেকে, শুয়ে পড়ল. শুয়ে শুয়ে বার দুই পড়ল আবার চিঠিটা, তারপর চুমোয়-চুমোয় তাকে ভরে দিলে। বালিশের নিচে রাখলে, আর বারে-বারে হাত ঢুকিয়ে দেখতে লাগল চিঠিটা সত্যিই আছে নিটুট হয়ে। খুব একটা শান্তি আর স্বাস্থ্যের প্রসন্নতা তার সমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ করে দিলে। সমস্ত রাত ভরে ঘুমুল আনন্দে।

জীবনটা একটু-একটু করে সহনীয় মনে হল। মীনার সম্বন্ধে তার ধারণা ক্রমশই উঁচু হতে লাগল। চিঠিতে ক্রিসতফ তার প্রশ্নের জবাব দেয় বটে কিন্তু মন খুলে প্রশ্ন করতে পারে না। নিজের মনটিকে আবৃত করে রাখে, সে যে কী ভীষণ কষ্ট তা বোধ হয় অন্তর্যামী জানেন। মামুলি সামাজিক শিষ্টাচারের নিচে লুকিয়ে রাখে তার উদ্বেল ভালোবাসা —হায়, শিষ্টাচারটুকুও বোধহয় জানানো হয় না শিষ্টভাষে।

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে মীনার উত্তরের প্রত্যাশায় দিন কাটাতে লাগল। কী করে ধৈর্য শিখবে তারই চেষ্টায় দীর্ঘ রাস্তা সুরু করল হাঁটতে, দীর্ঘ সময় মুখে বই গুঁজে বসে রইল। কিন্তু যাই পড়ুক আর যতই হাঁটুক, সব সময়ে এক চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে আছে—সে শুধু মীনার চিন্তা। মীনা, মীনা—এই নামই সে মনে-মনে আবৃত্তি করে ফিরছে। মীনার পূজায় সে এত মশগুল যে যেখানে যাচ্ছে সেখানে লেসিং-এর বই নিয়ে যাচ্ছে যেহেতু লেসিং-এর বইয়ে মীনার নাম আছে। তারপর রোজ থিয়েটর থেকে ফেরবার সময় দীর্ঘ পথ ঘুরে সে সেই দোকানটার পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরে যার সাইন বোর্ডে ঐ দুটি অক্ষর লেখা আছে।

এ ভাবে সময় নষ্ট করছে বলে অনুতাপ করে ক্রিসতফ। মনে পড়ে মীনার কথা। মীনা বলেছে খুব করে খাটো, যাতে আমি বিখ্যাত হতে পারি। এই অনুরোধের সারল্যটুকু স্পর্শ করে ক্রিসতফকে—তার উপরে কতটা বিশ্বাস মীনার! তার সেই বিশ্বাসটি সম্মানিত করবার জন্যে ক্রিসতফ সংকল্প করল, সে একটা বই লিখবে, আর তা সে উৎসর্গ করবে মীনাকে। আর কোনো সময়েই সে এমনি সংকল্পে আরূঢ় হতে পারত না। যেই ভাবটা মনে এল অমনি ঝাঁক বেঁধে মনের আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল নানা রঙের নানা ধ্বনির সুরবিহঙ্গ। যেন একটা বদ্ধ আধারের মধ্যে বন্যার জল বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ছাড়া পেয়ে সমস্ত বাধা-বন্ধন ভেদ করে সে-জল এখন ছুটে চলেছে। এক সপ্তাহ ঘর থেকে বেরুল না ক্রিসতফ। তার ঘরের দরজার পাশে লুইসা তার খাবার রেখে যায়—মাকে পর্যন্ত সে ঢুকতে দেয় না।

কতগুলি সুরলিপি সে লিখে ফেলল। প্রথমটা একটা কবিতা, যৌবনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। শেষটা একটা প্রেমিকের ইয়ার্কি, জাঁ-ক্রিসতফের নিজের মনের উঁকিঝুঁকি। এ তরঙ্গটা দ্বিতীয় তরঙ্গে প্রতিহত হবার জন্যে। সেইখানে ক্রিসতফ একটি শুচিস্মিত শুভ্রকোমল আত্মার পরিকল্পনা করেছে—আর সেইটিই মীনার মানস মূর্তি। কেউ তা ধরতে পারবে না, মীনা তো নয়ই—কিন্তু নিজে যে উপলব্ধি করতে পারবে এতেই তার পুরস্কার। তার প্রেয়সীর সারভূত যে সত্তা সেইটিকে সে উদ্ঘাটিত করেছে। অনুভূতির এই মায়াটি কি অপরূপ—কি আনন্দকর। কোনো লেখাই যেন এত সহজে এত স্বচ্ছন্দে সমাধা হয়নি। বিচ্ছেদে যে প্রেম সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এ যেন তারই একটুখানি উদ্বৃত্তি। কিন্তু আবেগতপ্ত উচ্ছ্বাসই তো আর্ট নয়—আবেগকে সুন্দর স্বচ্ছ সংযত ও দৃঢ় একটি আকার দিতে হবে, আবেগের

উপর চাই সেই শাসন, সেই খর দৃষ্টি। সেই আর্ট তার মনে আনবে স্বাস্থ্য তার সমস্ত প্রবৃত্তি ও শক্তির মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য—প্রায় একটা শারীরিক আহ্লাদের মত। যে আহ্লাদ পৃথিবীর সমস্ত মহৎ স্রষ্টাই উপভোগ করেছেন জীবনে। যখন সে বসেছে এই সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তখন দুঃখ ও কামনার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেই তাদের প্রভু হয়ে বসেছে। যা কিছু তার আনন্দ আর দুঃখের কারণ সমস্তটাই যেন তার ইচ্ছার খেলা। সে ইচ্ছা করলেই সুখী, ইচ্ছা করলেই সে দরিদ্র। তার সমস্ত অস্তিত্ব তার ইচ্ছা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ সব মুহূর্ত বড় ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টির সেই উন্মাদনাটুকু কেটে গেলেই আবার তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বাস্তবতার লৌহশৃঙ্খল। যেমন কঠিন তেমনি দুঃখদায়ক।

নিজের কাজ নিয়ে যখন ব্যস্ত তখন মীনার থেকে তার সেই বিদায় নেওয়ার অপূর্ব ক্ষণটির কথাও ভুলে থাকে। আর তখন তাদের বিচ্ছেদ কোথায়! তখন তারা একসঙ্গেই বাস করছে দুজনে। মীনা তখন মীনাতে নেই, ক্রিসতফের মধ্যে চলে এসেছে। কিন্তু কাজ যখন শেষ হয়, তখন আবার সে একলাটি হয়ে যায়। মনে হয় এত নিঃসঙ্গ সে জীবনে যেন কখনো আর ছিল না—নিজের কাজেই সে জীর্ণ, ক্লান্ত, পরাভূত। হঠাৎ মনে পড়ে পনেরো দিন হল সে চিঠি লিখেছে মীনাকে আর সে চিঠির এখনো উত্তর আসেনি।

আবার মীনাকে চিঠি লিখল ক্রিসতফ। কিন্তু প্রথম চিঠিতে যতটা সংযম আনতে পেরেছিল, এ-চিঠিতে তা আনা গেল না। ঠাট্টা করে মীনাকে প্রথমে একটু তিরস্কার করলে। কেন সে তাকে ভুলে গিয়েছে? তার অলসতার জন্যে একটু খোঁটা দিলে, স্নেহ করে একটু বা খোঁচা মারলে। নিজের কাজের কথা বলতে গিয়ে এমন ধোঁয়াটেভাবে

লিখলে যাতে মীনার কৌতূহলের উদ্রেক হয়—এলে সে দেখতে পাবে, আর ভীষণ অবাক হয়ে যাবে। কি রকম টুপি কিনেছে এবার দিলে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা। আর কে-এক তার নতুন অভিভাবক জুটেছে তার কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে গিয়ে—বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা—কোথাও বাইরে যায়নি। যদি কোথাও নিমন্ত্রণ এসেছে, স্রেফ বলে দিয়েছে, শরীর খারাপ, যেতে পারব না। তার আদেশ কাঁটায়-কাঁটায় সে মেনে চলেছে। এই সম্পর্কে এ কথাটা অবিশ্যি সে লিখলে না, গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তার, আর সে-ঝগড়ার মূলেও ঐ মীনা। গ্র্যাণ্ড ডিউক রাজপ্রাসাদে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, মীনার আদেশের মর্যাদা দিতে উৎসাহের বাড়াবাড়িতে সে-নিমন্ত্রণও সে গ্রহণ করেনি। চেপে গেল সে-কথাটা—কোনো উদ্বেগ বা ঝগড়ার কথা বলে কাজ নেই। সমস্ত চিঠিটা বাঁধনহারা আনন্দের গান—ছোটখাটো কথায় আর স্তব্ধতায় ভরপুর। সেই সব ইঙ্গিত আর নিঃশব্দতার রহস্যপুরীর চাবিটি মীনার হাতে লুকোনো আছে। যেখানে সে সহজ বন্ধুতার কথাটি লিখেছে সেটা যে আসলে সুতীব্র প্রেমের সম্ভাষণ এ বুঝে নিতে মীনার নিশ্চয়ই দেরি হবে না।

চিঠি লিখে একটু যেন আরাম পেল ক্রিসতফ। চিঠির মাধ্যমে একটু যেন কথা বলে নিতে পারল মীনার সঙ্গে—আর সব চেয়ে আনন্দ এ চিঠি লিখলেই তাড়াতাড়ি মীনার উত্তর পেয়ে যাবে। ডাকের আশায় তিন দিন চুপচাপ প্রতীক্ষা করল ক্রিসতফ, কিন্তু চারদিনের দিনও যখন কোনো চিঠি এল না তখন জীবন আবার কঠিন হয়ে উঠল। কোনো কিছুতে আর যেন সে উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে না—শুধু ডাক আসবার আগে ঘণ্টাখানেকই যা সে একটু হৃৎস্পন্দন অনুভব করে। অধৈর্যে কাঁপে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী। আস্তে আস্তে কেমন কুসংস্কারে পেয়ে

বসল তাকে—উনুনের একটা শব্দে বা কারু কোনো একটা কথায় সে ইঙ্গিত খুঁজে ফিরতে লাগল—এ হলে বোধ হয় চিঠি আসবে। ডাকের আগের ঘণ্টাটা চলে গেলেই আবার সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আর কাজকর্ম নেই, নেই আর ঘুরে বেড়ানো। তার জীবনের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পরের দিনের ডাকের প্রতীক্ষা করা। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় পরের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকায়। কিন্তু সন্ধ্যা যখন চলে যায় সমস্ত দিনের আশা ধূলিসাৎ করে, তখন যে শরীরে-মনে একেবারে ভেঙে পড়ে—মনে হয় কাল পর্যন্ত অস্তিত্বের জের আর টেনে নেওয়া যাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকে টেবিলে—কথা কয় না, কিছু ভাবেও না, বিছানায়ও উঠে যাবার তার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছাশক্তির কোন এক ভগ্নাংশ হঠাৎ এক সময় তাকে ঠেলে টেনে নিয়ে যায় বিছানায়। শুয়ে শুয়ে মূর্খ যত সব স্বপ্ন দেখে, মনে হয় এ রাত্রির বুঝি আর শেষ নেই।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা একটা শারীরিক আর্তির চেহারা নিল, এনে দিল একটা মানসিক বিভীষিকা। সন্দেহ হতে লাগল হয় বাবা কিংবা ভাইয়েরা কেউ পিওনের থেকে চিঠি চেয়ে নিয়ে গাপ করেছে। বুকের মধ্যে যেন কে করাত চালাতে লাগল। মুহূর্তের জন্যেও মীনার বিশ্বস্ততায় তার সন্দেহ হল না। যদি তাকে সে চিঠি লিখে না থাকে, তার কারণ তার নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে, মরণাপন্ন অসুখ, কিংবা কে জানে, এত দিনে সে মরেই গিয়েছে কিনা। এই কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সে আরেকটা চিঠি লিখে বসল—তার তৃতীয় চিঠি। কয়েকটা হৃদয়বিদারক কান্না—তাতে বানানের দিকে লক্ষ্য নেই, নেই বা সংযম বা শালীনতার দিকে। ডাকের সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠাটা উলটে নিতেই চিঠিটা ধেবড়ে গেল কালিতে, খামে পর্যন্ত কালি

লাগল। লাগুক, কোনোদিকে সে ফিরেও তাকাবে না। এ-ডাক সে থোয়াতে পারে না কিছুতেই। ছুটে গিয়ে নিজে ডাক-বাক্সে ছুঁড়ে দিয়ে এল চিঠিটা। তারপর থেকে দিয়ে চলল ফের প্রতীক্ষার মহড়া। রাত্রে স্বপ্ন দেখল মীনার অসুখ করেছে, তাকে ডাকছে। চট করে উঠে পড়ল ক্রিসতফ। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মনে পড়ল কোথায় যাবে, কোথায় গেলে মীনার দেখা পাবে সে?

চারদিনের দিন মীনার চিঠি এল—আধ পৃষ্ঠাও নয়, ঠাণ্ডা আর শুষ্ক চিঠি। রসকসহীন চিঠি। মীনা ভেবে পাচ্ছে না এমন সব আজগুবি ভয় কি করে তাকে পেয়ে বসতে পারে। সে বেশ ভালো আছে, তার চিঠি লেখবার সময় নেই। দয়া করে সে যেন একটু শান্ত থাকে। আর অকারণে চিঠি লেখবারই বা কী দরকার!

যেন ক্রিসতফের মুখের উপর কে ঘুষি মারল। তবু মীনার আন্তরিকতায় তার সন্দেহ নেই। নিজেকেই সে দোষী ভাবলে। তার ঐ সব উদ্ধত অপদার্থ চিঠি পড়ে বিরক্ত হওয়াই তো উচিত। সে একটা আকাট গোমূর্খ—নিজের কপালে নিজেই সে ঘুষি মারতে লাগল। কিন্তু যতই নিজেকে সে সমালোচনা করুক, অন্তরে-অন্তরে বুঝতে পারছে, সে যেমন মীনাকে ভালোবাসে মীনা তাকে তেমনি ভালোবাসে না।

পররর্তী দিনগুলি কাটল ম্রিয়মান শোকাচ্ছন্নতায়। একটা শাদা শূন্যের মধ্যে। জীবনে যে একটিমাত্র আশীর্বাদ ছিল, যার জন্যে জীবন বহনীয় ছিল—সেই মীনার কাছে তার পত্র—অদৃশ্য হয়ে গেল। যন্ত্রের মত চলতে লাগল শরীর, জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা প্রতিটি ছত্র যেন মুখস্ত। এখন শুধু একমাত্র আকর্ষণ, শুতে যাবার আগে ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো। তার আর মীনার মধ্যে সময়ের যে দুর্ভেদ্য দেয়াল রয়েছে

দাঁড়িয়ে, তার থেকে একখানা ইঁট খসানো। আসবার নির্ধারিত দিনটিও গেল চলে। অন্তত এক সপ্তাহ আগে তাদের ফেরা উচিত ছিল। মীনা বলে গিয়েছিল কবে ও কখন সে আসবে তা তাকে আগেই জানিয়ে দেবে। কবে ও কখন আবার দেখা হবে মুহূর্তে-মুহূর্তে নানা রঙের জাল বুনেছে ক্রিসতফ—কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নেই রেখা নেই। কেন যে এত দেরি হচ্ছে তাই বা কে বলবে?

একদিন সন্ধে বেলা ফিশার এসে হাজির। ফিশার তাদের প্রতিবেশী, ঠাকুরদার বন্ধু—আসবাব-পত্রের ব্যবসা করে। খাওয়া দাওয়ার পর তামাক খেতে-খেতে মেলশিয়রের সঙ্গে গল্প করতে প্রায়ই আসে। পিওনের জন্যে বসে থেকে যন্ত্রণায় ক্লান্ত হয়ে উঠে যাচ্ছিল ক্রিসতফ, হঠাৎ একটা কথা কানে ঢুকতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফিশার বলছে, কাল ভোরে উঠেই তাকে কেরিশদের বাড়ি যেতে হবে। কাঠের পার্টিশনগুলো ঠিকমত খাটিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

"সে কি, ওরা ফিরে এসেছে নাকি?"

"বা, কবেই তো এসেছে। পশু—"

কানে আর কিছু গেল না ক্রিসতফের। ঘর ছেড়ে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। লুইসা তার পরিবর্তনটা দেখছে বটে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। এখন বেরিয়ে যেতে দেখে জিগগেস করলে ভয়ে-ভয়ে, "কোথা যাচ্ছিস?" একটাও আওয়াজ করল না ক্রিসতফ। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় এসেই ছুট দিল কেরিশদের বাড়ির দিকে। তখন রাত নটা! মা আর মেয়ে দুজনেই ড্রয়িং-রুমে বসে, তাকে দেখে একটুও আশ্চর্য হবার ভাব করল না। তারা দুজনেই তাকে শান্তভাবে 'শুভসন্ধ্যা' জানালে। মীনা যেন কি লিখছে ব্যস্ত হয়ে—টেবিলের উপর দিয়ে

ভদ্রতার অভ্যাসে হাত বাড়িয়ে দিলে—আবার হাত গুটিয়ে নিয়ে এসে নিজের লেখায় মন দিলে। লিখতে লিখতে জিগগেস করলে, খবর কি। ক্রিসতফ যেন তার এই অসৌজন্য মার্জনা করে, কিন্তু চিঠিটা এক্ষুনি শেষ করে না ফেললেই নয়। কি যেন তবু বলে যাচ্ছিল ক্রিসতফ, লেখায় চোখ রেখেও শোনবার ভান করছিল মীনা। পরে এক সময়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, তোমার মার খবর কি বলো? নিজের দুঃখের কথাই জানাবার জন্যে সে তৈরি হচ্ছিল, তার অনুপস্থিতিতে সে তার কী অসহনীয় কষ্ট—কিন্তু কথা মুখের কাছে টেনে আনতে না আনতেই বুঝতে পেল ওসব কথা শুনতে কারুর কোনো আগ্রহই নেই—মনে হল, ও কথা বললেই কানে কেমন যেন মিথ্যে শোনাবে!

চিঠি শেষ করে মীনা সেলাই নিয়ে বসল, বসল ক্রিসতফের থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে। বলতে লাগল তার দেশভ্রমণের কথা। কী চমৎকার দিন কেটেছে তার, ঘোড়ায় চড়েছে, গাঁ-ঘরে থেকেছে, মিশেছে আবার ফ্যাশানবেল সোসাইটির সঙ্গে। গল্প বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে মীনা, এবং এমন সব ঘটনা ও লোকের প্রসঙ্গে উত্তেজনা দেখাচ্ছে যা ক্রিসতফের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। ও-সব দৃশ্যের কথা মনে হতেই মা-মেয়ে হাসছে আপন মনে। ক্রিসতফ মনে করছে সে একজন বিদেশী, ভোজের আসরে অনিমন্ত্রিত। বুঝতে পাচ্ছে না কি ভাবে ও কতটা সে রস গ্রহণ করবে, তবু হাসছে এক অদ্ভুত হাসি। মীনার মুখ থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না—চোখে মিনতি ভরে রেখেছে—দয়া করে একটু আমার দিকে তাকাও, তোমার একটি দৃষ্টিকণা আমাকে ভিক্ষে দাও। শেষে একবার যখন সে সত্যি তাকাল—মার সঙ্গে বেশি গল্প করছে বলে মার দিকেই বেশি তাকাচ্ছে—তখন ক্রিসতফ অনুভব করল তার সে চাহনি তার কণ্ঠস্বরের মতই নিষ্প্রাণ।

মীনা কি তবে তার মাকে দেখে অমন সতর্ক হয়েছে নাকি ? না, কি আর কোনো কারণ আছে ? একবারটি একলা কি ওদের দেখা হতে পারে না ? কিন্তু ফ্রাউ কেরিশ একটুখানির জন্যেও উঠে যাচ্ছেন না। কথার মোড়টা নিজের বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে আনার চেষ্টা করল ক্রিসতফ—তার লেখার কথা, তার পরিকল্পনার কথা। ঝাপসা-ঝাপসা বুঝতে পারল, মীনা তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। যতই সে এড়িয়ে যেতে চায় ততই ক্রিসতফ নিজের বিষয়টাতে রঙ চড়ায়। বাধ্য হয়ে শুনতে হয় মীনাকে, কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন সব ভীতি বা বিস্ময়ের শব্দ করে যা স্থান বিশেষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তা না হলেও মনে হচ্ছে মীনা যেন উৎসাহে তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমনি সময় আবার যখন ক্ষীণ আশার সঞ্চার হচ্ছে রক্তে, মীনা কখন একটু হেসে ফেলেছে তার আগের সেই মনোরম হাসি, ক্রিসতফও হাসবে-হাসবে করছে, তখুনি মীনা তার হাত তুলে তার আড়ালে ছোট্ট একটি হাই তুলল। আচম্‌কা থেমে পড়ল ক্রিসতফ। মীনা বললে, ঘুম পাচ্ছে, বড় শ্রান্ত সে আজ। উঠে পড়ল ক্রিসতফ। ভাবল হয়তো ওরা এবার বলবে আরো একটু থেকে যেতে। কিন্তু কেউ কিছুই বললে না। বিদায় জানিয়েও একটু প্রতীক্ষা করল ক্রিসতফ, হয়তো বলবে, কালকে আবার এসো। কেউ কিছুই বললে না। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল না মীনা। শুধু একটু হাত বাড়িয়ে দিল—উদাসীন হাত শিথিল হয়ে খসে পড়ল ক্রিসতফের হাতে। ঘরের মধ্যখান থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল ক্রিসতফ।

মনে একটা আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরল। দু' মাস আগের মীনার, তার প্রেয়সী মীনার—কিছুই আর অবশিষ্ট নেই…কী ঘটেছে ? কী হয়েছে মীনার ? সরল কিশোর, সে পার্থিব পরিবর্তনের কথা কি জানে ! সহজ সাধারণ সত্য কথাটাই যে তার কাছে নিদারুণ হয়ে বাজবে।

তবু ঝাপসা-ঝাপসা কি যেন সে একটা আন্দাজ করে। তখুনি নিজেকে বোঝায়. না, মীনা যেমন-কে তেমনই আছে, শুধু তার যাওয়াটিই ঠিক হয়নি, সময়টি ঠিক বাছা হয়নি দেখা করবার। কাল আবার সে যাবে, আর যে করেই হোক, কথা কইবে মীনার সঙ্গে।

ঘুমুল না ক্রিসতফ। সমস্ত রাত ভরে একটার পর একটা ঘড়ির শব্দ শুনতে লাগল। ভোর হতেই ঘুরঘুর করতে লাগল কেরিশদের বাড়ির সামনে—গেট খোলা পেতেই ঢুকে পড়ল। মীনার সঙ্গে দেখা না হয়ে দেখা হল ফ্রাউ কেরিশের সঙ্গে। খুব ভোরে উঠে ফ্রাউ কেরিশ বারান্দায় ফুলের টবে জল দিচ্ছেন। অত ভোরে ক্রিসতফকে দেখে তিনি আঁৎকে উঠলেন।

"ও! তুমি?···যাক, এসে ভালোই করেছ। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। একটু দাঁড়াও।"

ভিতরে জলের ঝারি রেখে ফ্রাউ কেরিশ এগিয়ে এলেন। হাত শুকনো করে এসেছেন, আর মুখে এনেছেন একটি নিস্পৃহ হাসি। ক্রিসতফের মনে হচ্ছে ও হাসি সর্বনাশের সূচীপত্র।

"বাগানে এসো।" বললেন ফ্রাউ কেরিশ: "বাগানটাই বেশ নির্জন।"

এই বাগান এখনো তাদের সেই ভালোবাসার গন্ধে ভরে আছে। সেই বাগানেই ফ্রাউ কেরিশের পিছু-পিছু অগ্রসর হল ক্রিসতফ। কথা সুরু করবার তাড়া নেই, ছেলেটার অস্বস্তি যেন উপভোগ করছেন ফ্রাউ কেরিশ।

"এসো এখানে বসি।" বললেন ফ্রাউ কেরিশ।

এই সেই কাঠের বেঞ্চি যেখানে তারা বসেছিল একদিন—মীনা আর ক্রিসতফ। এইখানেই মীনা তার মুখখানি তুলে ধরেছিল ক্রিসতফের দিকে।

"আসলে কি ব্যাপার তা বোধ হয় তুমি জানো।" খুব গম্ভীর হয়ে তাকালেন ফ্রাউ কেরিশ। "আমার ধারণা এরকম ছিলনা তোমার সম্বন্ধে। আমি তোমাকে গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে বলেই মনে করেছিলাম। তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আমি বুঝিনি তুমি আমার সেই বিশ্বাস ভেঙে দেবে আর তা ভেঙে দেবে আমার মেয়েকে উপলক্ষ্য করে। তার ভার তোমার হাতে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেই বিশ্বাসের মান রাখা তোমার উচিত ছিল। মীনার মান, আমার মান, তোমার নিজের মান।"

কি রকম একটা বিদ্রূপ কথার ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারছে। এই ছেলেমানসী প্রেমের ব্যাপারকে ফ্রাউ কেরিশ যেন একটুও মূল্য দিচ্ছেন না—এই রকম একটা ভাব। কিন্তু সে সম্বন্ধে সচেতন নয় ক্রিসতফ। ফ্রাউ কেরিশের তিরস্কার তার মর্মস্থল পর্যন্ত বিদ্ধ করেছে। এ তিরস্কার যেন তার আজীবন দুর্ভাগ্যেরই অবিচ্ছেদ্য পরিচ্ছেদ।

"কিন্তু, আমি—আমি" তোতলামি সুরু করল ক্রিসতফ: "আমি আপনার বিশ্বাসের অপমান করিনি। একথা কখনো ভাববেন না—আমি মন্দ নই, অসৎ নই—আমি ফ্রলিন মীনাকে ভালোবাসি। সমস্ত জীবন দিয়ে, আত্মা দিয়ে ভালোবাসি। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।"

মৃদু-মৃদু হাসলেন ফ্রাউ কেরিশ।

সেই সদয় হাসিতে সূক্ষ্ম একটি ঘৃণা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। বললেন ফ্রাউ কেরিশ: "না, অসম্ভব। তোমাদের এটা একটা ছেলেমানসি মূর্খতা।"

"কেন? কেন?"

ফ্রাউ কেরিশের হাত ধরল ক্রিসতফ। তাঁর হাসিটির মাঝে হয়তো কোথাও রয়েছে একটি সস্নেহ সমর্থন।

তেমনি হাসলেন ফ্রাউ কেরিশ। বললেন, "কেননা—"

পিড়াপিড়ি করতে লাগল ক্রিসতফ। কথাগুলির মধ্যে কোনো অর্থ-মূল্য আরোপ না করেই বলতে লাগলেন ফ্রাউ কেরিশ—ক্রিসতফ গরিব, মীনার রুচি তার রুচির থেকে আলাদা। তাতে কিছুই আসে যায় না—প্রতিবাদ করল ক্রিসতফ—কিছুদিন পরে সেও বড়লোক হবে, যশস্বী হবে। কত মান-প্রতিপত্তি অর্জন করবে, কত অর্থ, যা কিছু মীনা কামনীয় মনে করে। সন্দেহ-কুটিল চোখে তাকালেন ফ্রাউ কেরিশ, ছেলেটার আত্ম-বিশ্বাসের বহর দেখে মজা লাগল তাঁর। শুধু নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। কিন্তু নিজের গোঁতে আঁকড়ে রইল ক্রিসতফ।

"না, ক্রিসতফ, না।" জোরের সঙ্গে বললেন ফ্রাউ কেরিশ: "তর্ক করে লাভ নেই। এ অসম্ভব। শুধু টাকার প্রশ্ন নয়। অনেক, অনেক প্রশ্ন। সামাজিক অবস্থা—"

কথাটা শেষ করবার দরকার হল না ফ্রাউ কেরিশের। ছোট তীব্র একটা ছুঁচ, ক্রিসতফের মেরুমজ্জা পর্যন্ত বিদ্ধ করল। তার চোখ খুলে গেল সহসা। বন্ধুতার হাসির অন্তরালে কী ব্যঙ্গ, সদয় দৃষ্টির গভীরে কী নিষ্ঠুরতা, এতক্ষণে বুঝতে পারল ক্রিসতফ। এই ভদ্রমহিলা যিনি তাকে ছেলের মত ভালোবাসেন, যার কত স্নেহ দিয়েছেন তাকে—বুঝতে পারল ক্রিসতফ কোথায়, কোনখানে তাঁর সঙ্গে তার ব্যবধান। তাঁর সমস্তটা স্নেহ অবজ্ঞার উপরে দাঁড়িয়ে—উপেক্ষার উপরে দাঁড়িয়ে। ম্লান হয়ে গেল ক্রিসতফ। আদরমিশ্রিত গলায় তেমনি কথা বলে যাচ্ছেন ফ্রাউ কেরিশ, কিন্তু তার স্বরে আর সেই ধ্বনির জাদু নেই—প্রত্যেকটি কথার নিচে এই মহীয়সী মহিলার মিথ্যাচরণের ছদ্মবেশ। একটি কথারও উত্তর দিতে পারল না ক্রিসতফ। চলে গেল। তাকে ঘিরে যেন ঘুরে গেল সমস্ত জগৎ।

ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় সে টান হয়ে পড়ল—জাগ্রত রাগ আর আহত অভিমানকে সে ছাড়া দিলে—যখন আরো অনেক ছোট ছিল সেই সব দিনের মত। বালিশ কামড়াতে লাগল, সমস্ত রুমালটা পুরে দিল মুখের মধ্যে, তার কান্না যেন কেউ শুনতে না পায়। সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতে লাগল ফ্রাউ কেরিশকে। ঘৃণা করতে লাগল তার মেয়েকে, মীনাকে। মনে হল তাকে ওরা কঠিন অপমান করেছে, সেই রাগে আর লজ্জায় পুড়তে লাগল সর্বাঙ্গ। এর জবাব দিতে হলে, এক্ষুনি একটা কিছু করা চাই ক্রিসতফের। যদি এর প্রতিশোধ নিতে না পারে তবে সে এ জীবন আর রাখবে না।

তখুনি উঠে পড়ে সে একটা হতবুদ্ধিকর চিঠি লিখে ফেললে :

"মহাশয়া,

আমি জানিনা আমি আপনাকে বঞ্চনা করেছি কিনা। কিন্তু এটা আমি স্থির জানি, আপনি আমাকে বঞ্চনা করেছেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার বান্ধব—আপনি নিজেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু ও সমস্ত আপনার ভান। আগাগোড়া মিথ্যা। আমার প্রতি আপনার স্নেহ একটা ছলনা মাত্র। আমাকে আপনি খাটিয়ে নিয়েছেন মাত্র। আমি আপনাকে আমোদ দিয়েছি; সেই ভাবেই আমাকে ব্যবহার করেছেন। নইলে আমার বাজনা শোনানোর আর মানে কি! আমাকে আপনার চাকর ভেবেছেন। আমি কারু চাকর নই।

আপনার মেয়েকে ভালোবাসবার অধিকার আমার নেই এই আমাকে নির্মমের মত বোঝাতে চান আপনি। আমার হৃদয় যাকে ভালোবাসবে তাকে তার সেই ভালোবাসা থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না। আমার যদিও আপনার মত কৌলীন্য নেই,

আমি আপনারই মত মহৎ। একমাত্র হৃদয়ই মানুষকে মহৎ করে। আমি যদিও কাউণ্ট নই, তবু অনেক কাউণ্টের চেয়ে আমার হয়তো বেশি সম্মান। কাউণ্টই হোক আর চাপরাশিই হোক, যখন আমাকে কেউ অপমান করে, তখন আমি তাকে ঘৃণা করি। আর যারা মহৎ না হয়েও মহৎ হবার ভান করে তাদেরও আমি ঘৃণা করতে ছাড়ি না।

বিদায়! আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনি আমাকে বঞ্চনা করেছেন। আমি আপনাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

আর যে, আপনার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ফ্রলিন মীনাকে ভালোবাসে, তাকে সে আজীবন ভালোবাসবে, যেহেতু ফ্রলিন মীনা তার একার এবং কেউ তার থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।"

বাক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়েই ভয় ধরল ক্রিসতফের। এ সে কী করে বসল! আর ভাবতে চেষ্টা করল না, কিন্তু কতকগুলো কথা মনের মধ্যে খোঁচা মারতে লাগল বারে-বারে। সে সব মারাত্মক কথাগুলি পড়ছেন ফ্রাউ কেরিশ একথা ভাবতেও ঘাম ছুটল ক্রিসতফের। নিজের হতাশাই নিজেকে আশ্বাস দিচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু পরদিন এই কথাটাই মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল, যা সে করে বসেছে তার ফলে মীনার সঙ্গে তার চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। আর সেইটেই ঘোরতম দুর্ভাগ্য। আশা করল, ফ্রাউ কেরিশ জানেন তার দুর্বার স্বভাবের কথা, তারই একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস ভেবে হয়তো চিঠিটাকে তিনি ক্ষমা করবেন। বড়জোর হয় তো ওকে একটু তিরস্কার করবেন, এবং কে জানে, হয়তো তার আবেগের আন্তরিকতায় তাঁর মন নরম হবে। একটি মিষ্টি কথায় অমনি ক্রিসতফ লুটিয়ে পড়বে তাঁর পায়ের নিচে। পাঁচ দিন অপেক্ষা করল ক্রিসতফ। তারপরে সে একটা চিঠি পেল ফ্রাউ কেরিশের :

"প্রিয়,

যেহেতু তুমি বলছ, তোমার ও আমাদের মধ্যে একটা ভুল-বোঝাবুঝি চলেছে তখন সেই সম্পর্কটা ছিন্ন করে দেওয়াই সমীচীন হবে। যে সম্পর্কটা তোমার পক্ষে বেদনাদায়ক, সেটা জোর করে তোমার উপর চাপিয়ে দিতে গেলে আমার দুঃখ ছাড়া সুখ নেই। তাই এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এখানেই আমাদের সম্পর্কের সমাপ্তি হওয়া উচিত। আমি আশা করি, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, কালক্রমে তুমি অনেক-অনেক বন্ধু পাবে যাঁরা সহজেই তোমার গুণগ্রাহী হবেন। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই—দূর থেকে তোমাকে আমি দেখব, সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করে যাব সুরসাধনার ক্ষেত্রে তোমার অবার্য ক্রমোন্নতি। শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।"

কঠিন কটু-কাটব্যও এর চেয়ে ভালো ছিল। জাঁ-ক্রিসতফের মনে হল সে নিঃস্ব হয়ে গেছে। অন্যায় করে কেউ গালাগাল দেয় তার উত্তরে লেখা যায় দু' কলম। কিন্তু এই বিনীত অবহেলার উত্তরে কী লেখা যায়? রাগে জ্বলতে লাগল ক্রিসতফ। মনে হল মীনার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না জীবনে—এ সে কি করে সহ্য করবে? প্রেমের কাছে সমস্ত অভিমান-অপমান অকিঞ্চিৎকর। নিজের মর্যাদা সে ভুলে গেল, কেমনতর ভীরু ভিক্ষুকের মত হয়ে গেল সে। আরো সে চিঠি লিখল—ক্ষমা চাইল সজল নয়নে। রূঢ় চিঠিটার মতই মূর্খ এই সব কাতর পত্র। কোনো সাড়া পেল না। সমস্ত কথাই তো বলা শেষ হয়েছে।

তার মরে যাবার দাখিল হল। মনে হল আত্মহত্যা করে। মনে হল খুন করে। কল্পনা করল এমনি তারও মনে হচ্ছে হয় তো। আগুন লাগিয়ে দিলে বা কেমন হয়? এ ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। জানলার

কাছে হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর রেখে এমনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়ার অর্থ কী নিদারুণ। ছেলেবেলায় যেমন ভাবত যন্ত্রণার থেকে কি করে মুক্তি পাবে, এখনো সেই চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। চোখের সামনেই খোলা রয়েছে সেই পথ। এখুনি, এই মুহূর্তে। কি, কি সেই পথ? কোথায় সে উপায়? কে জানে, কত দিনে জানবে সে? কত দিন, কত বৎসর, কত শতাব্দীর পরে—কত মর্মন্তুদ আর্তনাদের শেষে!

লুইসা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ক্রিসতফের যন্ত্রণা। কি যে ঠিক হয়েছে পরিমাপ করতে পারে না, কিন্তু তার মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে কি এক সর্বনাশের পূর্বাভাস। ইচ্ছা হয় ছেলের সন্নিহিত হয়ে তার দুঃখ কি, আবিষ্কার করে, পরে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলার অভ্যেস নেই লুইসার। বহু বছর ধরেই নিজের ভাবনা নিজের মধ্যে গোপন করে রেখেছে ক্রিসতফ, আর লুইসা সংসারের ধান্দায়ই সমস্ত দিন উচাটন, সময়ও হয় না ছেলের সুখ-দুঃখের খবর নেয়। কিন্তু এখন যখন ছেলের কথা জানবার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করছে, লুইসা ভেবেও পায় না কি করে ছেলের পাশটিতে গিয়ে বসবে। নীড়হারা পাখির মত মনটা তার বারে-বারে ছেলের কাছে ঘোরাফেরা করছে, যদি জানতে পারে কী তার দুঃখ, নিশ্চয়ই উপযুক্ত প্রবোধ দেবার সঞ্চয় আছে তার মাতৃবক্ষে, কিন্তু কি বলে হঠাৎ বিরক্তি উৎপাদন করে বসবে, সেই ভয়েই এগুতে সাহস হয় না। এবং কে জানে তার ভাবভঙ্গি বা অকারণ উপস্থিতি দিয়ে ইতিমধ্যেই সে ছেলের বিরক্তিভাজন হয়েছে কিনা। একে অন্যেকে ভালোবাসে তারা সন্দেহ নেই। কিন্তু এইরকম দুটি স্নেহপ্রবণ চিত্তকেও কত সহজে ও কত সামান্য ভাবেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়! একটা রূঢ় কথা, একটা রুক্ষ দৃষ্টি, নাকের বা চোখের ছোট্ট একটুখানি কুঞ্চন,

চলা-ফেরা ওঠা-বসা বা খাওয়া বা হাসার ভঙ্গি—ছোটখাট কোনো শারীরিক বাধা...হয়তো বলবে এসব কিছু নয়, সামান্যই, কিন্তু সংসারে এ সবই অনেক। এ সবই অনায়াসে মা থেকে ছেলেকে, ভাই থেকে ভাইকে, বন্ধু থেকে বন্ধুকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম।

যে বিপদের মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে তাতে মার কাছ থেকে সান্ত্বনা নিয়ে ক্রিসতফ কোনো সামর্থ্য খুঁজে পাবে না। তা ছাড়া যে আবেগের অহমিকায় সে জ্বলছে সেখানে স্নেহসিঞ্চনে কি হবে?

এক রাতে, বাড়ির সবাই ঘুমুচ্ছে, ডেস্কের কাছে চুপচাপ বসে আছে ক্রিসতফ, মনও নড়ছে না, শরীরও নড়ছে না, রাস্তায় কতগুলো ভারী পায়ের শব্দ হল—শেষে শব্দ হল বাড়ির দরজায়। ঘোর কেটে গেল ক্রিসতফের, কান খাড়া হয়ে উঠল। কতগুলো ভারী গলার আওয়াজ। মনে পড়ল বাবা এখনো বাড়ি ফেরেনি—মত্ত অবস্থায় বাবাকেই ধরাধরি করে এনে বাড়িতে কারা হয়তো পৌঁছে দিচ্ছে। হপ্তা দুয়েক আগেও তাই হয়েছে। রাস্তায় পড়েছিল বাবা, কারা তুলে পৌঁছে দিয়ে গেছে দয়া করে। সমস্ত সংযম ছারেখারে দিয়েছে মেলশিয়র—শুধু দানবের মতই স্বাস্থ্য, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনো। চারজনের মত সে খায়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত না এলিয়ে পড়ে ততক্ষণ মদ বন্ধ করে না। বরফে-বৃষ্টিতেও বাড়ির বাইরে রাত কাটায়। মাতালদের সঙ্গে মারামারিতে জখম হয় কতদিন। পরদিন সকালে আবার বন্য প্রফুল্লতা নিয়ে সে জেগে ওঠে, আশা করে সমস্ত পৃথিবী তার মতই প্রফুল্ল হোক।

ছুটে গিয়ে লুইসা খুলে দিল দরজা। ক্রিসতফ নড়ল না, কানে যেন মেলশিয়রের কুৎসিত চীৎকার না ঢোকে তারই আশা করতে লাগল প্রাণপণে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভয় তাকে চেপে ধরল। হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল সে অকারণে। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ সমস্ত শূন্য বিদীর্ণ করলে। দরজার দিকে ছুটে গেল ক্রিসতফ।

অন্ধকার প্যাসেজে অস্পষ্ট একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নিম্নস্বরে কথা বলছে কতগুলি লোক। আর তাদেরই মধ্যে স্ট্রেচারের উপর শুয়ে আছে কে—সমস্ত গা ভেজা, জল ঝরছে পোশাক থেকে। স্ট্রেচারে করে এমনি একদিন শুয়ে ছিলেন ঠাকুরদা! লোকটা নড়ছে না। লুইসা তাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদছে আকুল হয়ে। ও আর কেউ নয়। বাবা—মেলশিয়র। জলে ডুবে মরেছে।

ককিয়ে কেঁদে উঠল ক্রিসতফ। সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল—তার অন্যান্য সব দুঃখের লেশমাত্র অবশিষ্ট রইল না। মার পাশে বসে বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুজনে কাঁদতে লাগল পাশাপাশি।

বিছানায় এনে শোয়ানো হল মেলশিয়রকে। পাশে বসে তার এই শেষ নিদ্রাটি দেখতে লাগল ক্রিসতফ। মৃত্যুর তিমিরলিপ্ত শান্তিটি বাবার মুখে কে মেখে দিয়েছে—সেই শান্তিটি আত্মার গভীরে অনুভব করল ক্রিসতফ। তার প্রথম যৌবনের আবেগ জ্বর-ছাড়ার মত চলে গেল মিলিয়ে, মৃত্যুর শীতার্ত নিশ্বাস তা ভস্ম করে দিল। কোথায় মীনা, তার অহঙ্কার আর প্রেম—আর সে নিজে! বাস্তবের কাছে আর সব কী ক্ষুদ্র—আর, একমাত্র বাস্তব হচ্ছে মৃত্যু। এত যন্ত্রণা সহ্য করা এত আকাঙ্ক্ষা করা—তারপর এই তার পরিণতির আকৃতি!

বসে-বসে দেখতে লাগল সে বাপের ঘুম। আর অনন্ত করুণায় তার বুক ভরে গেল। জীবনে কবে কোথায় কতটুকু দয়া দেখিয়েছে বা স্নেহ করেছে তাই খুঁজে-খুঁজে বার করতে লাগল। সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও মেলশিয়র মন্দ ছিল না—অনেক ভালো ছিল তার মধ্যে। তার

সংসারকে সে ভালোবাসত। সৎ ছিল। সাহসী ছিল। যখন কোনো বিপদ এসেছে সেটা যেন কত উপভোগের ব্যাপার এমনিভাবে এগিয়েছে তার দিকে। উচ্ছৃঙ্খল ছিল—তা শুধু নিজের জন্যে নয়, পরেরও জন্যে—কাউকে সে বিষণ্ণ দেখতে চাইত না। তার বিষাদ মোচন করবার জন্যে যা কিছু পকেটে থাকত দিয়ে দিত অকাতরে। ফেরৎ পাবার ধার ধারত না। এ সমস্ত গুণ একে-একে প্রতিভাত হতে লাগল ক্রিসতফের কাছে, কিছু কিছু বা নিজে উদ্ভাবন করলে, নিজে বা বাড়িয়ে তুললে। মনে হল বাবাকে সে এতদিন ভুল বুঝে এসেছে। তাকে যথেষ্ট ভালোবাসেনি বলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে এখন। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একটি আর্ত আকুতি বাবার কণ্ঠে ভেসে এল তার কানে :

"জাঁ-ক্রিসতফ, আমাকে ঘৃণা করিসনে।"

অনুতাপে ভরে গেল ক্রিসতফ। বাবার মৃত মুখ সে চুম্বন করলে। সেদিনের মতই সে বললে :

"বাবা, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে ক্ষমা করো।"

কিন্তু বাবার সে কাকুতি থামতে চায় না কিছুতেই। "আমাকে ঘৃণা করিসনে, করিসনে।"

হঠাৎ ক্রিসতফের মনে হল বাবার পরিবর্তে সে নিজেই শুয়ে আছে বিছানায় আর নিজেই যেন বলছে, নিজের অর্থহীন অপদার্থ জীবনের ভারে ক্লিষ্ট হয়ে :

"আমাকে ঘৃণা কোরো না। ঘৃণা কোরো না।"

মনে মনে ভয় পেল ক্রিসতফ। এই মৃত্যুর চেয়ে সব কিছুই বোধহয় ভালো। আসুক দুঃখ, আসুক দৈন্য, আসুক হতাশা, তবু এমনি

করে যেন মরতে না হয়! হায়, এই মৃত্যুর কাছাকাছিই নিজেকে টেনে নিয়ে এসেছিল সে। সামান্য দুঃখের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে মৃত্যুকেই চেয়েছিল সে বরণ করতে। মৃত্যুতে নিজেকে অপমান করার কালিমার কাছে ও-সব দুঃখ তো সামান্য, লঘুভার।

জীবন হচ্ছে একটা সন্ধিহীন দয়াহীন যুদ্ধ। যদি মানুষের মত বাঁচতে হয়, নিবৃত্তিহীন যুদ্ধ করে যেতে হবে অদৃশ্য সব ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে—হিংস্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কুৎসিত চিন্তা ও প্রলয়ংকর কামনার বিরুদ্ধে। সর্বনাশের ফাঁদে পা প্রায় ফেলতে যাচ্ছিল ক্রিসতফ। সুখ আর প্রেম হচ্ছে ক্ষণিকের বন্ধু, জীবনের আসল অধিপতি হচ্ছে সংগ্রাম।

পনেরো বছরের ক্রিসতফ, অন্তরের মধ্যে শুনতে পেল দৈববাণী:

"এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, সংগ্রাম করো, বিশ্রাম কোরো না।"

"কিন্তু, হে প্রভু, কোথায় কোন দিকে আমি যাব? যেখানেই আমি যাই, যা কিছুই আমি করি, সমস্ত কিছুর পরিণতি কি এই মৃত্যু নয়?"

"যারা মরবে, মৃত্যু পর্যন্তই যাও। যারা দুঃখ সহ্য করবে, দু' হাত ভরে লুটে নাও দুঃখ। সুখী হবার জন্যে তোমরা বাঁচছ না। আমার বিধান পূর্ণ করবার জন্যেই তোমরা বাঁচছ। দুঃখ পাও—মরো। কিন্তু যা হতে বলেছি, তাই হও। মানুষ হও।"

বয়ঃসন্ধি

জঁা ক্রিসতফ : তৃতীয় খণ্ড

পুষ্পময়ী বসু অনূদিত

ক'টি কথা বলার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

অনুবাদটির মধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও বাংলা উদ্ধৃতি দেখা যাবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরস্ব ব্যবহারের উদাহরণ বড় একটা দেখা যায় না। উদ্ধৃতিগুলিকে লেখকের ব্যবহৃত ও মূলের অংশ ব'লে ধারণা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মূল যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন উদ্ধৃতি হিসেবে এগুলো লেখক কর্তৃক একেবারেই ব্যবহৃত হয়নি। এগুলির ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুবাদকের এবং মূলের প্রকৃত অনুবাদ হিসেবেই। অলংকরণ অথবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। কেন এ ঋণ করার প্রয়োজন হ'ল সে কথা বলার জন্যই এ ক্ষুদ্র ভূমিকা।

অনুবাদক মাত্রই জানেন অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ অনুবাদ শুধু অন্য ভাষার মাধ্যমে বিষয় বস্তুরই প্রতিলিপি নয়, তা লেখকেরও ছবি। এবং এ ছবি ক্যামেরায় তোলা ফোটোর ছবি না হ'য়ে শিল্প রচনা হ'লে, তবে লেখক ও তাঁর লেখার প্রতি সুবিচার করা হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন পরিবেশের একটি মানসকে রূপ দান করার কাজ সহজ নয়, বিশেষ ক'রে সেই মানস যদি মহা-মনীষী রোলাঁর মত বিরাট হয়। অবশ্য অনুবাদের কাজে আমার হাতে খড়ি মাত্র। হয়ত তাই জাঁ-ক্রিসতফের মত জীবন মহা-কাব্য অনুবাদ করতে ব'সে বারে বারে কলম স্তব্ধ হয়েছে। মূল লেখায় যে-ব্যঞ্জনা ভাষা ও শব্দকে অতিক্রম ক'রে গেছে, তাকে ভাষায় বাঁধার দুঃসাধ্য সাধনের সামনে ব'সে একটা কথা মনে হয়েছে।

জগতের মনীষীদের সম-চিন্তা-ধারার কথা সুবিদিত। সুতরাং অনুবাদে কোনো স্থানের মূল ভাবটির রূপান্তরের উপাদান যদি অপর কোনো ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা যায় তবে হয়ত অনুবাদ অধিকতর সুষ্ঠু এবং প্রকাশ অকৃত্রিম ও রসোত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

এই বিশ্বাস নিয়েই স্থানে স্থানে বিশ্বকবির ভাণ্ডার থেকে প্রসাদ কণিকা গ্রহণ করেছি। সংস্কৃত যে দু'চারটে উদ্ধৃতি আছে, তারও উদ্দেশ্যও ঐ একই। সংস্কৃতকে অবশ্যই বাংলায় তর্জমা করা যেত। কিন্তু রস ও মূলের প্রকৃত মর্যাদা অব্যাহত রাখার জন্য তা করা হয়নি।

এবারের এ অনুবাদের কাজে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল হালদার ও কল্যাণীয়া বেলা দত্তগুপ্তের কাছে আমার ঋণ অশেষ। এ ঋণ ধন্যবাদ দিয়ে শোধ করার মত ঋণ নয়। ইতি—

অনুবাদক

কলিকাতা
৩রা অক্টোবর ১৯৫১

গৃহখানি নিথর নিঝুম। মেলশিয়রের মৃত্যুর সাথে সাথে যেন সব কিছুর 'পর মৃত্যু নেমে এল। তার প্রখর কল কণ্ঠ থেমে গেল; দিবা-রাত্রির বুকে জেগে রইল শুধু নদীর একতান কুলু কুলু ধ্বনি।

ক্রিসতফ কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ও সুখী হ'তে চায়। এবং চায় বলেই নিজকে ও পীড়ন করে বেশী। পীড়ন ক'রেই ওর উল্লাস। দু'টি দরদের কথা বলো, করো এতটুকু সমবেদনা, ওর অভিমানের অচলায়তনে ঠিকরে ফিরে আসবে। নীরবে রাত দিন কাজ ক'রে চলেছে। গান শেখায় নিষ্প্রাণ শিষ্টাচারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ওর দুঃসময়ের খবর রাখে। গুরুর এই পাথুরে ঔদাস্যে তারা অবাক হয়। কিন্তু জীবনের কঠিন পথ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যারা প্রায় পথের শেষে এল, দুঃখ-দেবতার বরণ-মালা যাদের কণ্ঠে, তারাই শুধু জানল তুষার শিলার তলায় বুকের বেদনাকে চাপা দিয়ে কিশোর বালকের এ দুঃখ-সাধন। সমবেদনায় তাদের হৃদয় আকুল হয়, কিন্তু ও ছেলে যেন পাষাণ। ওকে কিছুতেই স্পর্শ করে না। সঙ্গীতে ওর সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই খেলায়, কারণ খেলা ওর খেলা নয়, কৃত্য।

আনন্দ ও সত্যি পায় না, অথবা পায়না ব'লে ওর ধারণা। ভাবে বেঁচে থাকার কিইবা হেতু! অথচ বেঁচে রয়েছে এবং থাকবে। হেতুকে চোখ রাঙ্গিয়ে একেবারে পুরোপুরি অহেতুক এই যে বেঁচে থাকা, এতে ওর খুব বড় রকমের নিষ্ঠুর উল্লাস।

মৃত্যু-পুরীর এই নিস্তব্ধতা থেকে পালিয়ে বেঁচেছে ওর অন্য দুই

ভাই। রোডল্ফ্ গেছে তার কাকা থিওডোরের আফিসে কাজ নিয়ে। এবং থাকে কাকারই বাড়ীতে। আরনেষ্ট দু'তিন রকম কাজ চেখে দেখার পর এখন আছে একটা জাহাজে। বাড়ী আসে টাকার দরকার হ'লে। অতএব বিরাট বাড়ীটার একচ্ছত্র অধিবাসী ক্রিসতফ আর তার মা। বাড়ীটা যেন ওদের গ্রাস ক'রে রেখেছে। পুরানো বাড়ী—নাড়ীর পাকে পাকে জড়ান। তবু একে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে হয়; খুঁজতে হয় সস্তার আরো ছোট আস্তানা। যেহেতু আয় কমেছে। এবং পিতার মৃত্যুর পর ঋণের যে-পাহাড় হাতে ঠেকল তা শোধ দিয়ে তলানী বিশেষ কিছু থাকল না।

ছোট একটা ফ্ল্যাট পাওয়াও গেল মার্কেট-ষ্ট্রীটে। তিন তলায় ছোট্ট দু'তিনখানি কোঠা—নদী থেকে, গ্রামের আজন্মের চেনা আবেষ্টন, আর প্রকৃতির শ্যাম-দাক্ষিণ্য হ'তে দূরে শহরের কোলাহলময় প্রাণ-কেন্দ্রে। হোক—আজ ভাবালুতা নিয়ে বিলাসের দিন নয়, আজ বাস্তবের কঠিন ভূমিতে হিসেব ক'রে পা ফেলার দিন। ক্রিসতফের আত্ম-নিগ্রহ-রূপ ধর্ম-সাধনের পক্ষেও স্থানটী অনুকূল। এ ছাড়াও সুবিধার কথা আছে। বৃদ্ধ অয়লার মেলশিয়রের পিতৃ-বন্ধু। এ পরিবার তার চেনা। বিরাট বাড়ীর অতল নির্জনতায় তলিয়ে যাচ্ছিল লুইসা—তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। তারপর ওর হারানো-প্রিয়জনকে যারা ভালোবেসেছিল কোনো না কোনো দিন—ওর কাছে প্রিয়াঃ এব তে।

এখন তৈরী হবার পালা। আজন্মের আবাস চিরজন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে। শেষের দিনগুলো বিদায়-বেদনায় ঘন হয়ে ওঠে। অগ্নি-কুণ্ডের সামনে ব'সে মা ছেলেতে তিক্ত বেদনা আকণ্ঠ পান করে। এই কুণ্ডের উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে

"কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুঃখের প্রীতি
বিদায়-বেলায় আজিও রহিল বাকী…"

কথা হারিয়ে যায়। রুদ্ধ-দ্বার চিত্তের গভীরে বেদনা উতরোল—বাহিরে স্থির-সাগরের প্রশান্তি। প্রকাশের সাহস নেই, দুর্বলতার লজ্জা এসে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। দুজনেই ভাবে

"গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে,
সাহস নাহি পাই।"

আধা-বন্ধ খাবার ঘরের আবছায়ায় টেবিলে মুখোমুখি দুটি নীরব মূর্তি—তাড়াতাড়ি কোনোমতে খাওয়া সারে। কথা দু'চারটি সামান্য—শরৎ শেষের ঝ'রে-পড়া ভীরু শিউলির মত। কেউ কারো দিকে চায় না, ভয় পাছে মনের কথা চোখের তারায় ভাষা পায়। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলেই যে যার পথ ধরে। ক্রিসতফ যায় নিজের কাজে। ফিরে আসে কাজ শেষ হওয়া মাত্র। নিঃশব্দে চলে যায় নিজের ঘরে অথবা চিলে-কোঠার একান্তে। দরজা বন্ধ ক'রে এসে বসে কোণটিতে পুরানো ট্রাংকটার ওপর, অথবা জানালার ধারে। মনের সমস্ত ভাবনাকে দু'হাতে ঠেলে দেয় চিত্তের দূর প্রত্যন্তে। পুরানো বাড়ীখানা সামান্যতম আঘাতে শিউরে কেঁপে ওঠে। আর গম গম করে কি একটা অস্পষ্ট অসংজ্ঞেয় গুঞ্জনে। সেই গুঞ্জন হিল্লোলিত হ'য়ে ব'য়ে যায় ওর সত্তার কোষে কোষে। দেহে মনে পুলক লাগে। কান পেতে শোনে ভিতর আর বাহিরের প্রতিটি নড়াচড়ার, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, বয়সের ভারে শিথিল-গ্রন্থি বাড়ীখানার থেকে থেকে ককিয়ে-ওঠা, আরো এমনিতরো বহু বিচিত্র ধ্বনি যা চেনা গেলেও বোঝা যায় না। সব ক্রিসতফের

একেবারে চেনা। ওর যেন সম্বিৎ আচ্ছন্ন হয়ে যায় ; চিত্ত ছেয়ে যায় অতীতের ছায়া-ছবিতে। সেইন্ট-মার্টিনের ঘড়ি বাজে ঢং ঢং ঢং। আবেশ ভাঙ্গে, চম্‌কে ওঠে—সময় হ'ল।

ওর ঠিক নীচের ঘরে থাকে লুইসা। শোনা যায় তার লঘু-পদ-সঞ্চরণের শব্দ। তারপরই সব নিঝুম। বহুক্ষণ ধ'রে আর কোনো শব্দ নেই। ক্রিসতফ সারা ইন্দ্রিয় স্থির ক'রে শুনতে চেষ্টা করে। কিছুই শোনা যায় না। ভারী অস্বস্তি বোধ হয়, যেন বড় রকম একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল একটু আগে। নীচে নেমে আসে। মার ঘরের দরজা খুলে ফেলে দেখে, আলমারী-উজাড়-করা ছেঁড়া-খোঁরার রাশ মেঝে-ময় ছড়ান ; তারি মাঝখানে মায়ের ধ্যান-মগ্না মূর্তি—যেন নির্বাসিতা এ জগৎ হতে বহুদূরে কোনো এক বিগত জগতের নির্জন প্রান্তরে। ঝেড়ে বেছে তুলবে ব'লে আজ এগুলো বেরিয়েছিল। কিন্তু তার পরে হাত আর চলেনি। এই জীর্ণ, দীর্ণ, পরিত্যক্তের প্রতিটী কণা এক একটী দীপ্তিময়ী স্মরণিকা। একটী জিনিষ হাতে তোলে—বারে বারে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে স্পর্শ বুলিয়ে দেখে—দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। মুঠি শিথিল হয়, হাতের জিনিষ প'ড়ে যায় মাটীতে। গভীর বিষাদের মেঘে অন্তর ছায়। অবশ দেহ চেয়ারে পড়ে এলিয়ে। এই ভাবে কতক্ষণ কাটে কে জানে...।

বর্তমান ছেড়ে লুইসা ফিরে গেছে অতীতে, যে অতীত আনেনি আনন্দের অর্ঘ্য ; জীবনের পাত্রকে শুধুই নিরন্তর পূর্ণ ক'রে রেখেছে তীব্র বেদনায়। সংসারে ওর প্রাপ্যের হিসেবে দুঃখটাই ছিল চরম। সুতরাং একটুখানি মিঠে কথা, এক ফোঁটা দরদে ওর চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় যায় নুয়ে। ওর আঁধার জীবনে এই আকস্মিক আশীর্বাদের দূতেরা যে ক্ষীণ প্রদীপ জেলেছিল তার ভীরু

শিখায় এখনও সেই আঁধার দীপ্ত। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া লাঞ্ছনা মনে রাখেনি। কিন্তু তার দেওয়া সুখের কণাটুকু অবধি স্মৃতির আকাশে তারা হ'য়ে জ্বলছে। বিবাহিত অধ্যায়টি ওর জীবনের সব চেয়ে বড় রোম্যান্সের অধ্যায়। মেলশিয়র অবশ্যি উড়ে এসেছিল খেয়ালের হাওয়ায়। এবং বাঁধা প'ড়ে পস্তাল দু'দিন না যেতে। কিন্তু লুইসার আত্ম নিবেদনে আর কিছু বাকী রইল না। ওর পরিপূর্ণ ক'রে দেয়াটাই পরিপূর্ণ ক'রে পাওয়ার আনন্দ হ'য়ে উঠল। নিজের হৃদয় দিয়েই স্বামীর হৃদয় পেয়েছে এমনি স্থির বিশ্বাসে স্বামীর কাছে প্রেমবতী প্রণতা হল কৃতজ্ঞতায়। অন্ধ হয়ে স্বামীর পরিবর্তনটা তলিয়ে দেখলে না, শিখলে না বাস্তবকে খোলা চোখে দেখতে। শিখলে কেবল নম্রশিরে খাঁটি হ'য়ে তাকে মেনে নিতে। অর্থাৎ আরো অনেক মেয়ের মত জীবন নিয়ে ঘর করতে গিয়ে জীবনকে চিনে নেওয়ার ওর প্রয়োজন হ'ল না। ও নিজে যা বুঝতোনা তার জন্য ছিলেন ওর ভগবান। তাঁর হাতে নিঃশংসয়ে সব ছিল তোলা। স্বামী এবং অন্যের হাতের লাঞ্ছনাকে ঠাকুরের প্রসাদ ব'লে শিরোধার্য করেছে শ্রদ্ধায়। যতটুকু ভালো পেয়েছে সযত্নে সঞ্চয় করেছে স্মৃতির ভাণ্ডারে। সুতরাং ওর দুঃখের দিন তিক্ততায় বিস্বাদ হয়নি, শুধু ও নিজে অবসাদে খিন্ন হয়েছে। আজ মেলশিয়র নেই, দুই ছেলে বাড়ী-ছাড়া। তৃতীয়টিও মাতৃ-ক্রোড়ের প্রয়োজনকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং আজ পূর্ণ অবসর। হাতে কাজ নেই; যেটুকু বা আছে তাতে প্রাণ নেই। বড় ক্লান্তি...বড় অবসাদ...তন্দ্রার ঘোর ছেয়ে আসে ..সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন পক্ষাঘাতে অসাড় হ'য়ে যায়। যেন জোয়ার শেষের ভাটির তন্দ্রালু পঙ্কিল স্থিতি। জীবন-ব্যাপী কাজের স্রোত যখন ভাটির কর্দমে এসে নিঃশেষ হয়—তখন একদা-কর্ম-চঞ্চল দেহ মরা-স্রোতের মত অমনি

নেতিয়ে পড়ে ; বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর কাজের বায়ু প'ড়ে এলে তখন বায়ুর কাজের পালা। লুইসার অবস্থাটা এখন এই বায়ু-রোগ-গ্রস্ত নৈষ্কর্মের অধ্যায়ে এসে ঠেকেছে। তাই আরম্ভ-করা মোজাটা শেষ হ'য়ে ওঠে না ; পরিষ্কার করার জন্য খোলা দেরাজটা অমনি প'ড়ে থাকে ; খোলা-জানালাটা ভেজান দরকার, উঠে ঐটুকু করার মত জোর মেলে না দেহে। মেলে না, মিলবে না। কিছু করতে পারবে না—এইখানে, এই চেয়ারে শিথিল দেহ অমনি এলিয়ে কেবল প'ড়ে থাকতে পারবে…শূন্য মনে। ভাবতেও কিছু পারে না, পারবে না…পারবে কেবল পুরানো স্মৃতি নেড়ে চেড়ে খেলা করতে। আর কোনো শক্তি নেই।

বুঝতে পারে লুইসা, অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে সে। লজ্জা পায়। গালের শুভ্রতায় তার চিহ্ন পড়ে। ছেলের কাছ থেকে লুকুতে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রিসতফ তার নিজের দুঃখের খোলসের মধ্যে এমনি শম্বুক হ'য়ে আছে যে বাইরের পৃথিবী তার দৃষ্টির অগোচর। মায়ের ওই তন্দ্রালু ধরনে, সামান্য বিনা পরিশ্রমের কাজেও অমন অসামান্য অবসাদে বরঞ্চ ওর ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করে না তা। মাকে চিরকাল ও দেখেছে কাজের নিরেট ইমারৎ। অথচ আজের এই মানুষটা যে আর একটা মানুষ সে খেয়াল এতদিন হয়নি।

হ'লো সেদিন। লুইসা বসেছিল তার যতো জীর্ণের আম-দরবারে। আশে পাশে কোলে হাতে ছেঁড়া-ভাঙ্গার রাশ ছড়ান। ওর ঘাড় গোঁজা, মাথা নত, মুখ অচঞ্চল স্থির। একটি পেশীরও কুঞ্চন নেই। ছেলের পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠল। মুখ লাল হ'য়ে গেল। অজ্ঞাতসারেই মুঠোর জিনিষটি নিয়ে হাতটি পেছনে স'রে গেল কখন। অপ্রস্তুত হাসির রেখা ফুটল মুখে। বলল : 'গুছোচ্ছি সব বাবা।'

ক্রিসতফের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে রাখার কি আকুলতা…কি করুণ তার রূপ।

কিন্তু সর্বনেশে ব্যাধি এই শবের-পূজা। এ ব্যাধিকে আমল দেওয়া চলবে না। স্বরে ঝাঁঝ মেখে কঠিন করে তাই বলে :

'কি করছ মা! শিগ্‌গির ওঠ! বন্ধ ঘরে এমনি ধূলো-ময়লার মধ্যে ব'সে আছ! আচ্ছা মানুষ তুমি। ওঠ এক্ষুণি। ছেলেমানুষী করে না। এসব চলবে না ব'লে দিচ্ছি।'

মৃদু আত্ম-সমর্পণের কণ্ঠে জবাব আসে : 'এই উঠছি বাবা।' তারপর দেরাজ গুছিয়ে তুলতে আরম্ভ করে। কিন্তু হাত থেকে খ'সে প'ড়ে যায় সব। ব'সে পড়ে অসহায় ভাবে।

'না না, আমি পারব না…পারব না…' কান্না-মথিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ বেরিয়ে আসে একটি একটি ক'রে।

'শেষ হবে না…হবে না…। কোনও দিন শেষ হবে না। আমি পারব না শেষ করতে…'

ভয় পেয়ে যায় ক্রিসতফ। ঝুঁকে পড়ে মায়ের দিকে। আস্তে আস্তে কপালে হাত বুলিয়ে দেয়।

'কি হলো মা! শরীরটা খারাপ লাগছে? চলো আমি সাহায্য করছি।'

লুইসা নিস্পন্দ। থেকে থেকে চাপা কান্নায় দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মায়ের হাত হাতের মধ্যে নিয়ে নত-জানু হ'য়ে পাশে বসে পড়ে ক্রিসতফ।

'মা!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকে। লুইসার মাথা ছেলের কাঁধের 'পর নেমে আসে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। অঝোরে চোখের জল ঝরে। দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে শক্ত ক'রে :

'বাবা, বাবা, খোকা, বল্ তুইত আমায় ছেড়ে চলে যাবিনে··· বল, যাবিনে আমায় ফেলে!'

মমতায়, বেদনায় বুকের মধ্যে ঘূর্ণী জাগে ক্রিসতফের। 'না মা যাব না। কোথায় যাব তোমায় ফেলে! কি সব পাগলের মত ভাবছ?'

'আমি যে পারছিনে বাবা! আমার ভেতর খেয়ে যাচ্ছে। সবাই যে চ'লে গেলরে ছেড়ে···' হাতের ইসারায় দেখিয়ে দেয় সামনের ছড়ান জিনিষগুলির দিকে। ক্রিসতফ বুঝে উঠতে পারে না মার লক্ষ্য কাপড়-জামাগুলো না তাদের পুরানো অধিকারীরা। আবার বলে কাতর কণ্ঠে: 'বল্ যাবিনে তুই, কোনো দিন নয়, কক্খনও নয়! তুইও চলে গেলে কেমন ক'রে বাঁচব আমি···'

'এ সব উদ্ভুট্টে কথা তোমার মাথায় কেন আসছে বলতো! এই নাও। বলছি, যাব না, যাব না, কোনোদিন যাব না। তোমায় আমায় দুজনে থাকব চিরকাল। কেঁদনা মা, সত্যি বলছি যাব না।'

কিন্তু চোখের জল থামে না কিছুতেই। রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় ক্রিসতফ। বলে:

'মা! মা! বলো কি হ'ল তোমার আজ? কষ্ট হচ্ছে? বল, মা বল!'

'জানিনেরে আমি, জানিনে। জানিনে কি হয়েছে।' স্থির হ'তে চেষ্টা করে। ক্ষীণ হাসির একটু রেখা জেগে ওঠে।

'জানি অবুঝ হচ্ছি। খুব চেষ্টা করি। কিন্তু কেন যে কাঁদি বুঝিনে। অমনি অমনি চোখে জল আসে। এই দেখ, আবার পড়ছে! কিছু মনে করিসনে, বাবা আমার। বুড়ো হ'য়ে আমার ভীমরতি ধরেছে। কিন্তু কেন বলতো এমন হচ্ছে? হাত পা যেন সব অবশ। সব শক্তি শুষে আমায় একেবারে ছিবড়ে ক'রে রেখে গিয়েছে। আমার

আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। সব আকর্ষণ মিটে গেছে। যারা গেল তারা আমায় কেন নিয়ে গেল না!'

মাকে একেবারে শিশুর মত ক'রে বুকের কাছে টেনে আনে ক্রিসতফ। বলে: 'ছিঃ মা কি বলছ এ সব! শান্ত হও। তোমার যত সব বাজে ভাবনা।' ধীরে ধীরে স্থির হয় লুইসা। বলে:

'সত্যি রে আমার সব বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কিছু মনে করিসনে, খোকা। কিন্তু বল্‌তো এমন কেন হচ্ছে?'

এতদিন প্রতিটি ক্ষণ কাজে ছিল ভ'রে। আজ সেই স্রোতটি কেমন ক'রে বন্ধ হ'লো, কেমন ক'রে সব শক্তি বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেল—কেমন করে অঙ্গে অঙ্গে নেমে এল তন্দ্রার জড়িমা, তা ওর নিজের কাছেই রহস্য। অবাক হয়ে যায়। ভারী অপমান বোধ হয়। ক্রিসতফ যেন সত্যটা দেখেও দেখছে না। যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবে বলে:

'কিছু হয়নি। সারা জীবন খেটেছ। একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ আর কি। দুদিনে সব ঠিক হ'য়ে যাবে দেখো।'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে ওর মা শক্তিময়ী, ভয়হীনা, আত্ম-নিবেদিতা, ধরিত্রীর মত নীরব বীর্যে জীবনের প্রতি পরীক্ষায় সম্মুখীনা। আজ ও অবাক হ'য়ে গেল; ভয় পেল। মেজেতে ছড়ান জিনিষগুলি ঝেড়ে ঝুড়ে মায়ের সাথে সাথে তুলতে লাগল। মা প্রতি মুহূর্তে একটা না একটা জিনিষ হাতে নিয়ে প্রস্তর-মূর্তির মত পলক-হীন চোখে চেয়ে বসে থাকেন। ক্রিসতফ অতি ধীরে সেটা হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দেয় না লুইসা।

ক্রিসতফ সেদিন থেকে মার কাছে আরো বেশী ক'রে থাকতে চেষ্টা করে। কাজ শেষ হলেই মার কাছে এসে বসে। আগের মত আর

'বাবা, বাবা, খোকা, বল্ তুইত আমায় ছেড়ে চলে যাবিনে… বল, যাবিনে আমায় ফেলে!'

মমতায়, বেদনায় বুকের মধ্যে ঘূর্ণী জাগে ক্রিসতফের। 'না মা যাব না। কোথায় যাব তোমায় ফেলে! কি সব পাগলের মত ভাবছ?'

'আমি যে পারছিনে, বাবা! আমার ভেতর খেয়ে যাচ্ছে। সবাই যে চ'লে গেলরে ছেড়ে…' হাতের ইসারায় দেখিয়ে দেয় সামনের ছড়ান জিনিষগুলির দিকে। ক্রিসতফ বুঝে উঠতে পারে না মার লক্ষ্য কাপড়-জামাগুলো না তাদের পুরানো অধিকারীরা। আবার বলে কাতর কণ্ঠে: 'বল্ যাবিনে তুই, কোনো দিন নয়, কক্‌খনও নয়! তুইও চলে গেলে কেমন ক'রে বাঁচব আমি…'

'এ সব উদ্ভুট্টে কথা তোমার মাথায় কেন আসছে বলতো! এই নাও। বলছি, যাব না, যাব না, কোনোদিন যাব না। তোমায় আমায় দুজনে থাকব চিরকাল। কেঁদনা মা, সত্যি বলছি যাব না।'

কিন্তু চোখের জল থামে না কিছুতেই। রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় ক্রিসতফ। বলে:

'মা! মা! বলো কি হ'ল তোমার আজ? কষ্ট হচ্ছে? বল, মা বল!'

'জানিনেরে আমি, জানিনে। জানিনে কি হয়েছে।' স্থির হ'তে চেষ্টা করে। ক্ষীণ হাসির একটু রেখা জেগে ওঠে।

'জানি অবুঝ হচ্ছি। খুব চেষ্টা করি। কিন্তু কেন যে কাঁদি বুঝিনে। অমনি অমনি চোখে জল আসে। এই দেখ, আবার পড়ছে! কিছু মনে করিসনে, বাবা আমার। বুড়ো হ'য়ে আমার ভীমরতি ধরেছে। কিন্তু কেন বলতো এমন হচ্ছে? হাত পা যেন সব অবশ। সব শক্তি শুষে আমায় একেবারে ছিবড়ে ক'রে রেখে গিয়েছে। আমার

আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। সব আকর্ষণ মিটে গেছে। যারা গেল তারা আমায় কেন নিয়ে গেল না!'

মাকে একেবারে শিশুর মত ক'রে বুকের কাছে টেনে আনে ক্রিসতফ। বলে: 'ছিঃ মা কি বলছ এ সব! শান্ত হও। তোমার যত সব বাজে ভাবনা।' ধীরে ধীরে স্থির হয় লুইসা। বলে:

'সত্যি রে আমার সব বুদ্ধি স্থদ্ধি লোপ পেয়েছে। কিছু মনে করিসনে, খোকা। কিন্তু বল্‌তো এমন কেন হচ্ছে?'

এতদিন প্রতিটি ক্ষণ কাজে ছিল ভ'রে। আজ সেই স্রোতটি কেমন ক'রে বন্ধ হ'লো, কেমন ক'রে সব শক্তি বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেল—কেমন করে অঙ্গে অঙ্গে নেমে এল তন্দ্রার জড়িমা, তা ওর নিজের কাছেই রহস্য। অবাক হয়ে যায়। ভারী অপমান বোধ হয়। ক্রিসতফ যেন সত্যটা দেখেও দেখছে না। যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবে বলে:

'কিছু হয়নি। সারা জীবন খেটেছ। একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ আর কি। দুদিনে সব ঠিক হ'য়ে যাবে দেখো।'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে ওর মা শক্তিময়ী, ভয়হীনা, আত্ম-নিবেদিতা, ধরিত্রীর মত নীরব বীর্যে জীবনের প্রতি পরীক্ষায় সম্মুখীনা। আজ ও অবাক হ'য়ে গেল; ভয় পেল। মেজেতে ছড়ান জিনিষগুলি ঝেড়ে ঝুড়ে মায়ের সাথে সাথে তুলতে লাগল। মা প্রতি মুহূর্তে একটা না একটা জিনিষ হাতে নিয়ে প্রস্তর-মূর্তির মত পলক-হীন চোখে চেয়ে বসে থাকেন। ক্রিসতফ অতি ধীরে সেটা হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দেয় না লুইসা।

ক্রিসতফ সেদিন থেকে মার কাছে আরো বেশী ক'রে থাকতে চেষ্টা করে। কাজ শেষ হলেই মার কাছে এসে বসে। আগের মত আর

নিজের নিরালা ঘরে গিয়ে ঢোকে না, যদিও নির্জনতা আজও ওকে আকর্ষণ করে তেমনি ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হ'য়ে। মার একাকীত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। বোঝে যে মার সইবার ক্ষমতা একেবারে শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে। অতএব এ অবস্থায় একলা থাকা নিরাপদ নয়।

সন্ধ্যের সময় খোলা জানালার ধারে মায়ের পাশে এসে ব'সে থাকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে ছবি পাল্টায় চোখের সামনে। পথ-চারীরা ঘরে ফেরে। দূরে ঘরে ঘরে আলো জ্ব'লে ওঠে। অজস্র-বারের দেখা ছবি···কিন্তু আর কদিনই বা···তারপর আর কোনদিন দেখবে না।

মাঝে মাঝে টুক্‌রো কথা চলে—সহজ স্বচ্ছন্দ সুরে। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি, নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। আজ তুচ্ছ নেই কিছু। প্রতিদিনের একই অনুবৃত্তি, কিন্তু উৎসাহটি নূতন। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চলে একটানা নীরবতা। কিন্তু হৃদয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে নীরবতা মুখর হ'য়ে ওঠে। কখনও বা লুইসা মনের কোণে হঠাৎ-ঝলসে ওঠা কোনদিনের বিচ্ছিন্ন এক কাহিনী ব'লে যায়। এতদিনে ও জেনেছে ওকে ভালোবাসে কেউ। এই বিশ্বাসে ও হয়েছে নির্ভয়। প্রিয়জনের সাথে একাত্মতার উপলব্ধিতে হয়েছে সহজ। তাই মর্মের কথা মুখে পেয়েছে ভাষা, যে ভাষাকে এতকাল চেষ্টা করেও খুঁজে পায়নি। পরিজন প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে আপনাকে আড়াল ক'রে ক'রে ওর এতকাল কেটেছে। ওই ছিল ওর অভ্যস্ত জীবন। স্বামী ছেলেদের ও দেখেছে নিজের থেকে অনেক বড় ক'রে। নিজকে অযোগ্য ভেবে দ্বিধায় রয়েছে দূরে। তাদের আলাপে আলাপনে যোগ দেয়নি। ক্রিসতফ যে এত ভালোবেসে এত কাছে এল, এতে ওর ভারী অবাক লাগছে, লাগছে ভালো, বল পাচ্ছে বুকে আর ভরসায় হৃদয় ভ'রে

উঠছে। কিন্তু আবার ভয়ও করে। কথা কইতে গিয়ে দ্বিধায় থেমে যায়। কতবার আধখানা কথা আধখানাই থেকে যায়। কখনও বা কিছু ব'লে ফেলে লজ্জিত হয়, ভয় পায়। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একখানি প্রিয় হাতের মৃদু চাপ এসে পড়ে ভীরু হাতখানির 'পর। অভিব্যক্ত আশ্বাসে আশ্বস্ত হয় লুইসা। মা হ'লেও শিশুর মত অসহায় এই মানুষটির 'পর করুণা আর ভালোবাসায় ক্রিসতফের হৃদয় কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। শৈশবে যার বুকে ওর পরম নির্ভয়ের আশ্রয় ছিল, আজ সেই মানুষই একদার আশ্রিতের কাছে আশ্রয় খুঁজছে। হায়রে ভাগ্য! একদার সেই স্থির গম্ভীর মানুষটির এই বাল-ভাষিত কারো ভালো লাগবে না, জানে ক্রিসতফ। জানে, ভালো লাগবে না তার নিতান্ত সাধারণ নিরানন্দ অতীতের এই অহেতুক রোমন্থন—মায়ের কাছে তা যতই বড় হোক। তাই মায়ের এই অবোধ-পনায় রয়েছে ওর বিষণ্ণ স্নেহের অভ্যর্থনা। কিন্তু তবু ভাবে—বিগতকে নিয়ে এমনিতরো ঘাঁটাঘাটিতে উঠবে তো কেবল বেদনারই পাঁক। মাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে; লুইসা বুঝতে পারে। দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরিয়ে বলে :

'ওরে আমার মুখ অমন ক'রে চাপিস্‌নি। আমার বুক ভেঙ্গে যায়। একটু বলতে দে, বলতে দে। একটু হালকা হোক। আর একটু বসি চল্, তারপর শুতে যাব দেখিস্।'

রাত গভীর হয়। প্রতিবেশ নিঝুম হয়ে আসে। মা ছেলে শুতে যায়—একজন বুকের বোঝা নামিয়ে, আর একজন নূতনতরো বেদনায় বুক ভ'রে।

আজের দিনটি মাত্র। সন্ধ্যার দ্বৈত আসর আজ দীর্ঘতর। কক্ষ-ভরা অন্ধকার। তার মাঝে ভাষা-হারা দুটী মানুষ আর তাদের মন্থর

হৃদ্-স্পন্দন। থেকে থেকে লুইসার অশ্রু-উদ্বেগ কণ্ঠ : 'ওরে ঠাকুরকে মানিস্, ঠাকুরকে মানিস্...।'

মায়ের মনটা উড়ছে আজ উল্টো হাওয়ায়। দিক্-হারাকে ঘরে ফেরাবার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে ওঠে ক্রিসতফ। কাজটা কঠিন। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে গৃহ-বদল-সম্বন্ধীয় আগামী কালের করণীয়গুলির দিকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হয়।

কিন্তু পন্থাটি তেমন কার্যকরী হ'লো না। শুতে সে যাবে না কিছুতে। অনেক কষ্টে ভুলিয়ে বিছানায় নিয়ে যাওয়া গেল। তারপর ক্রিসতফও চ'লে এল নিজের ঘরে। কিন্তু শুতে পারলে না। দাঁড়াল গিয়ে জানালার ধারে। মন্থর বিনিদ্র প্রহর। জানালা দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে বাইরে দৃষ্টি দিলে মেলে—অল্প দূরে প্রায় অন্ধকারে মিশে-থাকা নদীর সঞ্চরমানা ছায়া। শেষ বারের মত দেখে নেওয়া আজ। মীন্নার বাগানে উঁচু গাছগুলির পাতায় পাতায় হাওয়ার সন্‌সনানী—আকাশ কালোয় কালো—শূন্য পথ। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো। হাওয়া-যন্ত্রটা আর্তনাদ ক'রে উঠল মোচড় খেয়ে। পাশের বাড়ীতে কার যেন শিশু কেঁদে উঠল ..রাতখানি একটা বিরাট দৈত্যের ছায়ার মত ধরণীর বুকে চেপে আছে—চেপে আছে ক্রিসতফের আত্মার ওপরও। থম্ থম্ করছে নিস্তব্ধতা ; শান্-বাঁধান ছাদ আর পাথুরে রাস্তার উপর পড়া বৃষ্টি-ধারার শব্দ আর নির্দিষ্ট অন্তরে নিষ্প্রাণ ঔদাস্যে বেজে-ওঠা প্রহর-গোনা ঘণ্টার ধ্বনিতে যেন সেই অন্ধকারের কান্না মূর্ত হয়ে উঠল।

শীতে আড়ষ্ট হোলো ক্রিসতফের দেহ। হিমেল-হাওয়াটির পরশ লাগল ওর অন্তরেও। বিছানায় এল। নীচের ঘরেও জানালা বন্ধ হ'লো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল : দরিদ্রের কোথায় অতীত ? কোথায় কোন্ গৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সে রাখবে তার স্মৃতির ধনকে!

গৃহ নেই, মাটি নেই—এই বিরাট পৃথিবীর একটি কোণেও যার অধিকার নেই তার আনন্দ বেদনা, তার জীবন, তার দিবস-রজনী হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ নিরুদ্দেশে ভেসে বেড়ায়!

পরের দিন মুষল ধারে বৃষ্টি হ'ল, কিন্তু এর মধ্যেই যাত্রা শুরু। পুরানো আসবাব-ব্যবসায়ী ফিশার তার একখানি মাল-বওয়া গাড়ী দিল। সাহায্যও ক'রল নিজে এসে। নূতন বাড়ীর ঘর খুব ছোট। সব জিনিস ধরবে না। কতগুলি খুব পুরানো আর অব্যবহার্য জিনিস ফেলে দিতে হবে। কাজটা সহজ হ'লো না। কারণ এতটুকু একটা ভাঙ্গা-টুক্‌রোরও মূল্যটা হীন নয় যার কাছে—সমস্ত মূল্যের অতীত তার মূল্য! নড়বড়ে টেবিল, ভাঙা চেয়ার—সবার সাথেই নাড়ীর টান। জঁা মিচেলের সাথে পুরানো বন্ধুত্বের অধিকারে ফিশার ক্রিসতফকে সমর্থন করে। কিন্তু তার মায়ের ব্যথাও বুঝলো সে। তাই আশ্বাস দিল অকেজো হ'লেও এই মহামূল্য বস্তুগুলিকে সে রাখবে সযত্নে এবং লুইসা চাওয়া মাত্র হাজির ক'রে দেবে তার দরবারে। এই শর্তে রাজী হ'লো লুইসা।

বাসা-বদলের তারিখটা জানানো হয়েছে দু'ভাইকেই। আগের দিন রাতে আর্নেষ্ট এসে সুসংবাদ জানিয়ে গেল পরের দিন তার ভারী কাজ, অতএব তার আসা সম্ভব নয়। যাবার দিন দুপুরের দিকে রোডল্‌ফ দেখা দিল। ভারী ব্যস্ত ভাব। মাল বোঝাই হচ্ছে তখন। দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তারপর কিছু উপদেশ দিয়ে তেমনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

কর্দমাক্ত পিছল রাস্তা। ক্রিসতফ তারি মধ্যে ঘোড়ার লাগাম ধ'রে বেরিয়ে পড়ল। প্রতিপদে পা হড়কে যায় ঘোড়াটার। লুইসা ছেলের পাশে পাশে হাঁটে, তার মাথায় ছাতা ধ'রে।

নিরানন্দ পথ চলা। বেদনাময় গৃহ-প্রবেশ। ভেজা স্যাঁৎ-স্যাঁতে ঘরগুলোর ভিতরকার অন্ধকার বাইরের মেঘান্ধকারে কৃষ্ণতর। আরো ঘন আঁধার মা-ছেলের মনে। সপরিবার গৃহস্বামীর আন্তরিক অভ্যর্থনায় তার আঁধার খানিকটা কাটল। সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে গেছে। গাড়ী চ'লে গেল মাল ঢেলে দিয়ে—স্তূপাকৃতি হ'য়ে প'ড়ে রইল মেজেয় সব। লুইসা একটা বাক্সের ওপর ব'সল এসে। ছেলে বসলো একটা চট জুটিয়ে এনে। শ্রান্তিতে দুজনেই ভারী অবসন্ন। সিঁড়িতে ছোট্ট একটু কাশির শব্দ শোনা যায়। দরজায় আঘাত পড়ে। বৃদ্ধ অয়লার এসেছে। অসময়ে হানা দিয়ে ভারী লজ্জিত সে। ক্ষমা চাইলে বার বার ব্যগ্র মিনতিতে। সংকুচিত অনুরোধ—একত্র নৈশ-ভোজনের। উপলক্ষ্য—অতিথিদের শুভাগমনকে ঘরোয়া ভাবে একটু সম্বর্ধনা জানানো। আজ এত বড় দুঃখের দিনে উৎসব? লুইসা বেদনায় একেবারে দীর্ণ। ওর অনুভূতির যন্ত্রগুলি অবধি বিকল। আনন্দের ভার বইবার মতো ক্ষমতা অন্তরে বাহিরে নেই। নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে চাইল ও। ক্রিসতফও মায়েরই মত শ্রান্ত, এই সৌভ্রাত্রের নিমন্ত্রণ প্রলুব্ধ করে না ওকে। বৃদ্ধও ছাড়বে না। অবশেষে ক্রিসতফ ভাবলে এই প্রথম ঘর-ছাড়া সন্ধ্যাটির অন্ধকার নৈঃসঙ্গ মায়ের কাছে হবে দুর্বহ। তিনি আবার পুরাতনের পাঁক ঘাটতে বসবেন। তার চেয়ে এই ভালো।

গৃহস্বামী থাকেন নীচের তলায়। ঠিক এদের ঘরের নীচের ঘরখানায় সারা পরিবার একত্রিত হয়েছে। বৃদ্ধ, তার কন্যা, জামাতা, একটি নাতী ও একটি নাত্‌নী। এই নিয়ে সংসার। নাতী ও নাত্‌নী ক্রিসতফের চাইতে বয়সে ছোট। স্বাগতে সভা মুখর হয়ে উঠল,—ক্লান্ত হয়নি তো অতিথিরা? ঘর পছন্দ হয়েছে তো? দরকার আছে কিনা কোনো

কিছুর ? একসাথে অনেকগুলি প্রশ্ন অনেকগুলি অতি-সক্রিয় কলকণ্ঠে প্রচণ্ড ঝড়ের মত এসে পড়ল। ক্রিসতফ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এল স্যুপ, সবাই খাবার টেবিলে গিয়ে বসল—কিন্তু অতিথি সম্ভাষণের তুফান থামল না। গৃহ-স্বামীর কন্যা এমেলিয়া স্থানীয় যাবতীয় সমাচার লুইসার কাছে ঢেলে দিল এক নিশ্বাসে। আশপাশের নানা জায়গার ভৌগোলিক সংস্থান, বাড়ীখানির নানা সুবিধা, বাড়ীর লোকের জীবন-যাত্রা-প্রণালী, কখন গয়লা আসে, কখন এমেলিয়া ঘুম থেকে ওঠে, কি কি জিনিস পাওয়া যায়, বাজার দর কি—কিছু আর বাকী রইল না। লুইসা যেন তন্দ্রার ঘোরে। কিন্তু ভয়ানক আগ্রহ নিয়ে শুনছে এমনি ভাব জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তবু পদে পদে সত্যটা হয় প্রকট। অর্থাৎ লুইসা যে কিছুই শোনেনি, যাও বা শুনেছে কানের ওপর-স্তরের হাওয়া তা উড়ে গেছে এই কথাটা গোপন থাকে না। এতে এমেলিয়ার যে খুশি হয়নি তাও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার স্বরের ঝাঁঝে। তার গুরুমশায়ী বুদ্ধিটা জেগে উঠে আবার গোড়া থেকে শুরু করে।

বৃদ্ধ অয়লারের বৃত্তি ছিল 'কলমী'। তাই বৃত্তি হিসেবে সঙ্গীত বৃত্তি যে কত খাটো আর কত বিস্তর তার অসুবিধা, সেই কথাটাই বোঝাতে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্রিসতফের পাশে ব'সেছে এমেলিয়ার মেয়ে রোজা। শ্রীমতীর রসনা শুধু মুখরা নয়, কল্লোলিনী এবং খরবেগা। অবিরাম তার স্রোত। তাতে নিশ্বাস ফেলার ছেদ মাত্র পলকের। এবং সেই পলকটির পরই যেন বাঁধ-ভাঙা বেনো জল আছড়ে পড়ে। এদের মধ্যে ফোগেল লোকটি কিছু শান্ত। সে একদিকে ব'সে রান্না নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করছিল। ব্যাপারটা কানে যেতেই এমেলিয়া, অয়লার, রোজা সকলের বাক্য-স্রোতের মোড় মুহূর্তে ঘুরল ওই দিকে। উঠল সমস্যা—নুন বেশী, না কম। চলল তর্ক। জুটল সাক্ষী, আবার

ভাঙলো। এবং বহুক্ষণের লড়াইয়ের পরও সমস্যাটা ঝুলে রইল বিতণ্ডারই চৌহদ্দিতে। প্রতি কণ্ঠে আপন রুচি ও বুদ্ধির জয় জয়কার ও আর সকলের বুদ্ধির ধিক্কার। অতএব কারো মতের সাথে কারো মতের মিল হল না, সুতরাং সমস্যাটা ঘুর-পাক খেতে লাগল যত-মত-তত-পথের রাস্তায়। অবস্থা দেখে মনে হ'ল যুদ্ধ চলবে 'শেষ-বিচারের' দিন অবধি।

কিন্তু শেষের দিকে ঘরের আবহাওয়া বদলাল হঠাৎ প্রকৃতির আবহাওয়ার সপ্ত-গ্রামী চর্চায়। আবহাওয়া-চর্চা শেষ হ'তে না হ'তেই সমবেত সহর্ষ-কোলাহল-ডম্বরে উঠল দুর্ভাগা অতিথিদের প্রতি সমবেদনার ঝড়। দুধের বাছা ছেলেটার এমনি অদৃষ্ট! সোনার ছেলে তাই ...। সমবেদনার পরিধি ক্রমে অতিথিদের অতিক্রম ক'রে ছড়িয়ে পড়ল আপনাতে, এবং আপনাকে ছেড়ে প্রতিবেশী, পরবাসী, দেশী, ভিনদেশী, চেনা, অচেনায়। এই ব্যাপক দৃষ্টান্ত-বিচার থেকে সর্ব-বাদী সম্মত সিদ্ধান্ত হ'ল এই, যে ভালোরা চিরকালই দগ্ধ-ভাল। এবং মন্দের দলই সংসার-পথে চৌ-ঘুড়ী হাঁকিয়ে চলবার চিরস্থায়ী সনদ পেয়েছে। সুতরাং জীবনে সুখ আর থাকবে কেমন ক'রে। জীবন তো নয় বাজে জঞ্জালের আঁস্তাকুড়। ভোগ করবার বস্তু নয়, ভুগবার বস্তু। কিন্তু ভগবানের বিধান খণ্ডাবে কে! মানুষকে দুঃখ ভোগ করাবার জন্যই তিনি সংসারে পাঠিয়েছেন। অতএব বেঁচে থেকে তার ভোগ ভুগতেই হবে। ভগবানের ইচ্ছার খাতিরেই বেঁচে থাকা। নইলে এ কি আর সুখের বাঁচা! কোনদিন তাহলে সব যমের দুয়ারে...

ক্রিসতফ দেখলে ওর দর্শন আর এ বাড়ীর দর্শনে মিল আছে। সুতরাং বাড়ীর মালিকের ওপর শ্রদ্ধা হল। শ্রদ্ধা ক'রেই এদের অশ্রদ্ধেয় দিকটাকে ও রেখে দিল হিসেবের বাইরে।

আহার-পর্বের পর মাকে নিয়ে ওপরে যখন এল ঘরের মধ্যে তখন পুরোপুরি আসবাবের নৈরাজ্য ; দেহ আর মনে অসীম অবসাদ আর বিষাদ। কিন্তু একলা-বোধের সেই তীব্রতা আর নেই। চারদিকের কোলাহল আর অতিরিক্ত শ্রান্তিতে ঘুম এল না রাতে। শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল রাত্রির বুকের ধুক্‌ধুকানী—সারা বাড়ী কাঁপিয়ে রাস্তা দিয়ে ভারী ভারী গাড়ীর ছোটাছুটি, নীচের তলাকার ঘুমন্ত মানুষ-গুলির নিশ্বাসের ভারী একটানা শব্দ···। মনে হ'ল—নূতন প্রতিবেশীরা মানুষ ভালো ; অবিশ্যি ওদের অত্যন্ত-ক্লান্তিকর বাড়াবাড়িগুলো বাদ দিয়ে। অতএব সুখ এখানে না পাওয়া গেলেও স্বস্তির অভাব হবে না নিশ্চয়ই।

কখন যেন ঘুম এসে গেল, আবার ভোর না হতেই গোলমালে ভাঙ্গল আচমকা। নীচে কাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে···সিঁড়ি উঠান্ ধোয়া চলছে সশব্দ-সমারোহে ; সমান তালে তারি জল জোগাতে গিয়ে সবল হাতের প্রবল ঠেলায় পাম্পটি করুণ সুরে উঠছে ককিয়ে—ক্যাঁচ কোঁচ্···ক্যাঁচ্ কোঁচ্···।

জাস্টস অয়লার ছোট-খাট গড়নের মানুষ। চোখের দৃষ্টিতে করুণ অস্বস্তির ছায়ায়, মুখের মেচেতা আর কপালের গভীর রেখায় রেখায় বয়স লেখা। হাতের আঙ্গুলগুলি না-ছাঁটা দাড়ির অরণ্যে সান্ধ্য-ভ্রমণের স-আরাম মন্থরতায় সদা-সঞ্চরমান ; স্বভাবটি ঋজু এবং সৎ ; উদ্যম টগবগে ঘোড়ার মত। ক্রিসতফের পিতামহের সাথে খাতির ছিল। দুজনের মধ্যে মিলটি ছিল বহুজন-স্বীকৃত। একই যুগে জন্ম এবং একই আদর্শে মানুষ ; কিন্তু মিচেলের মত লোহার স্বাস্থ্যটি তার ছিল না ; অর্থাৎ অনেক বিষয়ে দুজনের আদর্শগত মিল ও মত-সাদৃশ্য থাকলেও মূলতঃ মানুষ দুটি ছিল একেবারে আলাদা। কারণ মানুষের

আসল পরিচয় তার মনোগঠনে, মনোগতে নয়। বুদ্ধির বিচারে মানুষে মানুষে বাস্তব অবাস্তব যত বিভেদই থাকনা কেন, আসল ভেদটা স্বাস্থ্যে। সবদিকেই বৃদ্ধ অয়লার ছিলেন স্বাস্থ্য-বঞ্চিত। জাঁ মিচেলের মত নীতি নীতি ক'রে তেমনি চীৎকার থাকলেও দু'জনের নীতি ছিল বিপরীত। অয়লারের না ছিল ঐ লোকটার মত সর্বংসহ পাকস্থলী আর জবরদস্ত ফুসফুস, না ছিল তার মত স্ফূর্তিতে উচ্ছল বলিষ্ঠতা। গোটা পরিবারটাই এবং পারিবারিক যা কিছু সবই যেন অত্যন্ত রকম ছোট ছাঁচে গড়া। চল্লিশ বছর সরকারী চাকুরীর পর অয়লার অবসর পেয়েছে। কিন্তু যাদের বেলাটা শেষ হয়েছে কিন্তু ভেতরটা মোটেই প্রস্তুত হয়নি এরকম লোকের ক্ষেত্রে যা হয়, কর্মহীন অবসর অয়লারের বুকের ওপর চে'পে রইল স্যাঁৎসেঁতে বাদলা সন্ধ্যার মত। খানিক স্বভাব-ধর্মে আর খানিকটা পেশার করুণ পরিণাম হিসেবে অয়লারের মেজাজটা ভারী খিটখিটে হ'য়ে প'ড়েছিল। সন্তানরা এ সম্পদের উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হয়নি।

জামাই ফোগেলও কেরাণী, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়; দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে, মাথা-জোড়া টাকে আর সোণার চশমায় চেহারাটি মোটের উপর মন্দ নয়। সর্বদাই অসুখ অসুখ ভাব। মাঝে মাঝে অবশ্য অসুখ ওর লেগে থাকতও; কিন্তু যে-সব অসুখ হয়েছে ব'লে ওর ধারণা ছিল অসুখ ওর তা নয়। আসলে ব্যাধি ও নয়, ওগুলো আধি; কলম-পেশার মত অফলা পেশার কল্যাণে মনটাই ব্যাধিগ্রস্ত; এবং বন্ধ ঘরে কেবল চেয়ারে-বসা কাজের পরিণামে দেহ ভগ্ন। তবু লোকটা পরিশ্রম করতে পারে। গুণ নেই এমন নয়;—শিক্ষা আছে, এমন কি কালচারও কিছুটা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিকতার কলে-পেষা অনাসৃষ্টি ও। অথবা আফিসের খোঁটায় বাঁধা, কেরাণীকুলের মত ও হাইপোকোনড্রিয়া রোগগ্রস্ত।

এমেলিয়া এদের কারো মত নয়। যেমনি জবরদস্ত তার দেহ, তেমনি জোরাল কণ্ঠ। সর্বদাই সে ছুটন্ত, ফুটন্ত ও ঘুরন্ত। স্বামীর বাতিকে ও এক কড়াও সহানুভূতি বাজে খরচ করেনা; বরঞ্চ এর জন্য বেচারীর প্রতি ওর তাড়নাটা নির্মম—কতক বা ওটা ওর স্বভাব ব'লে, কতক বা প্রয়োজনে। কিন্তু লক্ষ্য যিনি তিনি থাকেন নির্বিকার। কাজেই এক মুহূর্ত পরেই ব্যর্থ গর্জন অজানিতে বিগলিত হয় বর্ষণে। এবং তার পরের স্তরে, নিজের দগ্ধ অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য ক'রে বর্ষণ পরিণত হয় সখেদ বিলাপে ; কণ্ঠ ওঠে অপরাধীর কণ্ঠ ছাড়িয়ে। দেখা যায়, এই প্রক্রিয়া স্বামীকে সংশোধনের পক্ষে শুধু অচল হয়নি, বরঞ্চ ক্রিয়া হয়েছে বিপরীত। স্বভাবের ত্রুটিগুলো অষ্ট-প্রহর কচলানোর ফলে ওর মেজাজ হয়েছে তেঁতো, আর বাতিক গেছে দশগুণ বেড়ে। তা ছাড়া নিজের চ্যাচামেচিগুলি স্ত্রীর কণ্ঠের জোরালো প্রতিধ্বনিতে অনেক স্ফীত হয়ে যখন ফিরে এল, তার উৎকট চেহারাটা দেখে ও ভয় পেল ; এবং লোকটা ওই ভয়েই ভাঙ্গল। শুধু ফোগেলই নয়, এমেলিয়ার চিকিৎসায় ভাঙ্গলো আরো অনেকে। বাতিক ঘোচাতে গিয়ে বাতিক চাপলো এমেলিয়ার নিজের ঘাড়ে। ছেলে, মেয়ে, বাপ সকলেরই স্বাস্থ্য খুব ভালো কিন্তু এমেলিয়াকে অহরহ খেদ করতে দেখা যেতে লাগল। এবং বারংবার একই কথার জাবর কেটে কেটে যে শঙ্কা ছিল কল্পিত, তা দৃঢ় হল বাস্তবে। একটু ঠাণ্ডা পড়লে ভয়ে ওর মুখ কালো হয়ে ওঠে ; রাতে ঘুম হয় না দুশ্চিন্তায়। এমন কি সকলে চমৎকার ভালো থাকলেও ওর ভয়টা বর্তমানের রাস্তা না পেয়ে ছোটে ভবিষ্যতের দিকে এমনি উদ্বেগে, যেন এই ভালো থাকাটাই ভয়ানক রকম ভালো-না-থাকার পূর্ব-লক্ষণ। এমনি করে ওরা নিরন্তর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে ওরা খায়, দায়, ঘুমোয় ; জীবন-

যাত্রা নির্বাহ করে স্বাভাবিক ভাবে—কিন্তু স্বাভাবিক বিশ্রামের ফাঁক নেই জীবন-যাত্রায়। ওটা একেবারে কাজের ঠাস-বুনট। কাজ এমেলিয়ার বাতিক। এমনি সাংঘাতিক বাতিক যে অহর্নিশ ওপরে নীচে ছুটোছুটি করে, নিজে খেটে অপরকে খাটিয়ে কিছুতেই ওর তৃপ্তি হয় না। ওর কাজের ঘূর্ণীতে ঘুরপাক খেতে হয় সবাইকে এবং অবিশ্রান্ত চলছে আসবাবগুলোকে টেনে হিঁচড়ে এদিক থেকে ওদিক নেয়া আর ওদিক থেকে এদিক নেয়া, ধোয়া, মোছা, মাজা, ঘসা, পালিশ করা, আনা-গোনা, ধূপ-ধাপ, সিঁড়ির ক্যাঁচ-কোঁচ, চ্যাচামেচী ডাকাডাকি, গোলমাল, নড়া-চড়া, ঝাঁকানি, কাঁপুনি···। ওই ঘর্ঘরিত শাসন চক্রের তলায় নিরুপায় হয়ে বুক পেতে দিতে হয়েছে কচি ছেলে আর মেয়েটাকেও।

দেহ-সৌষ্ঠবের দিক থেকে সুদর্শন না হ'লেও লিওনার্ডকে প্রিয়দর্শন বলা চলে। তবে তার ব্যবহার কমনীয়ও নয় নমনীয়ও নয়। রোজা প্রিয়দর্শিনী নয় কিন্তু ওর মাথা ভরা চুলের রাশটি যেন ঢেউ খেলান সোনা ; আর বর্ণে এমনি উজ্জ্বল সজীবতা যে মুখখানি যেন তার আলোয় জ্বলে। কিন্তু নাকটা অশোভন রকম বড় ; মুখের মধ্যে ওটা একটা মূর্তিমান বেয়াদপী। ওটার জন্যই মুখখানাকে লাগে যেন কোন বোকা মেয়ের পান্‌সে ধ্যাব্‌ড়া মুখ। বাজ্‌ল চিত্রশালায় দেখা শিল্পী হোলবার্ণের আঁকা কুমারী মেয়ের ছবির মত লাগে ওকে ; হাত দুটি হাঁটুর ওপরে রেখে মাথা নীচু ক'রে তেমনি বসার ভঙ্গিটি : কাঁধের ওপর থমকে থাকা তেমনি একরাশ সোণালী ঢেউ : তেমনি বেমানান নাক। তবে ছবির মেয়ের মত নাকের বেয়াদপীতে রোজার দৃষ্টি এখনও বিব্রত হয়নি ; তার মুখর রসনাটিও সংযত হয়নি। কণ্ঠটি মধু-ঢালা নয়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অবিশ্রান্ত কথা কয়ে চলেছে, বিষয় বস্তুর অভাব নেই, উদ্যমে ভাটি

নেই। কিছু না কিছুর বিবৃতি চলছেই, কিন্তু এমনি তার রুদ্ধশ্বাস তাড়া—যেন সময়টা লগুড় বাগিয়ে পেছনে সর্বদাই ধাওয়া করছে। আরম্ভ করা বর্ণনা শেষ হয় না ; মুখের কথা মুখে থাকে, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই—যেন অহরহ কত কি ব্যাপার ঘ'টে ঘ'টে ওর সব কটা ইন্দ্রিয়কে রেখেছে ক্ষেপিয়ে। মায়ের তাড়ন, বাবার শাসনে কিছু হয় না। এমন কি মাঝে মাঝে বুড়ো অয়লারও হুংকার দিয়ে ওঠে। নাতনীর কথার তুবড়ীর ফাঁকে একটি কথা কওয়ারও' ফাঁক না পেয়ে বুড়ো হাঁপায়।

এদের দয়া, মায়া, নিয়ম-নিষ্ঠা সব গুণই আছে বটে। নেই কেবল চুপ করে থাকার গুণটি।

ক্রিসতফের মেজাজ পঞ্চম থেকে নিখাদে নেমেছে। ও এখন সইতে পারে। অসহিষ্ণু জেদী স্বভাবটার ওপর দুঃখ-দেবতা কোমল হাতটি বুলিয়ে দিয়েছেন। সমাজের তেতলার বাসিন্দাদের নির্বিকার ঔদাস্যকে ও দেখেছে, মজ্জায় মজ্জায় অনুভব ক'রেছে। আজ দেখছে একতলার বাসিন্দা সাধারণ মানুষগুলোকে। ওরা অসুন্দর, ওরা অশোভন ; চিত্ত প্রসন্ন হয় না ওদের দেখলে। কিন্তু ওরা পুরোপুরি সৎ—বাঁকা পথ ওদের জানাই নেই। আজও জীবনটা ওদের কাছে ভারী কঠিন তপ ; সেই তপশ্চরণ ওরা করে। ক্রিসতফের এতদিনকার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে এদের মূল্যের যে নিশানা পড়েছে, তা খাঁটি সোনার। ও বুঝেছে ওদের জীবনে আনন্দ নেই ব'লেই ওরা বলিষ্ঠ। অতএব ক্রিসতফ নিঃসংশয় হলো—এরা শুধু ভালো নয়, অতি ভালো। এই অতি-ভালোদের ভালো লাগা ওর কর্তব্য ; ওর দেহের জার্মান শোনিতের ধর্ম। কিন্তু জার্মান আদর্শবাদের মত ওর পথ এত সহজ হয়নি। চোখে যা ভালো লাগল না এমন সব কিছুকে দৃষ্টির

সামনে থেকে এড়িয়ে কেবল মতবাদটিকে নির্ঝঞ্ঝাটে অক্ষত-দেহে বাঁচিয়ে রেখে খুসি হয়ে থাকার মত ফাঁকির বুদ্ধি ওর ছিল না।

এবং এ জন্যই কঠোর ওর সত্যৈষণা। আর ওর নির্জ্জন মনে রয়েছে একটা গভীর নিষ্ঠা। এ নিষ্ঠার দানেই ওর প্রিয়জনকে দেখার চোখ দুটি হয়ে উঠেছে এমন স্বচ্ছ আর বিচার হয়েছে সমীক্ষায় কঠিন। সুতরাং ওর ক্ষেত্রে জার্মান-আদর্শের ফল ফলল বিপরীত। যতই ও নূতন সুহৃদদের ভালোবাসতে চাইলে হৃদয় দিয়ে ততই ওদের অশ্লাঘ্য দিকগুলি ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অল্প-দিনেই ওদের জীবন-ধারার রুচি-হীনতা ওকে বিরস ক'রে তুলল। ওরা অত্যন্ত খোলা-স্বভাবের মানুষ। নূতন মানুষের সামনেও ওরা রেখে ঢেকে চলতে পারলে না। অতএব যথা-নিয়মে এদের স্বভাবে যা ছিল অসহনীয় আর অবরণীয় তা হলো অবারিত; আর যা ছিল শ্লাঘনীয় তা হ'লো আবৃত। সুতরাং ক্রিসতফের অঙ্গীকার মিলাল অক্ষমতায়। মনকে চোখ রাঙ্গাল—ওরে অবিচার করলি…। এদের প্রথমকার যে-ছবি ওর মনের পটে ধরা আছে চেষ্টা ক'রলে তারও রং ফিরিয়ে নিতে। পণ ক'রলে যে-ঐশ্বর্যকে মূঢ়ের দল নিজেদের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছে অত কষ্ট করে ও তার উদ্ধার করবেই। হেয় যা তাকে প্রেয় করে তুলবে ও।

আলাপ জমাবার চেষ্টা করল অয়লারের সাথে। অয়লারও সেই আশায়ই ব'সে ছিল। লোকটার প্রতি ক্রিসতফের একটা গোপন টান আছে। ঠাকুর্দার মুখে অনেক তারিফ শুনেছে। বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে জাঁ মিচেল যে ওর চাইতেও বেশী ঠকেছে এ তথ্যটা ক্রিসতফের কাছে ধরা পড়তে দেরী হল না অয়লারকে দেখে। মিচেলের অনেক কাহিনী শোনায় বৃদ্ধ; কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও কেন জানি ওর মনে লাগে না। স্মৃতি

ঘেঁটে যা সংগ্রহ করে অয়লার, তা তত্ত্ব হলেও তথ্য নয়; যে ছবি আঁকে তা ছবি নয় রং-চটা ব্যঙ্গ-চিত্র। 'আরে, তোমার ঠাকুর্দাকে এ আমি হামেশা বলেছি ·· '-র প্রতিদিনের একঘেয়ে ভূমিকা। নিজে একদা যা বলেছিল অয়লার শুনেছে তাই শুধু; চাপা প'ড়ে গেছে যা অপর পক্ষও হয়ত একদা বা হামেশা বলেছিল।

হয়ত শুধু শ্রোতাই ছিল মিচেল। বন্ধুত্ব আত্ম-রঞ্জনীর একটা পারস্পরিক ব্যবস্থা মাত্র। অর্থাৎ পরস্পরের কাছে ফলাও ক'রে নিজের কথা বলার সুবিধা। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে ভালোবাসলেও মিচেল আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি। ওর মনের পরিধি ছিল ব্যাপক। কৌতূহল ওর সবখানে ও সবকিছুতে। ওর দুঃখ ওর বয়েসটা পনের ছেড়ে কেন একান্নর দিকে দৌড় মেরেছে, তাই তো নূতন জগতের নূতন আবিষ্কার, নূতন চিন্তা ধারার সাথে কাঁধ মিলিয়ে জোর কদমে পারছে না চলতে। কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার মূল উৎস—সেই নিত্য-নবীন জিজ্ঞাসাটি ওর ছিল—বয়সের আঘাতে যার মৃত্যু হয়নি, প্রতিদিন প্রতি প্রভাতে জন্ম নিয়েছে নূতন আলোয়। এই ঐশ্বর্যকে সৃষ্টিময় করে তোলার প্রতিভা মিচেলের ছিল না অবশ্য। তবু বহু প্রতিভাবান ওকে ঈর্ষা করেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আসল মানুষটার মৃত্যু ঘটে বিশ বা ত্রিশ বছরে; তারপরে যা বাকী থাকে তা আসলের নকল। বাকী দিনগুলো কেবল অনুকরণের। একদা সে বেঁচেছিল, সেদিন যে-গান গেয়েছিল, যে-কাজ করেছিল, বলেছিল যে-কথা, যেমন ক'রে ভালোবেসেছিল—শুধু তারি অনুকরণ···অন্ধ, যান্ত্রিক।

অয়লারও বেঁচেছিল একদিন—সুদীর্ঘকাল চ'লে গেছে তারপর। সেদিন সে ছিল নিতান্ত সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন, দীপ্তিহীন।

আজের তলানী-পড়া অয়লার তার থেকে আরো মিইয়ে গেছে।

নিজেরই একখানা ব্যঙ্গ-চিত্র যেন ও। ওর কৌতূহল নিজের পেশা ও পরিবারের চৌহদ্দীতে বাঁধা। সর্ব-বিষয়ের অভিমত ওর সুদূর যৌবনের দিনের ছাঁচে কাটা। ওর শিল্প-প্রীতি হিসেব করা ; মাত্র কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম উঠেছে ওর অনুমোদিত তালিকায়। সুযোগ পেলেই তালিকাটি মুখস্থ বলে যায় একই বাঁধা গৎএ এমনি ভঙ্গিতে যেন ওর তথ্যটার প্রামাণিকতা অবিসংবাদী। এই তালিকার বাইরে ওর জগতে আর কেউ 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। হাল আমলের কথা হলেই প্রসঙ্গান্তর এনে ওটাকে চাপা দেবার একটা উন্নাসিক চেষ্টা অয়লারের সর্বদাই থাকে। আর নিজকে সঙ্গীত-রসিক বলে সমাজে পরিচিত করার উদ্যমটাও সাড়ম্বর। ক্রিসতফকে প্রায়ই ফরমায়েশ করেন —'বাজাও দেখি বাপু, একখানা।' পিয়ানো বেজে উঠল—অমনি শুরু হল পিতা-পুত্রীর আলাপন। আলাপনের কণ্ঠ উঠল সঙ্গীতের ঝংকার ছাপিয়ে। সঙ্গীত যে অয়লারের পক্ষে মস্ত বড় প্রেরণা এতে সন্দেহ নেই। তবে তা সঙ্গীতে নয়, সঙ্গীত ছাড়া আর সব কিছুতে। সুর যদি বলো—কয়েকটি পুরানো সুর ছাড়া সুরই নেই ওদের হিসেব মত। এগুলোর কয়েকটা অবশ্য সত্যি উঁচু দরের। বাকীগুলোর কথা না বলাই ভালো। শুনবার মত করে অয়লার শুধু এগুলোই শোনে। প্রথম কলি বাজতেই একেবারে নেচে ওঠে। দুই চোখ যায় জলে ভ'রে। অশ্রু আনন্দের সন্দেহ নাই। কিন্তু আনন্দের মূলটি বর্তমানের এই মুহূর্তে নেই। ওটা ইতিহাসের তথ্য। একদা কোনোখানে এই গানটি শুনে আনন্দ হয়েছিল, আজের অশ্রু সেইদিনের সেই স্মৃতিরই দলিল। ফলে বীঠোফেন-এর য়্যাডিলেড্-এর মত দু' একটি সঙ্গীত ক্রিসতফের অত্যন্ত প্রিয় হলেও বৃদ্ধের তালিকাতে থাকাতে ও-গুলোও ওর ভয়ের বস্তু হয়ে উঠল। সূচিপত্র গুনগুনাতে

গুনগুনাতে বৃদ্ধ ভারিক্কী চালে টিপ্পনী করে : 'গান বলো তো এই ! যতই উঁচু দরের হোক আধুনিক সঙ্গীত মাত্রই অপাংক্তেয়...' 'আধুনিক গান আবার গান নাকি ও তো খুকুমনির ছড়া !'

ফোগেলের রুচি ও শিক্ষা আর একটু মার্জিত। আধুনিক শিল্প-ধারার সাথে কিছুটা যোগ রেখেছে—সে জন্য ওর গুমর আছে। এবং গুমরটা প্রকাশ হয় তাচ্ছিল্যে। কিন্তু ওর রুচিটি পেছন-মুখো। আধুনিকের স্বীকৃতি নেই ওর আধুনিকতায়। মোজার্ট, বীঠোফেন যদি জন্মাতেন একালে, ঠাঁই পেতেন না ফোগেলের দরবারে ; আবার ওয়াগ্‌নার, রিচার্ড স্ট্রস্‌ যদি একশ' বছর আগে জন্মাতেন, তবে প্রতিভা বলে পেতেন ওর হাতের বরমাল্য।

ফোগেলের নিজের জীবনটার তেমন সদ্ব্যয় হয়নি। সেজন্য অন্য সবার পর ওর ঈর্ষা আছে, সন্দেহও আছে। এবং ঠিক জেনে রেখেছে সংসারে সবাই ওর মত লক্ষ্মীছাড়ার দলে। এতে যারা সন্দেহ করে তারা হয় বোকা, নয় ভণ্ড। সুতরাং মনের ঈর্ষায় কিছুতে মানতে চায়না যে-কালে ফোগেল আছে ও থাকবে সে-কালে ওর চেয়ে বড় কারো থাকা সম্ভব। এই বিপরীত সম্ভাবনাটাও ওর বিস্বাদ লাগে।

এ কারণেই নূতন কোনো নামী মানুষের প্রসঙ্গ উঠলেই ওর মুখটা বাঁকা হ'য়ে ওঠে ব্যঙ্গে। কিন্তু ক্রিসতফের সম্বন্ধে খানিকটা দুর্বলতা আছে। তার প্রথম কারণ ক্রিসতফও মানুষকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখত না ; দ্বিতীয়তঃ, ওর মত সেও কেবল জীবনের মুখ-ভ্যাংচানীই দেখেছে ; তৃতীয়তঃ, ওর প্রতিভা নেই। এই যে 'না থাকা' এই হলো ক্ষুদ্রাত্মা মানুষের সব চেয়ে বড় নাড়ীর যোগ। ওদের দুঃখময় বিক্ষুব্ধ জীবনে পরস্পরের দৈন্যই ওদের সান্ত্বনা ; এর চেয়ে দৃঢ় মিলনের সূত্র আর নেই। এই যে অসুস্থ, ক্ষীণ-দৃষ্টি, ন্যুব্জ-দেহ জীবের দল, নিজেরা সুখী নয়

ব'লে অপরের সুখের স্বীকৃতি যাদের কাছে নেই—তাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ জীবন-বোধে উজ্জীবিত হয় সুস্থ মানব-সন্তানেরা, জীবনের পাত্রকে আনন্দ-রসে পূর্ণ করে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছে। ক্রিসতফ এ সত্য অনুভব করেছে। এর বিপরীত বুদ্ধির সাথেও ওর অপরিচয় নেই। কিন্তু কোগেলের মুখে সংকীর্ণ সুরটি কেমন যেন অশোভন লাগে। চেনা জিনিষটাকেও অচেনা লাগে। মনটা বিরস হয়ে যায়। এমেলিয়ার ধরণ-ধারণে ওর মনটা আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কর্তব্য ব্যাপারে এমেলিয়া আর ক্রিসতফ একই স্কুলের ছাত্র। কিন্তু এমেলিয়ার সব কিছুই কর্তব্যের লেবেল-মারা। কর্তব্য ওর অষ্ট-প্রহরের জপের মন্ত্র হয়ে, জীবনটা হয়েছে কর্তব্যের কংক্রীট ইমারত। সেখানে ছুটির ফাঁক নেই। নিজে বসতে জানে না ; সুতরাং অপরকেও বসতে দিতে চায় না। ওর কর্তব্যের গলি দিয়ে নিজের সুখের সাথে সাথে আর সকলের সুখ স্বস্তি দৌড় মেরে পালায়। এবং বিস্তর অসুবিধা, বিস্তর অস্বস্তি আমদানী হয়ে জীবনটা হয় জঞ্জাল। ওর শাস্ত্রমতে জীবনটা যখন জঞ্জাল হয় তখনই হয় তার শোধন। গার্হস্থ্যাশ্রমই এমেলিয়ার এক মাত্র ধর্মাশ্রম। একই দিনে একই সাথে কাঠের মেজেটাকে পালিশ করা, সিঁড়ি ধোয়া-মোছা, দরজার হাতল মাজা, গালিচা রোদে দিয়ে ঝেড়ে তোলা, চেয়ার-আলমারী টেবিল এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক করা—ইত্যাদি ওর ঐ ধর্মাচরণের প্রায় নিত্য ও নৈমিত্তিক অঙ্গ। কোনও কারণে কোনো একটা যেদিন ফাঁক পড়ল সেদিন ওর মনে হয় ও যেন নিজে ফাঁকা হয়ে গেল। এ যেন ওর চারিত্রিক মর্যাদার কষ্টি-পাথর। শুধু ওর নয়, মেয়ে জাতটারই অভিধানে মর্যাদার সংজ্ঞা ও তার রক্ষণ-পদ্ধতি ওই একই। যেন কাঠের আসবাব এ—সর্বদা সযত্নে পালিশ লাগিয়ে ঝক্‌মকে ক'রে

না রাখলেই ঘুন ধরল। অথবা অতি মসৃণ, হিম, কঠিন পাথরের মেজে—আনমনা হলেই পদস্খলন।

গার্হস্থ্যাশ্রমের অজস্র খুঁটিনাটি ঈশ্বর নিরূপিত ধর্ম বলে পূর্ণ নিষ্ঠায় এমেলিয়া ক'রে যায়। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে যতই নিষ্ঠাবতী হউন, শ্রীমতী ফোগেলের মেজাজ সেই অনুপাতে উদার নয়। ছুটির ফাঁক-খোঁজার দলকে ও ক্ষমা করে না। ওর হিসেবে ছুটিটা ফাঁক নয়—ফাঁকি, ওটা প্রত্যবায়ের সামিল।

কাজ করতে করতে লুইসার হাত থেমে যায় যখন তখন—ও সুদূর স্বপ্নে হারিয়ে যায়। এমেলিয়া আসে পদ্মবনে মত্ত-হস্তীর মত ওর স্বপ্নের জগতে। বুক ভেঙ্গে লুইসার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। লজ্জিত হাসি হেসে অত্যাচার শিরোধার্য ক'রে নেয়। সৌভাগ্য বশতঃ ক্রিসতফ জানে না এসব। কারণ ব্যাপারটা ঘটে ও বেরিয়ে যাবার পর। আর আক্রমণের লক্ষ্যও ও স্বয়ং নয়। এমেলিয়া সামনে থাকলেই ওর মনটা বিকল হয়ে যায়। দিবা-রাত্রি অশ্রান্ত কলরব ও ক্ষমা করতে পারে না। ও যেন পাগল হয়ে ওঠে। সামনের আঙ্গিনার দিকে খোলা ওর নীচু ঘরখানি ; আলো-বাতাসের এক মাত্র পথ একটি জানালা। তাও বন্ধ ক'রে ঘরখানাকে নির্বাত ক'রে রাখতে হয় গোলমালের ভয়ে। কিন্তু কোথায় পরিত্রাণ? নীচ থেকে একটুখানি শব্দ এল, তার ধাক্কায় আপনা থেকেই কান হল উচ্চকিত। চাও বা না চাও শুনতে হ'ল বাধ্য হ'য়ে। তারপর হয়তো একটি মুহূর্ত শান্ত, পরক্ষণেই প্রখর কণ্ঠ ফাটল যেন বিস্ফোরণে ; পাঁচিল ভেদ করে একেবারে ঘরের ভেতরে এসে আছড়ে পড়ল। রাগে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে, উদ্‌ভ্রান্তের মত মেজেতে পা আছড়ায় ; পাঁচিলে মুখ লাগিয়ে কুৎসিত গালাগালি করে।

নীচের হট্টগোলে এদিকে নজর পড়ে না কারো। সবাই ভাবে সুর-ভাঁজছে ক্রিসতফ। ক্রিসতফ পারলে ফোগেল-গৃহিণীকে নরকে নির্বাসন দিয়ে আসে। গুণবতীদের কণ্ঠের যদি এত গুণ তবে চুলোয় যাক—ও গুণ চায়না। চায় শুধু একটু শান্তি, একটু চুপ করে থাকা। বোকা, মূর্খ দুশ্চরিত্র যা খুশি হোক মুখটি বুজে থাকার গুণ থাকলেই মাথায় করে রাখবে সে মেয়েকে ও।

কোলাহল-বিমুখতাই ওকে লিওনার্ডের কাছে টেনে আনল। নিরন্তর ফুটন্ত অবস্থার মধ্যে ওই একটি মানুষ সর্বদা শান্ত অচঞ্চল। কথা বলে ধীর-অনুচ্চ কণ্ঠে, ধীর-বুদ্ধিতে প্রতিটি শব্দ নির্বাচন ক'রে, ওজন ক'রে, ধীর নিভুর্ল স্পষ্টতায় নিজের কথা বলে, কোথাও জড়তা থাকেনা। কোথাও কোনো তাড়া নাই। যেন অনন্ত ছুটির দেশের মানুষ। ওর চুইয়ে পড়া কথা দাঁড়িয়ে শোনবার অবকাশ বা সহিষ্ণুতা কাজের মানুষ এমেলিয়ার নেই। ওর এই মন্থরতায় পরিবারের সকলে ভারী বিরক্ত। কিন্তু যাকে লক্ষ্য ক'রে এত ক্ষিপ্ততা সে মানুষ নির্বিকার; তার শান্তি-ভঙ্গ হয় না; নিষ্ঠায় ফাটল ধরে না। ক্রিসতফ শোনে ছেলেটি ধর্মযাজক হবে; শুনে আকৃষ্ট হল। পরিচয় নিতে উদগ্রীব হল।

ধর্ম সম্বন্ধে ক্রিসতফের পরিস্থিতি নিজের কাছেই অনিশ্চিত। স্থির হ'য়ে আত্ম-জিজ্ঞাসার সময় ওর হয় নি। যথেষ্ট শিক্ষা নেই, আর জীবন-সংগ্রামে এমনি ব্যতিব্যস্ত যে মনটাকে বিশ্লেষণ ক'রে চিন্তাগুলোকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে এমন অবসর মেলে নি। ওর প্রবল আবেগ-ধর্মী স্বভাব ওকে কেবল এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে; বাস্তব থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে অখণ্ড শূন্যতায়। দুইয়ের কোথাও বিরোধ ঘটল কিনা তা নিয়ে কখনো ভাবতে বসেনি, প্রয়োজনও হয়নি। ভালো সময়ে ভগবান আছেন কি নেই সে প্রশ্নটা

রয়েছে অনাবশ্যক। অস্তিত্বটা মেনে নিতে আপত্তি ছিল না। দুঃখের দিনে ভগবানের কথা মনে এসেছে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ব'লে নয়। বিশ্বাস করলেও মানুষের দুঃখ বেদনার এত বড় দায়িত্ব ভগবানের ওপর চাপাতে পারত না ও। কিন্তু সংশয় ওর যাই থাক তা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায় নি। ধর্ম ওর রক্তে, অতএব বাইরে ধর্মকে মানা না মানা ওর ক্ষেত্রে বাহুল্য। ও বস্তু তো দুর্বলের, অক্ষমের, নুয়ে-পড়া আর ভেঙ্গে-পড়ার হাতিয়ার। তরু-শিশুর যেমন সূর্যের প্রত্যাশা তেমনি ক্ষীণের প্রত্যাশা বাঁধা ভগবানের দুয়ারে। জীবন যার ক্ষ'য়ে এল, জীবনের পরে তারই লোভ। কিন্তু আত্মায় যার স্বয়ং সবিতার অধিষ্ঠান বাইরের আলোক দিয়ে সে করবে কি?

ক্রিসতফ যদি সমাজের বাইরে একলা নিরালায় থাকত এত প্রশ্ন এসে জুটত না। কিন্তু সামাজিক দাবী অনেক সময়েই নাবালকের অবুঝ আব্দারের মত অর্থহীন। অর্থহীন ব'লে গাল দিলেও সামাজিক অধিকারের এলাকাটা এত আশ্চর্য রকমের বড় যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতে গেলেই হোঁচট খেতে হবে। কোনোমতে পরিত্রাণ নেই। আশ্চর্য! একটা সুস্থ বলিষ্ঠ মানুষ—যে প্রাণাবেগে, কর্মোদ্যমে, ভালোবাসায় একটা পরিপূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ—ভগবান আছেন কি নেই, সে সম্বন্ধে তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈলের মত চুলচেরা বিচার নিয়ে কেমন ক'রে সে বৃথা দিন কাটাবে। ঈশ্বর আছেন কি নেই সমস্যা তা নয়; সমস্যা হচ্ছে আছেন, এই কথাটিতেই বিশ্বাস নিয়ে। জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজন খুব; সে ভগবানে হোক অথবা তেত্রিশকোটি দেবতার কোন একটির ওপর হোক। হোক সে অন্য কিছু। একটা বিশ্বাসের অবলম্বন চাই-ই। এ-যে কত বড় প্রয়োজন, তা বোঝান কঠিন। আজও ক্রিসতফের এ প্রয়োজন ঘটেনি। খৃষ্টান হলেও যীশুখৃষ্টের কথা মনে এসেছে কদাচিৎ। খৃষ্টের প্রতি

ওর অনুরাগ নেই তা নয় ; যখন ভাবে অনুরাগে রাঙ্গিয়েই ভাবে ; কিন্তু আশ্চর্য ! ভাবে আর কোথায় ! এক এক সময় নিজের ওপরে রাগ হয় কেন যথেষ্ট ভাবছে না। অথচ সবাই খৃষ্টান ওরা। ঠাকুর্দা নিয়মিত বাইবেল পড়েছেন। ও নিজেও নিয়মিত প্রাতঃকালীন উপাসনায় যায়। অর্গান বাজায় সেখানে, এবং বাজায় নিষ্ঠা দিয়ে। কাজেই ও নিজেও তো গির্জার অনুগত সেবক। গির্জা থেকে ফিরে আসার পর যদি জিজ্ঞাসা কর, কি ভাবছিল ও এতক্ষণ—উত্তর খুঁজে পাবে না। বাইবেল ও পড়ে চিন্তা-ধারাকে সুসংহত করার জন্য ; প'ড়ে রস পায়, আনন্দ পায় যেমন পায় ধর্ম-গ্রন্থ ছাড়াও অন্য যে-কোন ভালো নূতন বইয়ে। যীশু খৃষ্টের মত বীঠোফেনও ওর চিত্তকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। রবিবার ও সেইন্ট ফ্লোরিয়ান গির্জায় অর্গান বাজাতে যায়—আকর্ষণটা উপাসনায় নয়—সঙ্গীতে। বাজাতে বাজাতে ও একেবারে আত্ম-হারা হয়ে যায়। মেণ্ডেলসনের চাইতে বাখ্-এর সঙ্গীতে ওর শ্রদ্ধা বেশী।

গির্জার কতগুলি অনুষ্ঠান ওকে অনুপ্রাণিত করে, অনুর্বচনীয় আনন্দের স্বাদ দেয়। কিন্তু কোন্ অনুরাগে ? ভগবান না সঙ্গীত ? হাসির ছলে একজন যাজক একদিন ওকে শুধিয়েছিল এ কথা ! ভাবেনি যে, ক্রিসতফ ব্যথা পাবে। অন্য কেউ হলে এমনতরো প্রশ্ন অবহেলার হাওয়ায় উড়ে যেত, মনের 'পরে কোনো আঁচড় কাটত না [নিজের মনকে জানে না ব'লে মাথা ঘামায় কজনই বা !] কিন্তু ক্রিসতফের সত্য হবার দায় যে বিষম। তাই ওর পদে পদে কুণ্ঠা। এবং সে কুণ্ঠার দংশন ক্ষণিক নয় ; অন্তরের মধ্যে একেবারে বাসা বাঁধা। নিজকে পীড়ন করতে লাগল : ছলনা করেছি…ছলনা করেছি…। আচ্ছা, ভগবানকে ও মানে ? না মানে না ? বিষম সমস্যা। বুদ্ধি বা বস্তুগত [অবসর আর জ্ঞানও চাই] এমন কোনও উপায় ওর হাতে নেই

যা দ্বারা নিজের হাতে এর সমাধান করে। কিন্তু এভাবে তো চলবে না, সমাধান চাই। মানে ক্রিসতফ? না মানে না? সত্যটা খুঁজে বের করতে হবেই। নইলে বলতে হবে এতবড় ব্যাপারে ও উদাসীন, আর নয় ও কপট। না—অসত্য ও হতে পারবে না।

ইচ্ছে হয়, আশপাশের মানুষগুলিকে একবার যাচাই ক'রে দেখে। ওপর থেকে মনে হয়, এরা চমৎকার আছে—সর্ব-বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয়, নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তারা কোথায় পেল এত নিশ্চয়তা? জানবার জন্য ক্রিসতফ পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় এর হদিস্ মিলবে? একটা স্পষ্ট উত্তর তো কেউ দেয় না! কেমন সব ফাঁকা-ফাঁকা ভাসা-ভাসা ধোঁয়াটে কথা! কেউ ভাবে, ছেলেটা পাগল, এ-ও আবার তর্কের বস্তু! বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। বড় বড় পণ্ডিতেরা অবধি চিরকাল ধরে যে-কথাটি নির্বিচারে মেনে এসেছে, এই অর্বাচীন ছেলেটা, যে ওদের পায়ের এক কণা ধূলোর যোগ্য নয়, কোন স্পর্ধায় হেঁকে বলছে, প্রমাণ দাও! ওরে দুঃসাহসী, চল্ না চলার পথের নিশানা ধরে! আসলে গুমর, গুমর! দুধের ছেলের এত বড়ো গুমর? যেন 'প্রমাণ চাই' বলে ওদেরই গায়ে প'ড়ে অপমান করেছে ক্রিসতফ। কারণ ভগবানে বিশ্বাস করে কি করে না সে কথাটা কি ওদেরই মন জানে? আঘাতটা তাই অনিশ্চিত স্থানের দুর্বলতায় গিয়ে বাজে। কেউ আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বলে: 'আরে মেনেই নাও না হে। ভারী দরকারী জিনিষ। খুব কাজে লাগবে দেখো!' ঘৃণায় অশ্রদ্ধায় চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

একদিন প্রশ্ন নিয়ে এল এক যাজকের কাছে। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরতে হল। এমন গুরুতর বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হ'ল না। কারণ দুই পক্ষের পদমর্যাদা অশোভন রকমের

অসমান। ভদ্রলোক অত্যন্ত ভদ্র এবং আলাপনের ভঙ্গিটি অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী ; কিন্তু তার মধ্যে ওই কথাটা ছিল সযত্ন ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত। এবং সেই হৃদয়-গ্রাহী ভঙ্গীতেই বুঝিয়ে দিলেন অসমের আলোচনায় প্রবল-পক্ষ-নির্দিষ্ট সীমা-রেখা মেনে চলাই বিধি। অন্যথায় ধৃষ্টতা-দোষ ঘটে। কিন্তু হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতায় সীমা-রক্ষা সম্ভব হয় না ক্রিসতফের পক্ষে ; আপন সংশয় নিবেদন করে সাহস ক'রে। পিঠ-চাপড়ান ভঙ্গিতে একটু হেসে কয়েকটি ল্যাটিন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে যান যাজক। এবং পরম দাক্ষিণ্যে প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়ে আসর পরিত্যাগ করেন। ক্রিসতফের মনে হল—লোকটা ওকে অপমান করে গেল। যে-শ্রেষ্ঠত্বে অভিমান নেই তা ওর শ্রদ্ধার বস্তু। আজ সেই শ্রদ্ধায় ঘা পড়ল—এবং আঘাতটি বাজল ওরই বুকে। আর কোন দিন যাবে না ও যাজকের কাছে। এই শেষ। বুদ্ধি ও পদাধিকারে ওরা ওর অনেক ওপরে এ তো জানা কথা। কিন্তু ধর্ম-জিজ্ঞাসায় ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রের, পদ, পদবী, বয়সের ভেদ নেই। ধর্মের দ্বারে সব সমান। সেখানে শুধু 'সত্যমেব জয়তে।'

সমবয়স্ক অথচ ভগবানে বিশ্বাস করে এমন একজনকে পেয়ে ও বেঁচে গেল। মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করে কেন, এইটুকুই কেবল ও জানতে চায়। লিওনার্ড তো নিজে বিশ্বাস করে, সুতরাং ভালো ক'রে যুক্তি দিয়ে নিশ্চয়ই বোঝাতে পারবে ওর বিশ্বাসের সূত্রটি কোথায়। ভরসা ক'রে সাগ্রহে ও এগিয়ে যায়। কিন্তু লিওনার্ড জবাব দেয় তার স্বাভাবিক সৌজন্যে, নিরাগ্রহ নির্লিপ্তিতে। বাড়ীতে নির্বিঘ্নে আলাপ করা চলে না বেশীক্ষণ, হয় এমেলিয়া, নয় অয়লার, কেউ না কেউ বাধা দেবেই এসে। ক্রিসতফ প্রস্তাব করে : 'চলো না, খাবার পর একদিন বেড়াতে বেড়াতে বাইরে যাওয়া যাক।' লিওনার্ড অলস মানুষ। হাঁটা, চলা, কথা কওয়া,

অর্থাৎ যাতে সামান্যতম পরিশ্রমও আছে, সবই ওর ভারী অপছন্দ। সুতরাং এড়াতে চাইলেও ভদ্রতায় বাধল, অস্বীকার করতে পারলে না।

আরম্ভ করতেই মুস্কিল। কথা বেধে গেল মুখে। এটা সেটা বাজে কথা দু' চারটের পর ক্রিসতফ ঝাঁপিয়ে পড়ল আসল বিষয়-বস্তুতে প্রায় নিষ্ঠুর আকস্মিকতায়। প্রশ্ন ক'রে বসল লিওনার্ড কি সত্যি যাজক হ'তে চায়। সত্যি ভালো লাগে এ বৃত্তি? লিওনার্ড হকচকিয়ে গেল। দুই চোখে ভারী অস্বস্তি ফুটে উঠল। ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুখের ভাব স্বাভাবিক, কোনো বিরূপত ই—আশ্বাস আছে বরঞ্চ। জবাব দিল :

'নিশ্চয়ই! এ আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়!'

'তাহলে সত্যি সুখী হয়েছ তুমি!' ক্রিসতফের স্বরে ঈর্ষার আভাস। লিওনার্ড আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। মনটা মুহূর্তে উদার হয়ে ওঠে। আগের ঔদাস্যের ভঙ্গিটি আগ্রহে জীবন্ত হয়ে ওঠে :

'তা আর বলতে: সুখী হয়েছি বৈকি!' মুখে প্রসন্নতার আভা।

'কেমন করে অমন সুখী হ'লে বলতে পার?' ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে।

উত্তর দেবার আগে লিওনার্ড বলে : 'চলো, সেণ্ট মার্টিনের গির্জায়। সিঁড়ির ওপর ভালো ক'রে আরাম ক'রে বসি আগে।'

ওখান থেকে পার্কের একেশিয়া ছাওয়া কোণটি দেখা যায়। তার ওদিকে শহর আর গ্রাম সান্ধ্য কুহেলীতে আধো-ঢাকা। পাহাড়ের নীচ দিয়ে বইছে রাইন নদী। এপাশে প্রাচীন পরিত্যক্ত সমাধি ভূমিটির প্রসুপ্ত স্তব্ধতা। কতকালের পুরানো ভুলে-যাওয়া কবর গুলিকে যেন শ্যাম-স্নেহে আচ্ছন্ন ক'রে ঘাস জন্মেছে উদার অজস্রতায়।

লিওনার্ড জবাব দিতে আরম্ভ করে, চোখে পরিতৃপ্তি জ্বল্ জ্বল্

করছে : 'জীবন থেকে পালিয়ে বেঁচেছি। আশ্রয়ের মত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি এবার। মানুষের পরম আশ্রয়—নিত্য কালের নিত্য ধাম।'

অমন একখানি আশ্রয় যদি ক্রিসতফ পেত, তো বেঁচে যেত। ওর ক্ষতগুলি এখনও সব কাঁচা। ঝর ঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। খানিকক্ষণ অন্ততঃ ভুলে থাকতে যদি পেত! পেত একটু বিশ্রাম—একটু আরাম! কিন্তু এই ব্যাকুলতার সাথে কোথায় একটু খাদ মিশে থাকে যেন।

'আচ্ছা এই যে সব ছেড়ে ছুড়ে এলে, এর জন্য কোন কষ্ট হয়নি? কোনো মূল্য দিতে হয়নি?' ক্রিসতফ বলে।

'মূল্য? কষ্ট? কিসের?' জবাব দেয় লিওনার্ড: 'দুঃখ, কষ্ট ছাড়া সংসারে আর আছেই বা কি ভাই, যে তাই ছেড়ে এসে দুঃখ করব!'

ক্রিসতফের দৃষ্টি লুটিয়ে পড়ে সন্ধ্যার রূপে রূপে: 'সবটাই কি দুঃখ! সবটাই কি কুশ্রী? সুন্দরও তো আছে'

'তা আছে; কিন্তু কতটুকুই বা!'

'যতটুকুই থাকুক, তাই যে আমার ঢের!'

'কিন্তু ভাই সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে দেখো না! সংসারে ভালো আর কতটুকু, মন্দই বেশী। সংসারের মধ্যে এর বেশী কি আর পাবে? খুব বেশী হলে না হয় না-ভালো-না-মন্দর মাঝামাঝি। কিন্তু সংসারের ওপারে—অনন্ত সুখ। অতএব আর কি বলবে বল!'

একেবারে চুল-চেরা হিসেব। কিন্তু এ হিসেব ক্রিসতফের মন বুঝল না। এমনি হিসেবে আঁটা জীবন! এ তো কৃপণের জীবন! এর চাইতে বড় দৈন্য আর আছে নাকি? 'না রে না—' চোখ রাঙ্গায় নিজের মনকে: 'বুঝছিস না·· এ হিসেব নয়, এ পরমার্থ তত্ত্ব!'

বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করে: 'মুহূর্তের জন্যও তোমায় ভোগের লোভ দেখাবে এমন সম্ভাবনা রইল না—'

'নেহাৎই বোকার মত কথা ব'ললে। অনাদি অনন্ত অমৃতের জীবন ফেলে ক্ষণিক সুখ কে চায়!'

'অনন্ত জীবন সম্বন্ধে তুমি একেবারে নিঃসংশয় দেখছি!'

'নিশ্চয়ই!'

তবু ক্রিসতফ প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলে। উন্মুখ আশায় প্রতীক্ষা করে হয়ত সব প্রশ্নের শেষে ওর জবাব মিলবে; লিওনার্ড বুঝিয়ে দিতে পারবে। ভগবান যে আছেন তার কি প্রমাণ পেলে সে! দেবে, নিশ্চয়ই, লিওনার্ড যুক্তির আলোয় ওর সংশয়ের আঁধার দেবে ছিন্ন ক'রে। তাই যদি সে পারে তবে ক্রিসতফও সর্বান্তঃকরণে এমনি সর্বত্যাগী হয়ে লিওনার্ডের হাত ধরে পথে বেরুবে পরমের সন্ধানে।

কিন্তু আশা পূর্ণ হয় না। লিওনার্ড তো শুধুই লিওনার্ড নয় এখন। স্বয়ং ভগবৎ-প্রতিনিধি। সেই অহংকারেই ক্রিসতফের সমস্যা ওর কাছে হাল্কা থেকে গেল; ভাবলে, ও তো ওপরকার জিনিষ। যুক্তির এক আঘাতেই সংশয়ীকে নির্বাক করে দেবে। ধর্মশাস্ত্র, বাইবেল থেকে খৃষ্টের অলৌকিক জীবনের পরমাশ্চর্য ঘটনাবলী নিয়ে তর্কগুলোকে শানিয়ে রাখলে। ক্রিসতফ মন দিয়ে কয়েক মিনিট শুনলে, তারপর ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে: 'প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ পাল্টা প্রশ্ন দিয়ে। আমার সমস্যা কোথায় তা তো তোমার কাছে জানতে চাইনি, চেয়েছি সমাধান।'

এমন প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। লিওনার্ডের মুখ কালো হয়ে উঠল। খুব ভালো করে বুঝতে পারলে, বাইরে নিশানা না পড়লেও ক্রিসতফের অন্তরাকাশে চলছে যে তুফান তাকে শাস্ত্র-বাক্যের ফাঁকা নজীরে তাকে ঠাণ্ডা করা যাবে না।

ওর বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যুক্তির নিরীখ চাই। অবহেলায় এও ভাবতে

চাইলে, ছোকরা এরই মধ্যে স্বাধীন-চিন্তকের ভূমিকায় নেমেছে (এটি মানতে চাইলে না, যে তার মধ্যেও নিষ্ঠা থাকা সম্ভব)। যাই হোক উৎসাহ নিবল না। নূতন-পড়া বিদ্যা দিয়ে স্কুলে-পড়া পুঁথির বিদ্যাকে ঝালিয়ে নিয়ে আর একবার আত্মার অমরত্ব আর ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কোমর বাঁধল পূর্ণ উদ্যমে।

ক্রিসতফ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনে। কঠিন মনঃ-সংযোগের আয়াসে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক বারে হয়না, বারে বারে ব্যাখ্যা করতে হয় লিওনার্ডকে। নিঃশব্দ উন্মুখতায় বুঝতে, যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে ক্রিসতফ ; হঠাৎ এক সময় একেবারে বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ে : 'ঠাট্টা···ঠাট্টা করছ ! সব ফাঁকী, বুজরুকী তোমাদের ধর্মের নামে। ওপর-পালিশ-করা কথার বেসাতী সাজিয়ে আসল ফাঁকি দিয়ে আওয়াজের চটকে মানুষ ভোলাবার ব্যবসা ধরেছ···ভাবছ আমায়ও ভোলাবে—'

লিওনার্ড ঘাবড়ে যায়—জ্ঞানের ভাণ্ডার ওই পুঁথিগুলোতে মিথ্যে কথা ! চোখে ধূলো দিয়েছেন লেখকেরা ? কখনও নয়, হতে পারে না। ক্রিসতফকে বোঝাতে চেষ্টা করে শান্ত ভাবে। ক্রিসতফ রেগে ঘাড় বাঁকিয়ে চীৎকার করে ওঠে :

'জালিয়াত, সব জালিয়াত—লেখা চাইনা—প্রমাণ চাই—নতুন প্রমাণ চাই—'

যারা জেগে ঘুময় তাদের যেমন জাগানো যায় না, তেমনি বুঝবে না বলে যারা পণ করেছে তাদের বোঝাবার চেষ্টা বৃথা। তার চেয়ে থাক, যাঁর কাজ তিনি করুন। তাঁর যদি দয়া হয়, অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বিশ্বাসের অমৃত আপনি ঝরবে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার সাধ্য মাথা তোলে ! আর কথার মধ্যে না গিয়ে লিওনার্ড শুধু বললে :

'থাক ভাই এ পর্যন্ত। আর তো রাস্তা দেখছিনে। তুমি যখন বুঝবেই না, তোমাকে বোঝায় কার সাধ্য! তার চেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। দেবার হলে তিনিই তোমায় আলো দেবেন। প্রাণ দিয়ে ভক্তি ক'রে প্রার্থনা কর, তাঁর দয়া চাও। বলো, বিশ্বাস দাও, প্রভু, বিশ্বাস দাও। তুমি যে সত্যি বিশ্বাস করতে চাইছ, সেই ইচ্ছেটাই তাঁকে জানানো চাই যে—'

'ইচ্ছা!' বিরস মনে ভাবে ক্রিসতফ: 'আমার ইচ্ছা! আমার ইচ্ছায় দুনিয়া চলবে! ভগবানের থাকাটা আমার ইচ্ছা বলে তিনি আছেন! তবে আমার ইচ্ছে বলেই থেমে যাক মৃত্যু! দেখি একবার—'

হায়রে, মিথ্যে নিয়ে খুশি হতে পারলে তো ভারী সহজ হয়ে যায় সব। আপন ইচ্ছের আলোয় পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যে ভারী আরামের! সাত-রঙা স্বপ্নের জাল বুনে বুনে ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে নির্ভাবনায় জীবন কাটানো—অমন অনায়াস আরামের শয্যায় শুয়ে কাটাতে ক্রিসতফ পারবে না।

লিওনার্ডকে যেন নেশায় পেয়েছে। ও বলেই চলে। মনের মত কথা পেয়ে ও মুখর হয়ে উঠেছে। ধর্ম নিয়ে কথা—এখানে ও নিঃশংক, আক্রমণের ভয় রাখে না। এ ওর নিরপেক্ষ ভূমি। একঘেয়ে কণ্ঠ আনন্দ আর পরিতৃপ্তিতে দানা বেঁধে ওঠে। ব্যাখ্যা ক'রে চলে ভগবদাশ্রিত জীবনের মাধুরীময় স্বরূপ। ওই পরম নিশ্চিত, পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আড়ালে ব'সে এই ক্লিষ্ট পৃথিবীর কোলাহল [বলতে গিয়ে লিওনার্ডের স্বর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে। কোলাহলকে ও ক্রিসতফের মতই ভয় করে] দুঃখ, বেদনা, ক্ষণভঙ্গুরতাকে মনে হয় বহুদূর, অসম্পর্কিত, অপরিচিত। এই পৃথিবীটার কথাই তখন শান্ত ও শান্তি-ভরা চিত্তে ভাবা যায়।

ক্রিসতফ শোনে—দেখে, ভগবানের বেনামায় আত্ম-কেন্দ্রিকতার নগ্ন আড়ম্বর। লিওনার্ড চকিতে বুঝে নেয়। বলে : 'ভাবছ বুঝি, কুঁড়ের মত বসে বসে কেবল জাবর কাটা! না হে না—প্রার্থনা যে কত শক্তি ধরে, কত জীবন্ত তা তুমি বুঝবে না। হাতে পায়ে হৈ হৈ করে কাজ যা ক'রবে, এক প্রার্থনায় তার চেয়ে ঢের বেশী হবে। ওতে বিদ্যুতের তেজ। প্রার্থনা সর্ব-কল্যাণের দ্বার; প্রার্থনার সূত্রেই তুমি সর্ব-ভূতের সাথে একাত্ম; প্রার্থনার মাধ্যমে মানব-জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ তুমি; তার যত বোঝা সব দু'হাতে তুলে নিয়ে বুকের কাছটিতে আনছ টেনে; তোমার শক্তি, তোমার প্রতিভা প্রার্থনারই প্রভাবে বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে। ওপরে ভগবান, নীচে এই ধূলোর সংসার। দুইএর মাঝখানের সেতু-বন্ধ হল প্রার্থনা।

উপচীয়মান বিরূপতা নিয়ে ক্রিসতফ শোনে, অবাক হয়। মনে হয়, লিওনার্ড-এর এ সন্ন্যাসীর বেশ বিষম ফাঁকি। সবাই এমনি ফাঁকির কারবারী এমন কথা ব'লে অবিচার করবে না ক্রিসতফ। তবে খাঁটি ত্যাগী কোথায় আর! জীবন থেকে এই পলায়ন কারো কারো ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা কঠিন বলে; কারো কারো বা নৈরাশ্যে: আবার কারো বা মরণের টানে। আবেগের উন্মাদনায় [উন্মাদনা কতক্ষণ?] যারা ঘর ছাড়ে তাদের সংখ্যা আরো কম। বেশীরভাগ মানুষই নিজকে নিয়ে এমনি ব্যস্ত, এবং স্বার্থের খোলসে এমনি হাত-পা গুটিয়ে আছে যে অপরের সুখ-দুঃখের কোনো স্পন্দন সেখানে পৌঁছোয় না। কিন্তু খাঁটি মানুষও আছে, আদর্শের এ অপমানে তাদের বুক ভেঙ্গে যায়।

লিওনার্ড ভারী খুশি। ভগবানে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে সেই মহিমাময় উচ্চতা থেকে দেখলে পৃথিবীকে যে কত সুন্দর আর কত সুসমঞ্জস দেখায়—তাই ব্যাখ্যা ক'রে চলল পরমোৎসাহে। নীচের

পৃথিবীতে কেবলই অন্ধকার, অন্যায় আর দুঃখ। কিন্তু সেই পৃথিবীকেই ওপর থেকে দেখো—কোথায় অন্ধকার! সবই আলোয় প্রদীপ্ত, প্রসন্ন, সুশৃংখল, সুসমঞ্জস বিশ্বনিয়মে বাঁধা। কোনো গ্রন্থি শিথিল নেই; একেবারে ঘড়ির মত নিরেট শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত।

অন্যমনস্কভাবে শোনে ক্রিসতফ। সংশয় হয়, লিওনার্ড কি বিশ্বাস করে সত্যি? না, বিশ্বাস করে ব'লে বিশ্বাস ক'রে রেখেছে? কিন্তু তবু ভাঙ্গলো না ওর নিজস্ব বিশ্বাস. শিথিল হলোনা বিশ্বাসের জন্য ওর আকুল আবেগ। সাধ্য কি, লিওনার্ডের মত সাধারণ মানুষ তার দুর্বল যুক্তি দ্বারা স্পর্শ করবে ওই মহামানস!

শহর ছেয়ে রাত্রির আঁধার নামে। ওদের চারপাশ সেই আঁধারে ডুবে যায়। কালো আকাশে লক্ষ তারার দীপ জলে ওঠে। নদীর বুক থেকে শুভ্র কুহেলীর জাল অন্ধকারকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরে ওঠে। সমাধি-স্থানটির গাছে গাছে ঝিঁঝিঁ পোকার একতান ঝংকার বেজে ওঠে। গির্জার ঘড়িতে প্রহর বাজে: এক...দুই...তিন...চার... পাঁচ...। প্রথম ধ্বনিটি সু-উচ্চ গম্ভীর ঘোষে, যেন দোসর-হীন রাতের পাখী আকাশকে হেঁকে উঠল 'রণং দেহি।' তারই সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে বাজল দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থটি মৃদুতর লয়ে। সর্বশেষ পঞ্চমটি গভীরতম সুরে গভীর ক'রে যেন অন্য ঘন্টাগুলোর ডাকের সাড়া দিলে। পাঁচটি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পরের সাথে মিশে এক হয়ে গেল।

গম্বুজগুলির নীচে উঠল এক বিরাট গুঞ্জন—যেন একটা মস্ত বড় মধুচক্রের লাখো মৌমাছিরা চঞ্চল হয়ে এক সাথে গুনগুনিয়ে উঠল। বাতাস থরো থরো কেঁপে উঠল; ক্রিসতফের বুক দুরু দুরু। নিশ্বাস বন্ধ করে ও শোনে...বিপুল বিশ্বের অগণিত বিচিত্র প্রাণীর বিভিন্ন বিচিত্র

ধ্বনিগুলি একসাথে মিশে গেছে এক অপরূপ অসীম সঙ্গীতের পারাবারে।

বড় বড় ওস্তাদের হাতের রচা সঙ্গীত কত তুচ্ছ এই সুর-সমুদ্রের কাছে। ছাঁচে-সাঁটা, মানুষের বুদ্ধির লেবেল-মারা, পোষ-মানা এই পৃথিবীটার পাশে সে এক উদ্দাম, উচ্ছল, বাধা-বন্ধ-হীন, একেবারে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ধ্বনির-রাজ্য, অখণ্ড, অসীম। ডুবে গেল ক্রিসতফ সে গভীরে।

গুঞ্জনটি ধীরে ধীরে থেমে গেল…থেমে গেল বাতাসের শিহরণ… ক্রিসতফের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল… চম্‌কে উঠে চারদিকে চাইল, কিছু বুঝতে পারল না কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। চিরদিনের চেনা পৃথিবী যেন হারিয়ে গেছে। ওর অন্তর বাহির সব ওলট পালট হয়ে গেল এক লহমায়। চারদিকে সব কিছুর রূপান্তর ঘটেছে…ভগবান কোথাও নেই…।

জীবনে বিশ্বাস যেমন আসে হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত, মহা-আকস্মিকের বিপুল আশীর্বাদের দান হয়ে, হারায়ও অনেক সময়েই তেমনি দ্বার-ভাঙা হঠাৎ-আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে; ক্ষতির বাহন না হয়ে তেমনি পরম লাভ তা, হঠাৎ আসে হঠাৎ চলে যায় —পেছনে আশীর্বাদ রেখে। কোন যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে ঠেকানো যায় না। মানুষ তার আপন জগতে হাসে, খেলে, কথা কয়, স্বপ্ন দেখে, বিশেষ কিছু আশা করে না। কিন্তু হঠাৎ এক টুকরো নীরবতা, ঘন্টার এতটুকু ক্ষীণ একটু ঠুন্ বা এমনিতরো অতি সামান্য কিছু একটাই কোথা থেকে সে জগৎকে একেবারে ভূমিসাৎ করে দিয়ে যায়—চারধারে জমে ওঠে কেবল ধ্বংস-স্তূপ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে একা, কোথাও কেউ নেই…কিছু নেই…যে-বিশ্বাসের ভূমিটিতে দাঁড়িয়ে-ছিল, তার আর কোনো চিহ্ন নেই…

ক্রিসতফ ভয় পেল…কি ঘটল, কেমন করে ঘটল, কিছুই বুঝতে পারল না…কেবল দেখলে ওর ভেতরে বান্‌-ডাকা মরা-গাঙ।

লিওনার্ড তখনও ব'লেই চলেছে—ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাকের চাইতে আরো একটানা একঘেয়ে স্বরে। ক্রিসতফ যেন বধির পাষাণ। রাত গভীর হল। থামল লিওনার্ড। বড় অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল ওর। মনে করিয়ে দিল, রাত হয়ে গেছে অনেক, ফিরতে হবে। সাড়া এল না ; লিওনার্ড হাত ধরল, ক্রিসতফ কেঁপে উঠল ; উদ্‌ভ্রান্ত বন্য দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'বাড়ী চলো, ক্রিসতফ।'

'চুলোয় যাও।' ক্রিসতফ চীৎকার ক'রে ওঠল। ভয় পেল লিওনার্ড। ডাকল: 'ক্রিসতফ, ক্রিসতফ! কি হ'লো ভাই! কি অপরাধ করেছি আমি!'

জ্ঞানের রাজ্যে ফিরে এল ক্রিসতফ। অনেকটা স্থির কণ্ঠে বলল:

'তাইতো। কি বলছি। না না চুলোয় নয়, চুলোয় নয়। ভগবানের কাছে যাও, ভগবানের কাছে।'

ক্রিসতফ একা…বড় একা। অসহ্য যাতনা। ও যেন পাগল হয়েছে। দুই হাত নিষ্ঠুরভাবে মোচড়াতে মোচড়াতে বিহ্বল দৃষ্টি আঁধার আকাশের দিকে মেলে দেয়। আর্ত কণ্ঠ রাত্রির বুকে আছড়ে পড়ে:

'ভগবান! ভগবান! কেন মানতে পারছিনে তুমি আছ! কেন এমন করে সমস্ত বিশ্বাস নিঃশেষে খোয়ালাম? কেন? কেন? কে বলে দেবে, কেন? একি হলো আমার…?'

ভাবতে পারা যায় লিওনার্ডের সাথে আজকের এই তর্কই ক্রিসতফের পরিবর্তনের মূল। কিন্তু ঘটনা দুটোকে তুলনা করলে বোঝা যাবে পরিবর্তনের গভীরতা ও গুরুত্বের কাছে এ কত দুর্বল, কত তুচ্ছ। এমেলিয়ার

দিনমান কোলাহলের কদর্যতা, এবং তার পারিবারিক সংকীর্ণ অমার্জিত পরিবেশে থেকে ও অতখানি সংশয়ী হয়েছে একথা যেমন বলতে পারিনে, তেমনি বলতে পারিনে ওই তুচ্ছ তর্কটাই এত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে। আসলে কারণটা আসেনি বাইরে থেকে। ওটা ছিল ভিতরেই। ওর নৈতিক জীবনে আলোড়ন একটা চলছিল ক'দিন থেকে। আজ কেবল উপলক্ষ্যগুলোকে হাতের কাছে পাওয়া গেছে। নইলে এত বড় অঘটন ঘটাবার সাধ্যি ছিল না ওই সামান্য কথার! কদিন থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল, অজানা, অচেনা কতগুলি ভয়ংকর কি যেন বুকের মধ্যে মাথা তুলছে। এই সংকটের সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার মত সাহস খুঁজে পাচ্ছিল না অন্তরে। সংকট! সত্যি সংকট! সংকটকে শিয়রে নিয়ে ক্রিসতফ যেন মোহগ্রস্ত হ'য়ে রইল; কেমন একটা জড়তা, একটা প্রবল নেশা, একটা তীব্র-বেদনা ওর সর্ব সত্তায় ছেয়ে গেল। স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে পড়ল লুটিয়ে।

চেতনার দিগবালে অকস্মাৎ নব-সবিতার উদয়-শিখার স্পর্শ লাগল। নূতন আলোয় চোখ মেলে দেখল···বিপুলা পৃথিবী···অগ্নিস্নাতা···প্রাণ-মদে দুর্বার···আদি-অন্তহীনা···স্বয়ং ভগবান কুক্ষিগত এ বিরাটের···

এক নিমেষে ক্রিসতফের পুরানো জীবনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

বাড়ীর মধ্যে যে মানুষটি এখনও ক্রিসতফের চোখে পড়েনি সে হচ্ছে রোজা।

রোজা সুন্দরী নয়। ও বিষয়ে ক্রিসতফের ওপরও সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে কোনো পক্ষপাতিত্ব হয়নি। তবু অপরের রূপ সম্বন্ধে ওর

বিচার ভারী কড়া। তরুণের দল স্বভাব-ধর্মেই কুরূপা মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার, যতদিন না তাদের পুরুষের মন ভোলাবার বয়সটা কাটে। তখন আর মোহের কাল নয়। বেশ শাদা চোখে, শান্ত দার্শনিক দৃষ্টিতে তাকান চলে। রোজার তেমন বিশেষ কোন গুণ নেই। বুদ্ধি আছে। কিন্তু মুশকিল ওর রসনাটি নিয়ে। ওই অতি সচল ক্ষুদে বস্তুটিই ক্রিসতফের ভয়ের কারণ। রোজাকে জানবার চেষ্টাও কখনও করেনি ক্রিসতফ। জানবার মত কিছু আছে বলে মনে হয়নি। কালে ভদ্রে এক আধবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছে। ঐ পর্যন্ত। যাই হোক রোজা মেয়ে ভালো। অনেকের চাইতে ভালো। মীনার চাইতে অনেক ভালো। ছলা-কলা নেই, দেমাক নেই। ওর চেহারাটা যে ভালো নয় এ খেয়ালটা হয়েছে ক্রিসতফ এ বাড়িতে আসার পর। আগে জানা থাকলেও এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আত্মীয়-স্বজনদের দীর্ঘ-নিশ্বাস কখনও পড়ে থাকবে বা, কিন্তু রোজা অবহেলার হাসি হেসেছে। কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে নেয়নি। হ'লই বা চেহারা খারাপ; কুৎসিত মেয়েদের কি আর বিয়ে হয় না; না ভালোবাসার লোক জোটে না। কত বেশী কুৎসিত মেয়েরও তো কত বন্ধু আছে। শারীরিক ত্রুটিকে জার্মানরা গ্রাহ্য করে না, ওদের চোখেই পড়ে না সে সব। পড়লেও লোকসান নেই। ওরা কল্পনার চোখে প্রিয়ার মুখে রূপের সাগর দেখতে জানে—জানে কল্পনার তুলিতে স্বপ্নের রং লাগিয়ে কুরূপকে অরূপ করে তোলার যাদু। অয়লার বুড়ো অবলীলায় ব'লে ফেলতে পারে তার নাতনীর নাকটি 'জুনো লুডোভিসির' মত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে অত মোলায়েম কথা সে বলতে জানে না এই রক্ষে। রোজা নাকের ব্যাপারে নির্বিকার। ওর এক মাত্র গুমোর, পবিত্র গার্হস্থ্য

কর্তব্য ও নিষ্ঠা দিয়ে করে এবং এ বিষয়ে ওর নিন্দে করার সাধ্য কারো নেই। গুমোরটা খাঁটি। কারণ, এ বিষয়ে ও যা শেখে—ভক্তিতে শিরোধার্য করে। কদাচিৎ বাইরে যায়, পরিবারের সবাইকে দেবতা ব'লে মানে এবং তাদের প্রতি বিশ্বাসটা ওর অকুণ্ঠ। আপন কে ও সহজে ছড়িয়ে দিতে পারে ; বিশ্বাস করে সহজে ; সহজে সন্তুষ্ট ; বাড়ীর নিত্য বাদলা আবহাওয়ার সাথে ওর তালটা ঠিক আছে। পারিবারিক আদর্শ ও নীতির পুরো ফিরিস্তি শ্রদ্ধা দিয়ে কণ্ঠস্থ করা। সর্বদা সবার জন্য ভাবে, সবাইকে খুশি করতে চেষ্টা করে, সবার দুঃখে অংশ নেয়, সবার প্রয়োজন বোঝে ইঙ্গিতমাত্রে—এমনি ওর সজাগ দৃষ্টি। একান্ত ক'রে ভালোবাসতে চায় প্রত্যাশা না রেখে। স্বভাবতঃই আত্মীয়ের দল এর সুযোগ নিয়ে থাকেন। অবিশ্যি তাদের দরদ নেই তা নয়। কিন্তু যে-মানুষ তোমার হাতের মুঠোয়, তার ভালোবাসা নিংড়ে নেবার লোভটা মানুষের রক্তে। ওটা আদিম। আত্মীয়েরা জানে ওর ভক্তি ও সেবা প্রতিদানে কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না। অতএব দেনা-পাওনার হিসেবটা হয় এক তরফা। ও যতই করুক তাদের দাবী বেড়ে চলে প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে। ওর স্বভাবটা কেমন এলোমেলো—সর্বদাই ব্যস্ত সমস্ত যেন কেউ ওকে অনবরত তাড়িয়ে চলেছে। চলনটা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে পুরুষালি চালে। মাঝে মাঝে ওর মনে অকারণ উচ্ছ্বাস দেখা যায়—যার পরিণতি অধিকাংশ স্থলে কোনো না কোনো অঘটনে ; ঝন্ ঝন্ কাঁচ ভাঙ্গলো, জগটা হাত থেকে পড়ে গেল, দরজাটাকে বন্ধ করল এমনি ধড়াস ক'রে যে বাড়ী শুদ্ধ কেঁপে উঠল। বাড়ীর সবাই মার-মুখো হয়ে ওঠে। বেচারা সর্বদাই গাল খায়, ধমকানী খায়। চুপ ক'রে এক কোণে গিয়ে কাঁদতে বসে। কিন্তু চোখের জল আর কতক্ষণ ?—হাসি-কান্নায় ও যেন শরতের আকাশ। কারো ওপরে ওর রাগ থাকে না।

ক্রিসতফদের এ বাড়ীতে আসা রোজার জীবনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্রিসতফের খ্যাতিটা শহরে ছড়ান এবং এখানেও বহুল আলোচিত। সুতরাং রোজা ওর কথা বিস্তর শুনেছে। বিশেষ ক'রে জাঁ মিচেল বেঁচে থাকতে নাতীর যশটা ফলাও ক'রে প্রচার করে গেছেন সব চেনা-মহলে। খুদে ওস্তাদটিকে দু'একটা জলসায় রোজাও দেখেছে। এত বড় বিখ্যাত মানুষটি এ বাড়ীর বাসিন্দা হয়ে আসছেন যখন শোনা গেল, আনন্দে নিজের বয়সের হিসেবটা ভুলে গিয়ে এমনি দু'হাত তুলে নাচল যে মা গর্জে উঠলেন। ও ঘাবড়ে গেল। ভেবেই পেল না কোনখান দিয়ে অসভ্যতা হল। অবশ্যি ভাড়াটে আসা—অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু রোজার একঘেয়ে জীবনে সাধারণটাই অসাধারণ। শেষের কটা দিন ওর কাটল উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ছট্ফট্ ক'রে। মাঝে মাঝে ভয় হ'ল, কি জানি শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা যদি ওদের অপছন্দ হয়ে যায়। প্রাণপণ-প্রসাধনে ঘরগুলোর চেহারা প্রায় অভিজাত হয়ে উঠল। ক্রিসতফদের আসবার দিন ভোর না হতেই এক গোছা ফুল এনে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর সাজিয়ে রাখলে স্বাগতের চিহ্ন হিসেবে, কিন্তু একবারও মনে হ'লোনা নিজের প্রসাধনের কথা। সুতরাং প্রথম দর্শনেই ক্রিসতফের মনে হল ওর চেহারাটার মধ্যে দর্শনীয় কিছু নেই এবং বেশ-বাসও যা দেখল তাতে ওর পাকা ধারনা হল মেয়েটা জংলী। ও কথা রোজাও ক্রিসতফের সম্বন্ধে বলতে পারত। কারণ সারাদিনের পরিশ্রমে ঘামে ময়লায় এবং বদলাবার সময় না হওয়ায় সকাল থেকে ওই একই পোষাক পরা ছিল। ফলতঃ ওটার যে দীন অবস্থা ক্রিসতফের কুৎসিত চেহারাটা তাতে আরও বেশী কুৎসিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রোজার মনে অন্যের সম্বন্ধে কোনো প্রতিকূল ভাবনা আসে না। সুতরাং ক্রিসতফ সম্বন্ধে ওর আশা-ভঙ্গ হ'লো না

কোনখান দিয়ে। ওর মনে-আঁকা ছবিটিই যেন মূর্তি ধ'রে সামনে এল এবং অভিনন্দিত হ'ল। খাবার টেবিলে ক্রিসতফের পাশে ব'সে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল রোজা। এবং লজ্জা ঢাকতে গেল কথা দিয়ে। বুঝলে না কত বড় দুর্ভাগ্যকে বহন করে আনল স্বহস্তে। যে অমনি কাছে আসে পারত তাকে দূর করল বাচালতা দিয়ে। কিন্তু সত্যটা ও জানতে পেল না। অতএব সন্ধ্যাটি হ'য়ে উঠল ওর কাছে অনুপম, আর স্মৃতির দেউলে তা রইল অনির্বাণ হয়ে জ্ব'লে।

খাবার পর সকলে ওপরে চ'লে গেল—ও নিজের ঘরে একলা ব'সে শুনতে লাগল নূতন ভাড়াটেদের চলা-ফেরার শব্দ; প্রতিটি শব্দ অন্তরে যেন বীণার ঝংকার হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল বাড়ীখানায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে।

পরের দিন সকালে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আজ এই প্রথম আপনাকে ও নিরীক্ষণ ক'রে দেখল। মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্ ক'রে উঠল। ওঁত-পাতা দুর্ভাগ্য দানবটা যে কত বড় চেতন মন না জানলেও অবচেতনে ধরা পড়েছে তা। মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতি অবয়ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ভাবতে চেষ্টা করল মুখখানা কেমন। মনটা বড় বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল এমনি করুণভাবে যেন বুকটা দীর্ণ হয়ে গেল। একটা সংকটের ছায়া যেন ও দেখতে পেয়েছে। ভাবলে খুব ভালো করে প্রসাধন করবে। কিন্তু সংস্কৃত প্রসাধনেও মামুলীত্বের ওপর এতটুকু রং লাগল না। বরঞ্চ স্বভাব-অপটুতায় প্রসাধন দাঁড়াল প্রহসনে; কুশ্রী চেহারাটা তার চিহ্ন বহন করে কদর্য হ'য়ে উঠল। হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবলে, যাক্‌গে ছাই, চেহারা দিয়ে না হ'লো, মমতা দিয়ে ও ভরে দেবে ক্রিসতফকে; ও কি জানে, শুভ ইচ্ছেটার মধ্যেও অশুভ ছিল প্রচ্ছন্ন!

সরল মনেই ওদের কাজে লাগতে চাইল। এবং সেই আগ্রহে রইল কাছে কাছে যাতে কাজের সময় থাকে হাতের কাছে। ওপরে নীচে ছুটোছুটি ক'রে নানান কাজ করে পরমোৎসাহে ; এটা ওটা হাজার জিনিষ এনে স্তূপ ক'রে কাজের বদলে অকাজ করে ; জোর করে লুইসার হাতের কাজ কেড়ে নেয়। আর সাথে সাথে চলে কথার ফোয়ারা, আকাশ-চমকানো হাসি আর চীৎকার। মা রাগ করে, চেঁচিয়ে ডেকে সারা হয়। মায়ের স্বর কানে গেলে মুহূর্তের জন্য হয়ত থামে। ক্রিসতফ মুখ কঠিন ক'রে থাকে। ও পণ করেছে চটবে না, নয়ত হাজারবার ধৈর্যচ্যুতি হত। দিন দুই কষ্টে সামলে রইল। তৃতীয় দিনে ঘরে দিল খিল এঁটে। রোজা ধাক্কা দিল, চেঁচামেচি করে ডাকল, তারপর ফিরে গেল হতাশ হ'য়ে। পরে এক সময় সামনা-সামনি হতে ক্রিসতফ অজুহাত দিল— ভয়ংকর কাজ ছিল, গোলমালে লোকসান হ'ত বিস্তর। রোজা নত মস্তকে বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইলে। অতটা এগিয়ে যাবার সাহস করেছিল ও নিতান্ত সরল হৃদয়ে, কোনো ছল কপটের ইশারায় নয়। কিন্তু হল উল্টো। ক্রিসতফ দূরে সরে গেল। এখন ও আর বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করে না ; মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রায় অসংযত। রোজা কথা বললে ইচ্ছে করেই শোনে না—মুখের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে প্রকাশ্য ভাবেই। রোজা বুঝতে পারে, কঠিন পণ করে—আর বাচালতা কিছুতেই নয়। বিকেল পর্যন্ত কাটে হয়ত ভালোভাবেই। কিন্তু স্বভাবকে সু-ভাব দিয়ে কতক্ষণ ঠেকানো সম্ভব ? বালির বাঁধ ভাঙ্গে— রোখা জল যেন আরও রুখে একেবারে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ে, বহুগুণ বেগে, বহুগুণিত কলকলে। কথার ভিড় পেছনের ঠেলা খেয়ে একের পিঠে আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মাঝ পথেই ক্রিসতফ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। রোজার রাগ হয় নিজের ওপর। এত বোকা ? এত খেলো !

এমন পাগলের মত কাজ কেমন ক'রে করে ? জংলী, জংলী, একেবারে জংলী। নিজের ত্রুটিগুলো অনেকগুণ স্ফীতাকার হয়ে চোখের সামনে এসে হাজির হয়। ইচ্ছে হয়, ওগুলোকে টেনে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দুই নিষ্ঠুর হাতে। হায়রে হায়, কোথায় পাবে অত শক্তি ! চেষ্টা করতে যায়। কিন্তু প্রথম প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যায়। ভেতরটা হায় হায় ক'রে ওঠে। হবে না···হবে না···কিছুতেই পারবো না···ভেঙ্গে গেছি··· একেবারে ভেঙ্গে গেছি আমি। পরক্ষণেই ভরসা ফিরে আসে···পারবো ···পারবো···আমি পারবো···।

এক শত্রুকে না হয় পারল, কিন্তু শত্রু তো আরো আছে। ও যে কুরূপ। এই শত্রুকে ঠেকাবে কোন আয়ুধে ? এ শত্রু যে ওর কত বড়ো শত্রু, তা কি ও জানতো ! বিনা-মেঘে বজ্র-পাতের মত সত্যটা সেদিন প্রকাশ হল আচম্বিতে। আরশীতে দেখছিল মুখ। নাকটাকে মনে হ'ল ভারী বেয়াড়া রকম বড়—গোটা মুখটা জুড়ে ওর বেদখলী স্বত্ব একেবারে কায়েমী। অবশ্চি এটা ওর অতিরঞ্জন। নাকটা ঠিক অত বড় নয়। শংকিত মনে জিনিষটার ছায়া প'ড়েছে আসলের দশ গুণ হয়ে। এই ছায়াটাই এখন ওর বাইরে মুখ দেখাবার পথ বন্ধ করার মত হলো। মনে হলো—মরিনে কেন ?

কিন্তু যৌবনের ঘর বাঁধা নিত্য-আশার প্রাঙ্গনে। সেখানে আলো-ছায়ার খেলা। তাই শেষ পর্যন্ত মনকে শাসাল চোখ লাল ক'রে—ভুল দেখেছিস তুই। নাকটা বড় নয়। বেশ মানানসই হয়ে ঠিক জায়গাটিতে বসে আছে। কখনও বা চোখে একটু রং লাগে, মনে হয় নাকটার গড়নটিও বেশ। অজান্তে কখনও স্বতঃ-প্রেরণায় চুল আঁচড়ায় কপাল ঢেকে ; উদ্দেশ্চ, মুখের অন্যান্য অবয়বের অসামঞ্জস্যগুলোকে আড়াল করবে। কাজটা কাঁচা হাতের হওয়ায় ফল হয় মুখ-

ভ্যাংচানোর মত। নেহাৎই ছেলেমানুষী বুদ্ধির কাজ। পুরুষের মন ভোলাবার শিক্ষিত-পটুত্বের নয়। কারণ পঞ্চশরের শায়ক তখনও লাগেনি ওর মনের আশে-পাশে। আপাততঃ ওর আকিঞ্চন সামান্য— একটু সৌহার্দ্য, একটু প্রীতি, দেখা হলে একটু সম্ভাষণ, দিনের শেষে প্রীতি-স্নিগ্ধ একটু শুভ-সন্ধ্যা জ্ঞাপন; এটুকু পেলেই ও পরিতৃপ্ত। কিন্তু ক্রিসতফ কৃপণ। এই সামান্য দানেও ওর কার্পণ্য। শুধু তাই নয়— ও যেন হিম-শিলার প্রতিমা। দর্শনেই রোজা আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। ক্রিসতফ ওকে কঠিন কথা বলেনি কখনও। কিন্তু হায়রে কপাল! কেমন ক'রে বোঝাবে কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর ওই কঠিন মুখের নীরব তিরস্কার। এর চাইতে কঠিন কথা যে অনেক ভালো, অনেক কোমল।

সেদিন সন্ধ্যায় পিয়ানো বাজাচ্ছিল ক্রিসতফ। গোলমাল থেকে দূরে সরে চিলে-কোঠায় নিয়েছে আশ্রয়। রোজা নীচে ব'সে শোনে। ওর হৃদয়ে দোলা লাগে। সঙ্গীতের রুচি খুব মার্জিত না হলেও সঙ্গীত ও ভালোবাসে। যতক্ষণ মা ঘরে ছিলেন সেলাইয়ের ওপর রইল ঝুঁকে। কিন্তু মন চলে গেল সেই চিলে-কোঠায়। মা যেন কোথায় বেড়াতে বেরুলেন। সেলাই ছুঁড়ে ফেলে চলল সিঁড়ি বেয়ে। দুরু দুরু বক্ষে চিলে-কোঠার দুয়ারে এসে দাঁড়াল। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে দিলে। এমনিতে ও চলে—চলে না দৌড়য়, যেন বিশ্বের তাড়া রয়েছে ওর পেছনে। পা কোথায় পড়ে তার হিসেব থাকে না; দু' তিন সিঁড়ি এক সাথে টপকে চলে। কিন্তু আজ এসেছে আঙ্গুলের ডগায় ভর ক'রে আল্‌তো পায়ে, নিঃশব্দে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে, কখন পা গেল হড়কে, দড়াম ক'রে মাথাটা ঠুকে গেল দরজায়। পিয়ানো স্তব্ধ হয়ে গেল। ও পালাবার পথ পেলে না। উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় দরজা খুলে গেল। ক্রিসতফ একটা অগ্নি-দৃষ্টি হেনে ছুটে

বেরিয়ে গেল প্রায় ওকে ধাক্কা দিয়ে। একটি কথা বললেনা, দুম্‌দাম ক'রে সেই যে নেমে গেল, ফিরল সেই খাবার সময়। টেবিলে এক জোড়া বেদনাতুর দৃষ্টিতে তখন নীরব মিনতি ঝরছে—'ওগো ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ…।' নিষ্ঠুর দেবতা ফিরে চাইলে না। ভঙ্গিটা এমন যেন হতভাগা মেয়েটা যে ওখানে আছে তা ও টের পায়নি। এর পর কয়েকটা সপ্তাহ পিয়ানো স্পর্শও করলে না। গোপনে নীরবে রোজার চোখে অশ্রু ঝরল…কিন্তু কেই বা তার হিসেব রাখে, আর কেই বা বোঝে! লক্ষ্যই করলে না কেউ ওর দিকে। দুর্ভাগা মেয়ের নীরব প্রার্থনা কেবল বাতাসে মেশে…। কিসের প্রার্থনা? ও নিজেই কি তা জানে কেন আর কিসের প্রার্থনা! কিইবা ও চায়; কেবল নিজের ব্যথার বোঝা একজন কারো কাছে হালকা করে দেয়া…

আজ ও নিঃসংশয় হ'লো ক্রিসতফ ওকে ঘৃণা করে।

তবু আশা জেগে থাকে। যদি একটু ফিরে তাকায় সে—কিইবা এমন বেশী চায় ও! সামান্য একটু আগ্রহ—ওর কথা শুনে অমন মুখ ফিরিয়ে না নিয়ে, একটু দাঁড়িয়ে শোনা; করমর্দনের সময় হাতের ছোঁওয়াটি আনুষ্ঠানিক না হয়ে সামান্য একটু বিশেষ হ'য়ে ওঠা। আর… আর তো কিছু নয়! কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মুখের কতগুলো বেফাঁস কথা রোজার কল্পনার পক্ষীরাজকে উড়িয়ে নিয়ে চলল উদ্দাম হাওয়ায়।

মাত্র ষোল বছরের ছেলে। কিন্তু অমন স্থির গম্ভীর, অমন কর্তব্যনিষ্ঠ ছেলের 'পর সকলেই আকৃষ্ট হল। তারা ওকে শ্রদ্ধা করে। ওর কোপন-স্বভাব, খামখেয়ালী ধরণ, মুখ গোমরা ক'রে একলা একলা থাকা কিছুই এ বাড়ীর সাথে বেমানান হয়নি। শ্রীমতী ফোগেলের মাপকাঠিতে গান গেয়ে, ছবি এঁকে বেড়ানো ওয়ালারা সব ভবঘুরে হ'লেও ওকে সে কিছু

বলেনা সাহস ক'রে। অন্যের ক্ষেত্রে অমন জানালার ধারে মূর্তির মত আকাশমুখো হ'য়ে সময় নষ্ট করাকে সে বরদাস্ত করত না। কিন্তু ক্রিসতফের কথা আলাদা, কারণ বেচারা উদয়াস্ত খাটে এ খবর ওরা জানে। এই অসামান্য দরদের গূঢ় কারণ আরও একটা আছে যার জন্য এ ছেলের মন জুগিয়ে চলা দরকার।

রোজা লক্ষ্য করেছে যখনই ও ক্রিসতফের সাথে কথা বলে, মা বাবার ব্যবহারটা অত্যন্ত রহস্যজনক হয়ে ওঠে। কি যেন কানাকানি করে তারা। প্রথমটা অত খেয়াল হয়নি। কিন্তু ক্রমশঃই জানি কেমন কেমন লাগে। কৌতূহল হয় জানতে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

সেদিন বিকেল বেলা একটা বেঞ্চিতে উঠে কাপড় শুকানর দড়ি গাছ থেকে খুলছিল রোজা। নামতে গেল ক্রিসতফের কাঁধে ভর দিয়ে। বাবা আর দাদু ওদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে পাইপ টানছিলেন। চোখে পড়ল, কি যেন ইশারা হ'লো চোখে চোখে। কানে গেল : 'চমৎকার মানাবে দুটিতে।' দাদু বলছেন। ফোগেল দেখলে মেয়ে কান পেতেছে। চোখের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলে বৃদ্ধকে এবং কথা ঢাকবার জন্য এত জোরে জোরে হুঁ হুঁ করতে লাগল যে গজ বিশেক দূর থেকে ওটাই বেশী ক'রে শোনা যেতে লাগল। ক্রিসতফ পেছন ফিরে ছিল। কাজেই ও দেখতে পায়নি কিছু। কিন্তু রোজা এমনি অভিভূত হয়ে গেল যে নামবার কথা মনে রইল না। এবং তারপর তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নামতে গিয়ে পাখানা বেকায়দায় পড়ে গেল মচ্‌কে। ক্রিসতফ ধ'রে না ফেললে পড়েই যেতো। এই আনাড়ীপনায় ভারী রেগে গিয়ে খুব গাল দিল। চোট্‌টা লেগেছিল বেশ ভালো ক'রে, কিন্তু কিছু বুঝতে দিলে না রোজা। নিজেই কি

বুঝলে! একটু আগে শোনা-কথা ক'টি সব ছাপিয়ে, সব ব্যথা ভুলিয়ে মনটা জুড়ে ওলট্ পালট্ হতে লাগল। ভেতরে এল হেঁটেই। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ব্যথা টন্ টন্ ক'রে উঠল। কিন্তু ও কঠিন হ'লো, পায়ের ব্যথাকে মুখে ফুটতে দেবে না। সম্পূর্ণ অচেনা অথচ বড়ো মধুর একটা অস্বস্তি উদ্বেল হ'য়ে ওকে বিহ্বল করে দিলে। খাটের পাশের চেয়ারটায় লুটিয়ে প'ড়ে বিছানার চাদরে মুখ ঢাকল। দুই গালের রক্তে আগুন জ্বলছে, চোখ ভরেছে জলে। ও হেসে উঠল। ভারী লজ্জা করতে লাগল—মাটি, দ্বিধা হও তুমি, ঢেকে দাও আমার লজ্জা তোমার অন্ধকারে…। ঘূর্ণি হাওয়ার ঝাপটা এসে সমস্ত চিন্তাগুলোকে যেন এলো-মেলো ক'রে ছড়িয়ে ছত্রখান ক'রে দিয়ে গেল। রক্ত প্রবাহ হ'লো আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত লাভা, পায়ে অসহ্য বেদনা—প্রবল জ্বর যেন ধীরে ধীরে ওকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।…রাস্তায় শিশুর দল খেলা করে, তাদের কল-কাকলীর রেশ ধোঁয়াটে হয়ে কানে আসে--সব ছাপিয়ে দুই কানের মধ্যে আর বুক জুড়ে গুনগুনিয়ে ফিরতে লাগল দাদুর মুখের কথা—শুধু মুখের কথা নয়, আনন্দের বাণী : ওর সত্তা জুড়ে তার উদ্ঘোষণা—বক্ষের দোলায়, হিল্লোলিত শোণিতে, গুঞ্জরিত সংবেদনে…

মুখে স্মিত হাসির আভা ফুটল…

আচ্ছাদনের একান্তেও সরমের রাগে রাঙ্গা হ'য়ে উঠল কপোল। ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতায় রোজা প্রণত হলো…

কামনায় বুক ভরল…

শংকায় বুক দুলল…

রোজা ভালোবাসল…

মার ডাক কানে আসে। উঠতে চেষ্টা করে রোজা। তীব্র বেদনা চেতনা হরণ করতে চায়। মাথা ঘুরে ওঠে। ভয় হল, বুঝি

আর বাঁচবে না। হোক তাই হোক্—মরণ আস্থক। না—না—মরতে পারবে না—। বাঁচবে···বাঁচবে···একখানি সম্ভাবিত স্থখের আশায় ওকে বাঁচতে হবে···। সমস্ত সত্তা আকূতি হয়ে উর্ধ্বে ওঠে···। মা ঘরে আসেন নিজেই। এবং মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়ী টগবগ ক'রে ফুটতে আরম্ভ করে। যথারীতি গালিবর্ষণ, তারপর ব্যাণ্ডেজ, তারপর শয্যা।

অপরূপ রাত্রির নিবিড়ে বেদনা আর চিত্তের অরূপ প্রসাদে মিলে যে আবেশ সৃষ্টি হলো তার বুঝি তুলনা নেই। প্রিয় সন্ধ্যাখানির ক্ষুদ্র স্মৃতি এক পূত জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে চিত্ত ভরে দিল। আজ কোনো চিন্তার তরঙ্গ নেই···এমন কি প্রিয়-ধ্যানও নেই···চিত্ত শুধু নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত আনন্দ-বিস্তার···জ্যোতিষ্কের মত শুধু এই কথাটিই জ্বলছে সে আকাশে···আমি স্থখী।

পরের দিন ক্রিসতফ এল সংবাদ নিতে। ও ভেবেছে অপরাধ ওরই। কথায় তাই মমতার স্থর।

রোজা ভাবে, পা ভাঙ্গার ছলে এল ভগবানের আশীর্বাদ। অতবড় আশীর্বাদ যে নিয়ে এল, ধন্য—ধন্য সে। ধন্য হোক দুঃখ, যদি এমনি স্থখের মূল্য তার।

বেশ কিছু দিন ওকে শুয়ে থাকতে হ'ল। এবং এই পূর্ণ অবসর জুড়ে মাতামহের ইঙ্গিতটি অন্তরের মধ্যে তোলপাড় হ'তে থাকল। কি যেন বলেছিল বুড়ো? ওরা দু'টিতে বেশ মানাবে? না, বেশ মানাতো? মানাবে? না মানাতো? কোনটা ঠিক? কি বলেছিলেন দাদু? হয়ত কিছুই বলেননি। না বলেছেন বই কি! নিশ্চয়ই বলেছেন। ঠিক শুনেছে ও···কিন্তু···ওঁরা তো জানেন ওঁদের মেয়ে কুৎসিত। এই কুৎসিত মুখটার দিকে ঘৃণায় ক্রিসতফ তাকায়ও না, একি জানে না ওরা!···আবার আশা···আবার কুহক···

না, কোথায় তেমন কুৎসিত! নিজেরই চোখের আর মনের ভুল।

সামনের দেয়ালে আরশী ঝোলে। উঠে বসলো তার সামনে। সুন্দর? না কুৎসিত!…কি? জানে না…বুঝতে পারছে না। চেহারা যেমনই হোক, বাবা আর দাদু তো বোকা নন, অন্ধও নন। তাঁরা ওর থেকে ঢের ঢের ভালো বোঝেন। নিজের সম্বন্ধে নিজে কি সব ঠিক বোঝা যায়! কেউ পারে না। হায় ভগবান…একটুখানি…এতটুকু সুন্দর হ'লো না কেন? আচ্ছা, সত্যি কি ওর চেহারাটা খুব বেশী কুৎসিত? মিথ্যে ভাবছে না তো! হয়তো যতটা ভাবছে ও ততটা বিরূপ ক্রিসতফ নয়। ও সুন্দর হোক, কুৎসিত হোক, ক্রিসতফের অবশ্যি কিছু যায় আসে না। সে তো ওর সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। ও প'ড়ে যাবার পরদিনই যা একটু দরদ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু কই, তারপর কতদিনের মধ্যে খোঁজও নিলেনা একবার। ভুলে গেছে হয়তো। না, না…ভোলেনি, ভুলতে পারে না। রোজা নিজেই ক্রিসতফের পক্ষ সমর্থন করে। ভোলেনি। আসল কথা বেচারার সময় নেই। কখনই বা ভাববে! শিল্পীরা কি সাধারণ মানুষ! ওদের কতো কাজ।

ফল-নিরপেক্ষ হয়ে ভবিতব্যের হাতে আপনাকে নিবেদন ক'রে দিয়েছে রোজা। কিন্তু তবু পথ চেয়ে থাকা, তবু সে কাছে এলে দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা…একটু সম্ভাষণের…একটুখানি কথার…একটু তাকিয়ে দেখার…। তারপর আছে রোজা, আর আছে তার বল্গা-ছেঁড়া কল্পনার পক্ষীরাজ…।

প্রথমাবস্থায় প্রেম 'আপনাতে আপনি বিকশে'। তাকে পুষ্ট করার জন্য উপকরণের প্রয়োজন হয়না। আধো-নয়নে একটু বা তাকান,

চলতে চলতে একটু বা ছুঁয়ে যাওয়া···এমনি তার যাদু যে কল্পনার সাতরঙ্গা ঘোড়াটা অমনি আকাশ-পাথারে ডানা মেলে ঝড়ের বেগে। তারি সাতরঙ্গা জৌলুশের রাগ মনের মধ্যে হ'য়ে ওঠে অনুরাগ ; আর সামান্য একটুকুকে উপলক্ষ্য ক'রে ডোবে আনন্দ-সাগরে। তারপর দিন যায়, যখন ধীরে ধীরে না-পাওয়ার আকৃতি মেলায় পাওয়ার পরিসমাপ্তিতে, দাবী আদায়ের মুষ্টি হয় কঠিনতর, এবং ক্রমে সাধনার ধনটিকে পাওয়া যায় একেবারে বুকের কাছে ; তখন চেষ্টা ক'রেও আর সে হিল্লোলিত আনন্দখানিকে পাওয়া যায় না।

রোজা নিজের মনের মত ক'রে তার রোম্যান্সের জগৎ রচনা ক'রে নিলে। এবং কখন যে সবার মাঝখান থেকে সরে এসে আশ্রয় নিলে তারি একান্তে, সে খবর কেউ রাখলে না। নিভৃতে বসে তুলিতে স্বপ্নের রং লাগিয়ে লাগিয়ে আঁকতে লাগল ছবি—ক্রিসতফ ওকে ভালোবাসে ; কিন্তু লজ্জায় অথবা অন্য কোনো কারণে তা রয়েছে গোপন, অন্তরের নিভৃতে। 'অন্য কোনো কারণ'-গুলোকে ও নিজের মনে ভাঙ্গে আর গড়ে সম্ভব আর অসম্ভবের মশলায়। ওপক্ষের সমর্থনে কখনও বা কারণের নামে আসে রোম্যান্সে রাঙ্গানো কতগুলো অকারণই। এতেও ওর আনন্দ। ও জানে এ ওর খেলা, অত্যন্ত ছেলেমানুষী খেলা। কিন্তু এই জানাটাকেই ও চোখ লাল ক'রে ধমকে মনকে চেঁচিয়ে বলতে চায় 'আমি জানিনে, জানিনে।' ঘাড় হেঁট ক'রে সেলাইএর ওপর স্ূঁচ চালায় আর মিথ্যের জাল বোনে দিনের পর দিন। তারি ব্যস্ততায় ও যেন কথা কইতেই ভুলে গেল। নদী যেন অকস্মাৎ অন্তঃসলিলা হ'ল। এবং মাটির বুকে তার প্রতিশোধের ব্যত্যয় হলোনা। ওর অন্তরের অজস্র ভাষাহীন কথা আর নিজেরই সাথে অহর্নিশ অনুচ্চার আলাপন ও ছাড়া আর কেউ শুনলেনা ; কেবল তার আকূতিতে ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে

নড়তে লাগল যেন কি'একটা ভালো ক'রে বুঝবার জন্য অক্ষর গুলো একটা একটা ক'রে বানান করে পড়ছে।

তারপর এক সময় স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। সুখ আর বিষাদের আলো-ছায়ায় চিত্ত আলিম্পিত হ'ল। বাস্তব জগৎটা পরিশ্রুত চোখে ধরা দিল। বুঝলে একটু আগে যে-সব ছবি এঁকেছিল তার রং কাঁচা। কিন্তু চোখের রং ঘুচলেও মনের মধ্যে তার প্রতিফলিত রেশটি ঘুচল না। এবং নিজের জীবন সম্বন্ধে আশ্বাসটা হ'লো বিশ্বাসে দৃঢ়তর।

পণ করলে ক্রিসতফের হৃদয় জয় করবেই। সাধনা শুরু হলো। কিন্তু কথাটা নিজের কাছ থেকেও গোপন রাখতে চাইলে। গভীর প্রেম হ'তে যে সহজ বুদ্ধির জন্ম তাই প্রেমকে পথ দেখায়; তারি ইঙ্গিতে ও একেবারে সোজাসুজি এসে প্রেম-পাত্রের সামনে হাজির হ'লো না। ভালো হ'য়ে হাঁটতে আরম্ভ করেই ও লুইসার দরবারে গিয়ে ভিড়ল সামান্যতম অজুহাতকে অবলম্বন ক'রে। হাজার অবকাশ জুটিয়ে এনে লুইসাকে সাহায্য করে; নিজে বাইরে গেলে সেই সাথে তার কাজও সেরে আসে; দোকান-বাজার করে—দরদস্তুর করার ঝকমারী থেকে লুইসা বাঁচে; পাম্প থেকে জল তুলে এনে ঘর পুছে দেয়, জানলা-দরজা ঝাড়-পোছ করে। লুইসা মরমে মরে যায়। কেউ সামনে থাকলে ও ঘাবড়ে যায়। কাজ গোলমাল হ'য়ে যায়। রোজাকে হাজার নিষেধ করে। কিন্তু শুনবে কে? বেশী জোর ক'রে বলতে পারে না লুইসা—ওর শ্রান্ত দেহে মনে জোর করার মত জোর নেই। তা ছাড়া রোজাকে পেয়ে লুইসা যেন বেঁচে গেল। বড় একলা লাগত। মনে হ'ত সবাই যেন ওকে এক তেপান্তরের মাঠের মধ্যে একা ফেলে চলে গেছে। এই বাচাল মেয়েটির দরদ-ভরা সাহচর্য তাই ওর বড় ভাল লাগে। রোজা বলতে গেলে এ ঘরেই থাকে আজকাল। সেলাই নিয়ে এসে বসে,

গল্প-গুজব করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌশল ক'রে ক্রিসতফের কথাকেই গল্পের মধ্যে জড়িয়ে রাখে। ক্রিসতফের নামের ধ্বনিটুকু ওর মনকে স্পন্দিত করে। হাত কেঁপে যায়। সেলাইর ওপর আরো বেশী ক'রে ঝুঁকে পড়ে। লুইসা ছেলের কথা বলতে পেয়ে যেন স্বর্গ হাতে পায়। ছেলের শৈশবের ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে মুখর হয়ে ওঠে। ছোট বড় নানা অর্থহীন খুঁটিনাটি ও এমনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ব'লে যায় যা অন্য লোকে শুনলে হয়তো হাসবে। আর যেই হাসুক লুইসা জানে রোজা হাসবে না। তাই ও নির্ভয়।

শুনতে শুনতে কিশোর ক্রিসতফ রোজার চিত্ত-পটে প্রমূর্ত হ'য়ে ওঠে অজস্র দুষ্টুমি আর বিচিত্র বাল-লীলায়। নারী-হৃদয়ের সহজ বাৎসল্য আর কিশোর অনুরাগ এক সঙ্গে মিশে গিয়ে অনুপম হয়ে ওঠে। মধুর রস উচ্ছ্রিত হয় চিত্ত জুড়ে। রোজা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হাসে— জল ছল ছল করে চোখে। হাসিতে অশ্রুতে মিশে যায়। এমন আপন হ'য়ে কাছে এল রোজা, লুইসার হৃদয় মমতায় ভরে ওঠে। মনে হয় মেয়েটার বুকের ভিতরটা যেন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মুখে কিছু বলেনা। এক এক সময় স্তব্ধ হয়ে কেবল মুখের দিকে চায় আর ভাবে হতভাগিনীকে বুঝলেনা আর কেউ। হঠাৎ কথা বন্ধ হওয়ায় অবাক হয়ে যায় রোজা, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুইসার বুকে মুখ লুকয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার চলে কাজ আর কথা যেন কিছুই হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা মা এসে বসে ছেলের পাশে। আলাপের প্রায় সবটাই জুড়ে থাকে রোজার প্রশংসা—কতক কৃতজ্ঞতায় বা কতক অন্য গোপন অভিপ্রায়ে। রোজা মায়ের নৈঃসঙ্গ ঘুচিয়েছে এতে মনে মনে কৃতজ্ঞ হয় ক্রিসতফ। ধন্যবাদ দেয় রোজাকে। ভারী বিব্রত হয়ে ওঠে ও এবং ছুটে পালিয়ে যায় তা লুকবার জন্য।

বাচাল রোজার চাইতে বাক্-সংযতা রোজা যেন আরও ব্যক্ত হয়ে উঠল। ক্রিস্তফের এখন ওকে আগের চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী, অনেক বেশী হৃদয়বতী বলে মনে হয়। ওর দিকে তাকাতে গিয়ে দৃষ্টি এখন বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয় না। আর এখন ও শুধু তাকায় না, নিরীক্ষণ করে। রোজার যে-সব গুণ এতদিন ওর চোখে পড়েনি, এখন তারা শুধু দৃষ্টিগোচর নয়, দৃষ্টির সম্মুখে দল মেলে। ভারী অবাক্ লাগে। ওর চোখে মুখে তার ব্যঞ্জনায় রোজা যেন খবর পায় কঠিন তুষার-শিলায় সূর্য-কিরণের পরশ লেগেছে। হৃদয় দুলে ওঠে, বুঝি ওই তুষার গলা পথেই আসবে প্রেম। কল্পনার রথ উধাও হয়ে ছোটে দিক্ বিদিকে। আশার উজান ঢেউ বারে বারেই যেন বুকের তটে ঘা দিয়ে ব'লে যায়—'ওরে, হবেই হবে; তোর সব-ঢেলে-দিয়ে-চাওয়া-মানিক তুই পাবিই পাবি।' আর কেনই বা পাবেনা! এই চাওয়ার মধ্যে অনুচিত তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও! ক্রিসতফ বুঝবে না কি তা? আর সে ছাড়া ওর ভেতরের মানুষটিকে কেই বা চিনবে আর?

এদিকে ক্রিসতফ কিন্তু রোজার কথা মনেও আনে না। ওর শ্রদ্ধায় রোজা আছে, চিন্তায় নেই। অবকাশও নেই ওর। বহুতর বিষয় নিয়ে ও ব্যাপৃত, বিব্রত। তা ছাড়া ক্রিসতফ এখন আর ক্রিসতফ নেই, একেবারে আলাদা একটি মানুষ, নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও আজ সৃষ্টির মহাবেদনাকে বক্ষে ধারণ ক'রে আছে। ওই বেদনার সংঘাতে ঘটবে মহাপ্রলয়···সব ভেসে, ভেঙ্গে, গুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বড় শ্রান্ত ক্রিসতফ···মনের মধ্যে অকারণ অস্বস্তি। মাথার ওপর যেন এক বিপুল পাহাড় চেপে আছে। চোখ, কান, সর্ব ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেবলি যেন কাঁপছে কোন মত্ততায়। চিত্ত অস্থির,

বিষয় হতে বিষয়ান্তরে নিরন্তর ছুটে চলেছে এক বিচিত্র বন্যতায়। প্রবল রক্ত-শোষী জ্বরে ওর ধমনী-জাল বিশুষ্ক; অন্তরে অবয়বহীন অচেনা কতগুলি ছায়া যেন ছট্‌ফটিয়ে মরছে। মনে হল—প্রথম বসন্তের উন্মাদনা। কিন্তু বসন্ত গেল, গেল না ছটফটানি। দিনে দিনে উপচীয়মান প্রমত্ততায় ক্রিসতফ বিপর্যস্ত হ'তে লাগল।

কবির কাব্যিক ভাষ্যে এ হ'লো বয়ঃ-সন্ধির ধর্ম; তরুণায়মান দেহে মনে পঞ্চশরের সুপ্তি হতে জাগরণে উত্তরনের অবস্থা। কিন্তু এতবড় একটা সংকট—যখন বিচূর্ণিত মানব-সত্তা মৃত্যুর মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন ক'রে জন্মলাভ করে; তার সর্ব বিশ্বাস, কর্ম, চিন্তা, এমন কি জীবনকে অবধি প্রচণ্ড আঘাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে আবার আনন্দ বেদনার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নূতন ক'রে আত্মার জীবনায়নের এই যে এত বড় বিপ্লবের অধ্যায় এ কি বাল-চাপল্য বলে লঘু করার বস্তু!

ক্রিসতফের সমস্ত দেহ মন ভয়ংকর উত্তেজিত। সংগ্রাম-শক্তি নিঃশেষ। এখন কেবল দেখা। বিরস চিত্তে কৌতূহল চরিতার্থ করা। মানস ক্ষেত্রে কি যে ঘটছে তার কোনো নিশানা পায় না। দেহ-মনের সাথে চেতনা যেন বিচ্ছিন্ন। মোহগ্রস্ত তন্দ্রার ঘোরে দিন কাটে। কাজ-কর্ম হ'য়ে উঠছে অত্যাচার; রাত্রির নিদ্রা খণ্ডিত, বিশ্রী ভীষণ স্বপ্ন ও উগ্র কামনায় আবিল; ওর অভ্যন্তরে যেন একটা উন্মত্ত জান্তবতা দাপাদাপি করছে। নিজের এই চেহারাটা দেখে ভয়ে ও শিউরে ওঠে। বুকটা যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে। ঘামে নেয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ। প্রাণপণ চেষ্টা করে এই অশুচিতা হতে মুক্ত হ'য়ে স্নাত শুদ্ধ হতে। অবাক হ'য়ে ভাবে পাগল হবেনা তো!

দিনেও বর্বর চিন্তাগুলি সারাক্ষণ মনের মধ্যে কিলবিল করে। আত্মার গভীরতম গভীরে তাকিয়ে দেখে সেখানে অতল নিকষ কালো

অন্ধকার, ও তলিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধকারে। আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করার মত কোনো অবলম্বন নেই। অন্ততঃ মাঝপথেও পতন ঠেকাবার মত কোনো আশ্রয় নেই। পতনের পথ সম্পূর্ণ নির্বাধ। আজ কে রক্ষা করবে ক্রিসতফকে! পারলে না ভগবান, পারলে না শিল্প-সাধনা, পারলে না ওর মর্যাদা, পারলে না ওর বিবেকী মন। চার পরতের পাঁচিলে গাঁথা দুর্গটা পারলে না তার নিরাপদ আশ্রয়ে ওকে নিরাপদ ক'রে রাখতে। সব ভেঙ্গে পড়ল ওকে একেবারে নিরাবৃত ক'রে দিয়ে। ভগবান হারিয়ে গেল···শিল্প, মর্যাদা, বিবেক-নিষ্ঠা—সব এক এক ক'রে চুরমার হয়ে গেল। অশক্ত দেহটা যেন উলঙ্গ শৃংখলাবদ্ধ হ'য়ে পচা পোকা-পড়া গলিত শবের মত ধূলোর বুকে রইল পড়ে। থেকে থেকে বিদ্রোহের আগুন ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে ওঠে ওর মনে। কোথায় গেল ওর লোহার মত ইচ্ছা-শক্তি! বৃথাই খুঁজে ফেরে ও হারানো ধন। ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখছে বুঝতে পেরে যখন জাগার চেষ্টা করে, তখন সীসার ঢেলার মত গড়িয়ে গড়িয়ে কেবলি স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে গিয়ে পড়ে। এবং সেই প্রয়াসটা ক্রমশঃ যেন বুকের ওপর চেপে বসে, যেন টুটি চেপে ধরে। ক্রিসতফের শৃংখলিত আত্মারও যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল। অসহ্য যাতনা। ওর মনে হল লড়াই না ক'রে হাত পা গুটিয়ে নিলে অন্ততঃ এত যাতনা ভোগ করতে হয় না। সুতরাং স্থির করলে আর 'যুদ্ধং নৈব নৈবচ'। এবার অদৃষ্টের হাতে আত্ম-সমর্পণ।

কিন্তু জীবনের প্রশান্ত সমতা ভেঙ্গে গেছে। পা পিছলে পড়ল ভূগর্ভের বিরাট গহ্বরের একেবারে অতলে, এবং নিঃশেষে হারিয়ে গেল সেই নিঃসীম তমিস্রায়। তখনই আবার বিপুল বলে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল আলোয়। ওর দিনগুলি হল শিথিল-গ্রন্থি, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দৈনন্দিন জীবনের মসৃণ সমতলে হঠাৎ দেখা

দেয় বিরাট ফাটল, গ্রাস করতে চায় ওকে সমূলে। দর্শকের মত ক্রিসতফ দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে, এমনি নিরাসক্ত ভাবে যেন ওর সাথে এ সবের কোনো সম্বন্ধ নেই। ওর চোখে কি এক নেশার ঘোর লেগেছে। কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি কাউকেই যেন চিনতে পারছে না; এমন কি নিজকেও না। কোনোকালে এদের যেন ও দেখেনি। কাজ করে স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের মত। ওর মনে হয় চক্র বিকল হয়েছে; জীবনের রথ যে-কোনো মুহূর্তে থেমে যাবে। থেকে থেকে সব যেন একেবারে ধূ ধূ শূন্যতায় হা হা ক'রে ওঠে। হয়তো খাবার টেবিলে সকলের মাঝে রয়েছে, কিংবা রয়েছে সঙ্গীতের আসরে উচ্ছ্বসিত শিল্পী ও শ্রোতার ভিড়ে: হঠাৎ মস্তিষ্কের ভিতর কোত্থেকে নেমে আসে সেই শূন্যতা; চারপাশের কলরব-মুখর মানুষগুলির দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নির্বোধের মত। কিছু যেন বোধগম্য হয় না। নিজকেই প্রশ্ন করে:

'কি তফাৎ এই লোকগুলার—'

বলতে চায়: 'ও আমার মধ্যে।' সাহস হয়না।

কি ক'রে বলবে, 'আমার মধ্যে!' ও কি আছে! হয়তো আছে, হয়তো নেই। জানে না ঠিক। কথা যখন কয়, মনে হয় সে স্বর ওর নয়। নড়ে চড়ে···ও নড়া চড়াও যেন ওর নয়। অনেক দূরে, অনেক ওপরে, দুর্গম-দুর্গ-শিখরের দুরধিগম্য উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ও···না ও নয়··· আরেক জন, নড়ছে না, ওই নড়াচড়া দেখছে। নিজের মুখে হাত বুলিয়ে দেখে বারে বারে···। চোখের দৃষ্টি শূন্য, বিভ্রান্ত। না ঠেকালে মাঝে মাঝে এমনি কাজ ক'রে বসত যা বদ্ধ পাগলামির সামিল।

বিশেষ ক'রে সাবধান থাকতে হয় যখন বাইরে লোকজনের মধ্যে থাকে। হয়তো কোনো সন্ধ্যায় রাজ-বাড়ীর সঙ্গীত আসর অথবা অন্য

কোনো সার্বজনীন অনুষ্ঠানে গেছে—হঠাৎ ওর দুর্দমনীয় ইচ্ছে হয় সবাইকে মুখ ভেংচে দেবে, অথবা গালি দেবে অতি কদর্য ভাষায়; নয়তো ডিউকের নাকটা খিম্‌চে দেবে, আর নয়তো মহিলাদের কাউকে মারবে ক'ষে এক লাথি। আর একদিনের এক আসরে হয়ত ভিতরে ভিতরে ক্ষেপে উঠল, তক্ষুণি সকলের সামনে বিবস্ত্র হবে। দুর্দমনীয় যান্ত্রিক ইচ্ছা। অমানুষিক শক্তি দিয়ে তাকে যত ঠেকাতে যায় ততই যেন আরো প্রবল হয়।

এ অবস্থাটা কেটে গেলে দেখা যায়, ঘেমে নেয়ে উঠেছে এবং মনের জগতে ধূ ধূ করছে মরুভূমির শূন্যতা। সত্যি যেন পাগল হ'য়ে যায়।

এমনি ক'রে রাত দিন চলল যখন তখন অসংযত, উচ্ছৃংখল উন্মাদনা, ক্ষণে ক্ষণে অতল শূন্যতায় আঁকুপাঁকু। মরুভূমিতে আঁধি ওঠে···দেহ-মন বিকল-করা দুর্দান্ত আঁধি। ধরিত্রীর কোন অন্ধকার গহ্বর হতে! কোথায় ছিল এই তীব্র কামনার দল যা হিংস্র নখরাঘাতে ওর দেহ-মনকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিলে! ও যেন কোন শক্তিধর হাতের মুঠোয় একখানা বাঁকান ধনুক, ভাঙ্গার সীমায় দাঁড়িয়ে—এই বুঝি ভাঙ্গলো। কি উদ্দেশ্য হাতের, আর কিই বা উদ্দেশ্য অমন ক'রে ধনুকখানাকে পীড়ন করার! কিন্তু ধনুক ভাঙ্গলোনা; প্রবল বেগে ছিট্‌কে উঠে শুক্‌নো দারু-খণ্ডের মত মাটিতে প'ড়ে রইল। হাতখানা কার, জানে না, জানার সাহস নেই। কিন্তু এ যে হার! একেবারে হার-মানা-হার! এত বড়ো পরাজয়কে কেমন ক'রে বইবে! ক্রিসতফ বীত-শক্তি, শ্রান্ত, অবসন্ন; ওর মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গেছে। সত্য-পরান্মুখ ব'লে এতকাল যাদের ও ঘৃণা করেছে, আজ তাদের ও বুঝতে পারলে।

কর্মহীন অলস শূন্যতার মধ্যে বসে বসে মনে পড়ে সময় ওর প্রতীক্ষায় থেমে নেই। কত কাজ জমে জমে পাহাড় হ'লো···ওর

ভবিষ্যৎ তারি আড়ালে অস্তগামী। ভয়ে শিউরে ওঠে; ধমনীতে নামে হিম-প্রবাহ। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ভীরুটা বর্তমানের এই শূন্যতাকে খাঁটি বস্তু বলে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরতে যায় এবং প্রাণপণে সাফাই খোঁজে। শূন্যতার মধ্যেই ঝোড়ো সমুদ্রের বুকে ভাঙ্গা জাহাজের মত ভেসে যেতে কেমন বিচিত্র উল্লাস লাগে। আর ও সংগ্রাম করবে না; প্রতিরোধ করবে না। কি হবে সংগ্রাম ক'রে? কেন শক্তিক্ষয়? কিসের তরে? কি আছে? কিছু নেই…শুভ নেই…সুন্দর নেই…ঈশ্বর নেই…নেই সত্তা…নেই সত্ত্ব। পথ চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয় পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। চারদিকে শূন্যতা উঠল থম্ থম্ ক'রে…কোথাও কিছু নেই…না মাটি, না জল…না আলো…না ক্রিসতফ।…মাথা টলে পা টলে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মাথাটা কেবল সমস্ত দেহকে মাটির দিকে টানে। চেতনা বিলুপ্ত হতে চায়। শুধু চেতনা নয়, বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে এবার ক্রিসতফ। মৃত্যু ওই বুঝি আসে, শোনা যায় বুঝি তার পায়ের ধ্বনি… শোনা যায়…ওই এল দ্বারের কাছে…একেবারে বক্ষের আলিঙ্গনে। ক্রিসতফের মনে হ'ল ওই আলিঙ্গনে ওর অবসান হয়ে গেল—ক্রিসতফের মৃত্যু হল।

এবার পুনর্ভবন। নূতন স্বকোদ্গমের সমারোহ…জীবনের উদয়-দিগন্তে নবীন মানস-সত্তা প্রভাসমান। শৈশবের পুরানো জীর্ণ, দীর্ণ মানসখানি যখন ঝরে ঝরে পড়ল, তখন ও কি স্বপ্নেও ভেবেছিল ওই ঝরে-পড়ার ডমরু বাজিয়ে যে এল সে আরও নবীন,—আরও তরুণ, বীর্য তার খরতর! জীবন ভরেই তো এই রং-ফেরানোর পালা। চলার সুরে সুরে দেহের সাথে মানসেরও নিরন্তর রূপ হতে রূপান্তর। কিন্তু এই রূপান্তর সর্বদাই অনেক দিন ধরে অনেক ক্রমিক-পর্যায়ের স্তর

ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলে না। কখন আচম্‌কা কোথা থেকে কি যে আগুন জ্বলে ওঠে, চোখের নিমেষে আগা-গোড়া সব একেবারে নূতন হ'য়ে যায়। বয়ঃ-সন্ধি পার হয়ে গেলে তবে আসে আত্মার নব-জন্মের এই শুভ লগ্ন। তার যে-রূপখানি ঝরে পড়ে তার আর কোনো চিহ্ন থাকে না। এমনি ভয়ংকর সংকটের সে-কাল যে মনে হয়, সব গেলো, সব গেলো, একেবারে কিছু আর রইল না। কিন্তু আশ্চর্য! তাকিয়ে দেখি, 'সারা' নয় 'শুরু'। একেবারে গোড়া থেকে শুরু। একটি জীবন গেলো, কিন্তু মৃত্যুর নীল বাঁশীতেই বাজলো নব-জীবনের আলোর রাগ।

রাত হয়েছে। ক্রিসতফ নিজের ঘরে একলা ডেস্কের ওপর কনুইখানি রেখে ব'সে। একটি মোমের বাতি জ্বলছে সামনে। পিঠ রয়েছে জানালার দিকে। অমনি বসে আছে বিনা কাজে; পারছে না কাজ করতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই। মাথার মধ্যে সব কিছু যেন প্রবল ভাবে ওলট্ পালট্ হচ্ছে। ধর্ম, নীতি, শিল্প, মানুষের জীবনে যা কিছু আছে সব কিছুর চলছে বিশ্লেষণ; কিন্তু চিন্তা-ধারা সুস্থ, পরিশ্রুত নয়—উদ্দাম, উচ্ছৃংখল। পড়ার নেশায় পেয়েছে। ঠাকুর্দার ছোট পাঁচমিশেলী লাইব্রেরী আর ফোগেলের ভাণ্ডার থেকে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান হাতের কাছে যা পায় টেনে নিয়ে বসে। অনধীত, অনধিগত বিষয়-বস্তু বুঝতে পারে না। ক'টা পাতা উল্‌টিয়ে উঠে পড়ে। মন ভোলাবার জন্য নানান খেয়ালে মাতে। কিন্তু মন ভোলেও না ভরেও না। শূন্যতা ওঠে হা হা ক'রে; অবসাদ আসে ছেয়ে; তীব্র বেদনায় হৃদয় আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

আজ এই অবস্থাটা হয়েছে আরো তীব্র। শ্রান্ত দেহে তন্দ্রা এসেছে ছেয়ে। সবাই ঘুমিয়েছে। সারা বাড়ী নিঝুম। একটি নিঃশ্বাসেরও

শব্দ আসছে না কোনোখান থেকে। জানালাটি খোলা ; আকাশে ঘন-মেঘ ; ক্রিসতফের শূন্য দৃষ্টি জ্বলন্ত মোম-বাতিটির দিকে। জ্ব'লে জ্ব'লে ওটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। মন একেবারে চিন্তাহীন, নিথর শূন্য। ভাববার শক্তি নেই। হঠাৎ মনে হ'ল—ওই শূন্যতা যেন ক্রমেই ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে···শূন্যতার বিরাট গহ্বরটা বিপুল আকর্ষণে ক্রিসতফকে একেবারে প্রান্তে নিয়ে এল। মুখ ফেরাতে চায়, ওই ভয়ংকর হিংস্র অন্ধকারটাকে দেখবে না। কিন্তু অদৃশ্য হাতের টানে চোখ অন্ধকারের দিকেই ফেরে···অজ্ঞাতসারে জানালায় ঝুঁকে প'ড়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। দিগন্ত-বিসারী স্তম্ভিত তমিস্র-পুঞ্জ···ঊর্ধ্বে, নিম্নে, অগ্রে, পশ্চাতে বন্ধন-বিহীন, সীমা-বিহীন শূন্যতা—তারি বুকে যেন নিঃশব্দ নিথর প্রলয়-তমিস্রার মধ্যে সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন···অন্ধকারের বুকে অসংখ্য বিচিত্র অস্পষ্ট গুঞ্জরণ। প্রচণ্ড যাতনায় অনুভূতি নিঃসাড় হ'য়ে এল ; মেরুদণ্ড ব্যাপ্ত করে তীব্র শিহরণ প্রবাহিত হ'ল ; ত্বকে যেন কোটি-কোটি সূচি-ভেদ হতে লাগল। মাথা ঘুরে উঠল—টেবিলটা ধ'রে নিল সামলে। তারপর উদগ্র, উন্মত্ত প্রতীক্ষা—কোন অজানিতের আকস্মিকের, অভাবনীয়ের, অনির্বচনীয়ের, অলৌকিকের—হয়তো বা কোনো ঐশ-আবির্ভাবের···

পিছনের আঙ্গিনায় আচম্বিতে যেন স্লুইস্-গেট ভাঙ্গা বেনো জলের বিপুল বেগ আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড গর্জনে। মুষল-ধারে এসেছে বৃষ্টি—বড় বড় ফোঁটায়, ধারাসারে। তারি শব্দ। স্তব্ধ বাতাস কেঁপে উঠল। শুকন কঠিন মাটি বৃষ্টি-ধারার আঘাতে বাজতে লাগলো যেন ঝন্ ঝন্ ক'রে। প্রতপ্ত মাটির বিপুল গন্ধে জন্তুর নিশ্বাসের উষ্ণতা ; গমকে গমকে উচ্ছৃত হ'ল ফুলের সুরভি, ফলের সুবাস আর কামনা-আতুর দেহের উদ্ভাস রৌদ্র-পুলকিত ছন্দে···।

তখনও সম্পূর্ণ কুহকে আবিষ্ট ক্রিসতফ…কেঁপে উঠল থর্ থর্ ক'রে। মুহূর্তে ছিন্ন হলো গুণ্ঠন…। বিদ্যুদ্ভাসে বিদীর্ণ তমসার ফাঁকে ক্রিসতফ পড়ল অগ্ন্যক্ষরা অমৃত বাণী…"সোঽহং।" দেখল, ভগবান বহির্বিশ্বে নেই। সেই অমৃত বাণীর সাথে ক্রিসতফের সমগ্র সত্তায় প্রতিধ্বনিত হ'ল 'সোঽহম্, সোঽহম্'…প্রত্যক্ষ করল আপনার 'অনাদি-মধ্যান্তং, অনন্তবীর্যং, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং' বিরাট স্বরূপকে, যা কক্ষের ক্ষুদ্র পরিবেশ বিধ্বস্ত ক'রে, ছাদ বিদীর্ণ ক'রে, গৃহ-বেষ্টনীকে চুরমার ক'রে, সত্তার পরিসীমাকে অতিক্রম ক'রে, 'গ্যাবাপৃথিবীর' অন্তরকে আর সকল দিককে আপনার এক-সত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করল। বিশ্ব-চরাচর পার্বত্য-বন্যার বিপুল বেগে ওই মহা-সত্তার অভ্যন্তরে প্রবাহিত হ'ল। ভয়াল ঘূর্ণী বায়ুর আবর্তে প্রকৃতির সমস্ত বিধান শুষ্ক তৃণের মত উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল…সেই ঘূর্ণী বায়ুর উৎক্ষেপে ভয়ে এবং আনন্দে ক্রিসতফ ছিট্‌কে এসে পড়ল বেগোন্মাদ জীবন-মদ-মত্ত, বিশ্ব প্রবাহের ধারায়। নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল ক্রিসতফের। সোঽহম্! সোঽহম্! চোখের নিমেষে ঈশ্বরত্বে রূপায়ন! ক্রিসতফ স্বয়ং ঈশ্বর! তীব্র সুরার নেশা লাগে…ঈশ্বর—সে এক ব্যাদিত-মুখ বিরাট গহ্বর… দুস্তর সাগর…ঈশ্বর আত্মার বহ্নি, জীবনের প্রমত্ত ঝঞ্ঝা…সেই তো জীবনের রুদ্র-রূপে পাগল প্রেম…দুর্বার, দুঃশাসন, লক্ষ্যহীন—যা সমস্ত যুক্তির উর্ধ্বে, সমস্ত নিয়মের উর্ধ্বে।

মোহাবেশের অবসানে ঘুমিয়ে পড়ল ক্রিসতফ। গভীর সুষুপ্তি। বহুকাল এমনি গভীর নিদ্রা হয়নি। পরের দিন ঘুম যখন ভাঙ্গল, উঠতে পারলে না, মাথা ঘুরছে, সর্ব দেহে যেন তীব্র নেশা-শেষের শ্রান্তি। কিন্তু ওর অন্তরের নিভৃতে বিগত রাত্রির আঁধার-জ্বালান আগুনের একটি শিখা তখনও জলছে। ইচ্ছা হ'লো আজ আবার সেই

আগুন জ্বলুক, তেমনি জলদর্চি-শিখায়; তেমনি ক'রে আর একবার তার বিরাট রূপের আবির্ভাব হোক। কিন্তু ইচ্ছা মাথা ঠুকে মরল—যতবার ধ'রতে গেল—সে আলো হ'য়ে উঠল আলেয়া। ক্রিসতফ পাগল হ'য়ে উঠল—সর্বশক্তি দিয়ে সাধনা হল শুরু। কিন্তু আত্মার এই পরম অনুভূতি—সে তো অভাবনীয়ের, আকস্মিকের দান—শুধু হাতছানিতেই তোমার দ্বারে আসবে—সে কি সেই বস্তু!

না, তবু নিঃশেষে হারালোনা। বারে বারেই সেই অতীন্দ্রিয় রোমাঞ্চের ক্ষণটি এল, বহুবার ইন্দ্রিয়াতীতের দ্বারও খুলে গেল। কিন্তু আনন্দ থাকলেও খুঁজে পাওয়া গেলনা তার আগুনকে, যা শুধু একটি বার রুদ্র-রূপে দেখা দিয়েছিল। এখন মাঝে মাঝে শুধু ঝিলিক দেখা যায় একেবারে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে…একটি পলক মাত্র…পলকই বা কেন তার সহস্রতম ভগ্নাংশ, অথবা ধরো তোমার হাতটা তুলতে যেটুকু লাগে সেটুকু সময় মাত্র, তারপর, কিছু হৃদয়ঙ্গম হবার আগেই সে ঝিলিক মিলিয়ে গেল। অবাক হ'য়ে ক্রিসতফ ভাবে 'স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়!' সেদিনকার আকাশ-জ্বালানো আগুনের কাছে এই ঝিলিমিলি গুলো আলোক-স্নাত ত্রসরেণুর নৃত্যের মত—গতির পথে স্ফুলিঙ্গ ছিটকিয়ে যায় এমনি বেগে, যে চোখের গোচর হবার আগেই তারা চোখের আড়াল হ'য়ে যায়।

যায় বটে, কিন্তু আবার আসে, বারে বারে, ফিরে ফিরে। এবং ক্রমে এই আসা যাওয়াটা এত ঘন ঘন হ'তে লাগল যে অবশেষে মনে হ'ল অজানা স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা এক জ্যোতির্মালা নিরন্তর ওকে জড়িয়ে আছে। এবং এই স্বপ্নের আগুনেই ওর আত্মা গলে রূপান্তরিত হ'য়ে চ'লল। সারাদিন ডুবে থাকে ও ওই আবেশে; এবং সামান্য ব্যাঘাতেও একেবারে ক্ষেপে ওঠে। কাজে মন বসে না। কাজের

চিন্তা তাই ছেড়ে দিলে। মানুষের সঙ্গ দুঃসহ হ'য়ে উঠল—বিশেষ ক'রে স্বজনের ; কারণ, ওরা বাঁধে এবং বাঁধে দাবীর জোরে।

অতএব বাইরে বাইরেই ওর দিন কাটে। ঘরে ফেরে রাত হ'লে। অরণ্য-প্রান্তরের নিরালাকে খুঁজে নিয়ে তাতেই ডুব দিলে ; এবং যে-সব বাতিকগ্রস্ত গোঁড়ার দল কেবলি ছুৎমার্গ বাঁচিয়ে আদর্শকে রাখতে চায় সিন্দুকে পুরে, তাদের মত ও ওই নিরালা গণ্ডূষ ভরে পান করতে লাগল।

বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট মহিমা, উন্মুক্ত বায়ুর উদার-দক্ষিণ মাধুরী, মাটির স্নিগ্ধ স্পর্শ ওর সমস্ত উন্মত্ততায় প্রশান্তি বুলিয়ে ওর মনের চৌদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে একেবারে আকাশ ক'রে দিলে।

আজ বিপুলতর আনন্দ ওর অন্তরে। কিন্তু এ বিকারের প্রমত্ততা নয়—সুস্থ, জীবনোপলব্ধির উন্মাদনা। দেহে মনে শক্তির মদির-গন্ধে আজ ক্রিসতফ যেন 'কস্তুরী-মৃগ-সম' পাগল হইয়া বনে বনে ফেরে।

যেন নূতন শৈশব—নূতন ক'রে পৃথিবীকে দেখা। দেখা নয়, আবিষ্কার। যেন যাদুকরের যাদুমন্ত্র উচ্চারিত হল, "দ্বার খোলো", আর অমনি ভুবন স্পন্দিত হ'লো, বিশ্ব-প্রকৃতির নন্দিত বক্ষ থেকে 'আনন্দম্' এই ধ্বনি ঊর্ধ্বে উঠল সহস্র শিখায় ; সূর্য উপচীত-তেজে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে লাগল ; আকাশ তরল হ'য়ে নদীর মত ধেয়ে চলল ; পৃথিবী যেন মেতে উঠল, তার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধ্বনির ঝংকার উঠল দিকে দিকে। ক্রিসতফ দেখল যত বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী জীবন-বহ্নির এক একটি প্রজ্বলিত জ্যোতির্ময়ী শিখা। ভীমবেগে তারা তরঙ্গায়িত ছন্দে ঊর্ধ্বলোকে উঠছে। প্রতি বস্তু, প্রতি ধূলিকণা, জল স্থল আকাশ বাতাস ভ'রে গান গেয়ে উঠল। সেই উদাত্ত ঐকতান আনন্দ-সঙ্গীতে বিশ্ব ভুবন হ'ল মুখরিত।

এ আনন্দকে লাভ করল ও একেবারে নিজের বুকের মধ্যে। শক্তি ছড়িয়ে পড়ল ওর কোষে কোষে। বুঝল এ-বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন কোন পৃথক্ সত্তা ও নয়—বিশ্ব-সত্তারই একটি কণা। এ পৃথিবীর আত্মীয় নয় শুধু, এর সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম। এতদিন ও সংসারকে দেখেছে একেবারে আলাদা একটি বস্তু বলে। এমন কি শৈশবের সেই অবাক হয়ে পৃথিবীকে দেখার যুগেও প্রাণীগুলিকে প্রাণী ব'লে মনে হয়নি ; মনে হ'য়েছে নিজের নিজের দেহের সীমায় ঘেরা অতি বিকট, অতি ভয়ংকর, অতি রহস্যময় এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পুরোপুরি আলাদা এক একটা জগৎ—একটা পৃথক সত্তা। এই জগৎগুলোর সাথে যেন ওর কোথাও কোনো যোগ নেই। তখন ভাবতো—এদের চেতনা নেই, অনুভূতি নেই—বিচিত্র যন্ত্র-বিশেষ এরা। সুতরাং শিশুসুলভ নিষ্ঠুরতায় ও পোকা-মাকড় ধ'রে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়েছে—যাতনায় কেমন ক'রে দেহগুলি মুচড়িয়ে, পাকিয়ে বাঁকা হ'য়ে গেছে—দেখতে ওর ভারী ভালো লেগেছে। কখনও মনে হয়নি দুর্ভাগাদের ব্যথা লাগে। একদিন বাধা দিয়েছিল মামা গতফ্রিদ্। স্বভাবতঃ শান্ত স্থির প্রকৃতির মানুষটা সেদিন ভারী বিচলিত হ'য়েছিল। ক্রিসতফের হাত থেকে তার শিকার নিলে ছিনিয়ে। প্রথমে হাসতে চেষ্টা করল ক্রিসতফ, কিন্তু মামার মুখের রেখাগুলি যাতনায় এমনি করুণ হয়ে উঠল যে ওর চোখে জল এল। সেদিন ও বুঝলে ওরই মত এরাও ব্যথা পায়। এবং ভয় পেল. অসহায় বোবা প্রাণীগুলোর উপর এতদিন ধ'রে এত অত্যাচারে কত না জানি পাপ জমেছে। এবার অত্যাচারটা থামল বটে , কিন্তু ওই পর্যন্ত। মমতাহীন অবহেলা আর ঔদাস্যের নেপথ্যে হতভাগ্যেরা ঠেলা রইল। এমন কি যন্ত্র হিসেবে ভিতরকার কারীকুরী দেখার কৌতুহলটুকুও রইলনা ! বরঞ্চ জীব-জন্তুর কথা

ভাবলে গাটা কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে—ওগুলো যেন দুঃস্বপ্ন এক একটা! কিন্তু আবার সব বদলে গেল আগা-গোড়া! এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কুৎসিত কীটানুকীট গুলিই আজ আলোর উৎস হ'য়ে উঠল।

গাছের ছায়ায় ঘাসের বুকে উপুড় হ'য়ে শুয়ে নিবিষ্ট হ'য়ে দেখে, কান পেতে দেয়—ঘাসের মধ্যে কত অসংখ্য কীটের বিশাল রাজ্য—গাছে গাছে পতঙ্গকুলের বিচিত্র ধ্বনির অস্পষ্ট গুঞ্জন···। নির্বাক বিস্ময়ে দেখে—পিঁপড়ের দলের ত্রস্তব্যস্ত উত্তেজিত ছুটোছুটি···লম্বা-পা-ওয়ালা মাকড়সা গুলির নাচের তালে হেলে দুলে চলা···গঙ্গা-ফড়িংএর দল লম্বা ঠ্যাং দিয়ে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে যেন ল্যাং মারতে মারতে চলেছে···থপথপে মোটা মোটা গুবরে পোকার দল ভারিক্কী চালে আনাগোনা করছে···। এ ছাড়া আরো কত অসংখ্য রকম রং বেরং-এর পোকা···। ওই একটা, গোলাপীতে সাদায় মেশান তুলতুলে পালিশ করা গা···আরো কত··· কত। সুগন্ধি পাইন গাছটার চারদিকে লুটিয়ে পড়া সূর্য-রশ্মিকে ঘিরে ঘিরে অজানা পতঙ্গের দল উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছে...ক্রিসতক বাহুর ওপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শোনে তাদের প্রমত্ত গুঞ্জনের অদেখা ঐক্য-তান সঙ্গীত···শোনে মশার মিহি তীক্ষ্ণ স্বরের গুন্‌গুনানী, বোলতার অর্গ্যানের মত মিঠে গম্ভীর গান, তরু-শিরে বন্য-মৌমাছির মধুহীন ধাতব ঝংকার···হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গাছেদের ফিস্‌ফিসানী···শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় বাতাসের কান্না···হিল্লোলিত তৃণদলের বুক থেকে ওঠে কোমল অরূপ ভাষা—হ্রদের স্বচ্ছ বুককে দুলিয়ে-দেওয়া দখিন বাতাসের নিঃশ্বাসের মত, দুকুল বসনের আলতো খস্‌খসানীর মত, পাশ-দিয়ে-চলে-গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া প্রিয়া-পদধ্বনির মত।

মনে হয়, এই ধ্বনি-পুঞ্জ ওরই বুকের ভাষা···। কীটানু হ'তে আরম্ভ ক'রে বিরাট-কায় মহা-প্রাণী পর্যন্ত সকলের মধ্যে একই প্রাণ-স্রোত। সেই

বিশ্বব্যাপী অনন্ত প্রাণ-প্রবাহে সকলের সাথে মিলে ক্রিসতফও সাঁতার কাটে···ও ওদের আপন জন, ওদের একজন। একই শোণিত-স্রোত বইছে দেহে···একই নাড়ীতে বাঁধা জীবন। ওর আনন্দ বেদনায় বিশ্বের আনন্দ-বেদনার প্রতিধ্বনি। সহস্র জলধারা যেমন নদীকে পুষ্ট ক'রে তারই ধারায় মিশে একাত্ম হ'য়ে যায়, তেমনি এই প্রাণী জগৎ হ'তে উচ্ছৃত শক্তির প্রস্রবণ ক্রিসতফেরই প্রাণ-শক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তারই কোষে কোষে মিশে আছে।

কৃপণ হৃদয়টা জানালা দুয়ার আঁটা বন্ধ ঘরের মধ্যে ব'সে হাঁপাচ্ছিল এতদিন। পাগল হাওয়া আগল দিলে ভেঙ্গে ; হাওয়ার দাপট লাগল এসে মুখে, বুকে, চোখে। হাওয়ার জোরে ফুসফুস দুটো টনটনিয়ে উঠল যেন ফেটে যাবে চৌচির হ'য়ে।

এত বড় কাণ্ডটা ঘটল একেবারে চোখের নিমেষে।

এতদিন নিতান্ত আকিঞ্চনের মত কেবল নিজের অস্তিত্বটুকুকে ঝোলায় পুরে সামলাতে ছিল ব্যস্ত। তাই ওর চতুর্দিকটা ছিল বিষম ফাঁকা। কিন্তু ঝোলাঝুলি সব ফাঁক হ'য়ে গেল—সামলানো ধন কখন যে গ'লে গ'লে বেবাক প'ড়ে গেল তা ও টের পায়নি। আমিটাকে একেবারে ডালি দিয়ে যখন হাল্কা হ'লো, দেখলে চারপাশের ফাঁকাটা বেবাক জুড়ে বিশ্ব-ভুবন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল—আজ ওর তমসা হ'তে জোতির্গমন, মৃত্যু হতে অমৃতত্বে উত্তরণ। দেখলে অসীম প্রাণ-পারাবার কূল ছাপিয়ে থৈ থৈ করছে। সবার সাথে ঝাঁপাই খেলার ডাক তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

খর-স্রোতে ভেসে গিয়ে, উত্তাল তরঙ্গের ঝাপটা বুকে মুখে নিয়ে, ওর মনে হ'ল আজ ওর বাঁধন খসল। কিন্তু এ যে বাঁধন-খসার ছলে বাঁধন-আঁটা, এ কথাটা ওকে বুঝতে হ'লো পরে। বুঝতে হ'লো সবাই

বাঁধা, কেউ মুক্ত নয় এ-সংসারে, একটি প্রাণীও নয়। বিশ্বের বিধানও আপন নিয়মে বাঁধা। বোধ হয় কেবল মৃত্যুর বাঁশীতেই তার সে বন্ধন-মোচনের মন্ত্র।

ক্রিসালিস তার ডানা মেলে নির্বাত অন্ধকার হ'তে আলোয় এল। মুক্তির আনন্দে সে উঠল মেতে। নব-রূপায়িত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেলে দিলে, মুক্তির মদিরা পান ক'রবে সর্বাঙ্গ দিয়ে। ছোট কারাগার ছেড়ে বড় যে-কারাগারটায় এল, তার আয়তন হিসেব করার সময় আজ তার কোথায়!

সময় চলেছে এখন নূতন ছন্দে। ফিরে এল শৈশবের সেই সোনা-ঝরা অস্থির, রহস্যময়, মুক্ত দিন; যে-দিন প্রথম বিস্ময়ে ও পৃথিবীকে দেখেছিল, প্রতিটি বস্তুকে আবিষ্কার ক'রেছিল। উদয়াস্ত-বিলম্বী, দীর্ঘ বিসারী মরীচিকার মধ্যে ও সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। সব কাজকর্ম বিসর্জন গেছে। সেই কর্তব্য-নিষ্ঠ বিবেকী ছেলে—অসুস্থতার কারণেও যে কোনো দিন একটি অর্কেষ্ট্রা একটি সঙ্গীতের আসর বাদ দেয়নি, সে এখন কেবলি ছুটির ছল খোঁজে। মিথ্যাকে ভয় করে না; মিথ্যে কথা ব'লে অনুতাপ হয় না। কর্তব্য, নীতি প্রভৃতি যে-সব ওজনে-ভারী শাস্ত্রীয় বিধানকে জীবনের বিধান ব'লে খুশি হ'য়ে শিরোধার্য ক'রেছিল, আজ ওর কাছে তারা সব মিথ্যে হ'য়ে গেল। প্রকৃতির সাথে সংঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেল মানুষের শাসনের লৌহ-দণ্ড। সুস্থ বলিষ্ঠ সংস্কার-মুক্ত নিজস্ব প্রকৃতি, সেই তো মানুষের সত্য ধর্ম। কত বুদ্ধি দিয়ে, কত কৌশলের তৈরী মানুষের ওই মিথ্যে বিধি-নিষেধের ফাঁস। এই মিথ্যের বেসাতিকেই জগৎ সংসার নীতির রংএ সাজিয়ে জীবনের সারাৎসার ব'লে প্রচার করে। হাসি পায়, দুঃখও হয়। বিরাট বিশ্ব-স্মৃতির মাঝে মানুষ ক্ষুদ্র পিঁপড়ে; এক একটা

উঁই ঢিবির মত। কিন্তু জীবন দণ্ডধারী—মানুষের গুমর ভেঙ্গে তার চোখ খুলে দিয়ে তবে ছাড়বে। সে কি অমনি ছেড়ে দেবে? জীবনের রথ আনমনে আপন পথে চ'লে যায়,—কিন্তু সব কিছু আপনি ভেসে যায় সেই পথে...।

ক্রিসতফের দেহ-মনের দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে তার শক্তির স্ফূরণ। এক এক সময় ও সর্বনাশা হ'য়ে ওঠে—সব উড়িয়ে পুড়িয়ে গুড়িয়ে, যে-শক্তি ওর অভ্যন্তরে ডানা ঝট্‌পটিয়ে মরছে তাকে করালিনী করে তুলতে চায় শাসন-হীন অন্ধ প্রমত্ত পন্থায়। প্রতিক্রিয়া আসে তেমনি ভয়ংকর। মাটিতে আছড়ে পড়ে, কাঁদে, চুল ছেঁড়ে—কামড়ে আঁচড়ে খাব্‌লা খাব্‌লা মাটি তুলে খায়; মাটির মধ্যে নিজকে মিশিয়ে দিতে চায়। উদ্দাম কামনায় ওর সারা দেহ থর থর ক'রে কাঁপে।

বেড়াতে বেড়াতে একটা জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়ল ক্রিসতফ সেদিন সন্ধ্যায়। আলোর সাগরে চক্ষু দুটি যেন অবগাহন করতে লাগল, মাথা ঘুরে উঠল। যে পুলকোৎসারের রাগে ভুবন রাঙ্গা হয়, রূপ হয় অপরূপ, সে-পুলক-হিল্লোল ক্রিসতফের চিত্তে। আর তারি সাথে এসে মিশেছে সন্ধ্যার কোমল কবোঞ্চ আলোর মায়া। তরুশীর্ষে নীলাভ সোনালী কিরণের চিত্র-লেখা। মাঠের বুকে ধোঁয়ালি আলোর শিহরিত ঝলক। কাছেই ক্ষেতে কাজ করছিল একটি কিশোরী; পরনে খাটো স্কার্ট আর ব্লাউজ। ঘাড় আর বাহু দুটি অনাবৃত। নাতি-ক্ষুদ্র নাক, প্রশস্ত গাল, গোল মুখ, আর মাথায় বাঁধা রুমাল। রৌদ্র-তাম্রায়িত বর্ণে সূর্যাস্তের রাগ লেগেছে। শুধু লেগেছে নয়, মৃৎভাণ্ডের মত দিন-শেষের ওই সোনাটুকুকে একেবারে আপনার ক'রে নিয়েছে।

ক্রিসতফ মুগ্ধ হল। একটা বীচ গাছে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল আবেগ-বিহ্বল দৃষ্টিতে। কিশোরী কাজ করতে করতে এগিয়ে আসে

বনের প্রান্তে। ওই অঙ্গনার সঞ্চারিণী মূর্তি ছাড়া আর সব কিছু চোখের সামনে লুপ্ত হ'য়ে গেল। মেয়েটি ওর দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। অতি সাবধানে অপাঙ্গে কেবল একবার দেখে নিল—আতাম্র মুখ, তারি মাঝে নীল কঠিন চক্ষুজোড়া। নীচু হ'য়ে খড় কুড়াতে কুড়াতে এদিকে এগিয়ে এ'ল মেয়েটি। তার জামার খোলা গলার পথে দেখা যায় সুডৌল দু'টি কাঁধ আর ধীরে ধীরে তির্যক রেখায় নীচের দিকে-নেমে-যাওয়া সুগঠিত পীঠখানির মসৃণ নিটোলতা। যে-কামনা ক্রিসতফের বুকে ছিল অনুচ্চার, নিমেষে তাই উচ্চারিত হলো উদ্দাম হ'য়ে। পেছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরল কিশোরীকে। এবং তার মাথাটা দুহাতে জোর ক'রে পেছন দিকে উল্টে দিয়ে ঠোঁটের ওপর নিজের জলন্ত ঠোঁট ধরল চেপে। শুকনো ফাটা ঠোঁট দুখানিকে প্রবল বিলম্বিত চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁতের রাজ্যে এসে পৌঁছাল। ক্রুদ্ধ দশন ক্রিসতফের ঠোঁটেও সরক্ত চুম্বন এঁকে দিল। ক্রিসতফের হাত ফিরতে লাগল ওর অনাবৃত বাহু আর স্বেদাক্ত ব্লাউসের ওপর। মেয়েটি যতই ঝটাপটি করে ক্রিসতফ ততই জাপটে ধরে। ইচ্ছে করে অমনি ক'রে চেপে চেপে দম বন্ধ ক'রে ওকে মেরে ফেলবে। অবশেষে এক ঝট্‌কায় মুক্ত হয়ে কিশোরী ক্রিসতফকে থুথ ছিটিয়ে, গাল দিয়ে, ভয়ংকর কাণ্ড ক'রে তুলল। ক্রিসতফ দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে পালিয়ে গেল। পেছন থেকে আসতে লাগল ঢিল আর কদর্যতর ভাষায় গালি। ওর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—নারী ওকে কি ভাবল, লজ্জা সে জন্য নয়। লজ্জা ওর নিজের দুষ্কৃতের জন্য। হঠাৎ এ কি ক'রে বসল! এখন করবে কি ও! প্রায়শ্চিত্ত? নিজের ওপর বিপুল ঘৃণায় ওর সমস্ত অন্তর বিষিয়ে উঠল।

আসল ক্রিসতফ কোন পক্ষে কে জানে? একটা অন্ধ শক্তি ওকে

আচ্ছন্ন করে। এ শক্তির আওতা থেকে পালাতে চায় ক্রিসতফ, আসলে এ পলায়ন নিজেরই কাছ থেকে। কিন্তু কোথায় যাবে পালিয়ে? আচ্ছা, কাল কি করবে মেয়েটা ওর সম্বন্ধে? কি করবে ক্রিসতফ নিজে? ওঃ কতক্ষণ লাগছে এই চষা মাঠটা পেরুতে, এখনও কতদূর রাস্তা। রাস্তা! কোনো দিন কি পৌঁছুবে রাস্তায়! না, থামবে এখানে? যাবে মেয়েটির কাছে ফিরে!···তারপর? না, কোন্ মুখে যাবে? দু'হাতে গলা টিপে ধরেছিল, হত্যা করতে গিয়েছিল। হত্যা! পাগল হয়ে গিয়েছিল ক্রিসতফ, পাগল হয়ে গিয়েছিল।···তা হবে। সবই সম্ভব। অসম্ভব কিছু নেই। সবই সম্ভব, আর সবই সার্থক··· সার্থক পাপ···হ্যাঁ সার্থক পাপ·· সার্থক; তারও দাম আছে বৈ কি ধূলোর বুকে।

অন্তরের এই সংগ্রামে ওর যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। রাস্তায় পৌঁছে একটু হাঁফ ছাড়বার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে সেই কিশোরী আর একটি মেয়ের সাথে কথা কইছে দাঁড়িয়ে, ওর চীৎকার শুনে এ মেয়েটি ছুটে এসেছিল। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে হাসে।

[দুই]

সেবাইন

ক্রিসতফ বাড়ী ফিরে একেবারে নিজের ঘরে খিল আঁটল। কদিন আর বেরুলই না। নেহাৎ বাধ্য না হলে সহরের মধ্যেও যায় না

কোথাও। বাইরে, বিশেষ ক'রে মাঠের দিকে মোটেই নয়—ভয় রয়েছে সেদিনকার উনপঞ্চাশী মাতাল হাওয়াটাকে। ঝড়ের স্তব্ধতার পর দমকা হাওয়ার মত, কখন আচম্‌কা ওটা মাতামাতি শুরু করবে আর কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসবে কে জানে। ভেবেছিল শহরের মধ্যে থাকলে আর কোন অঘটন ঘটবে না। কিন্তু কে জানতো, শহরের পাঁচিল চিড় খাওয়া, আর তার সরু ফাটলটি ধরেই শত্রু আসবে।

নীচের তলায় ভাড়াটে থাকে এক বিধবা, তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে। বছর কুড়ি বয়স ; নাম ফ্রাউ সেবাইন ফ্রোয়েলিখ। রাস্তার ধারে একটা দোকান-ঘর আর দুখানি থাকার ঘর এবং সাথের বাগান, এই নিয়ে ওর এলাকা। ছোট বাগানটি তারের বেড়ায় ঘেরা। বেড়ায় উঠেছে আইভী-লতা। মানুষটা প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। মেয়েটি সকাল-সাঁঝ ওই বাগানে ব'সে মাটির মিঠাই বানায়। ওই ওর খেলা। বাগানখানি যে মালিকের স্নেহ-বঞ্চিত, সে-কথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে তার আগাছার ভাষায়। বাগান সম্বন্ধে সৌখীন গৃহস্বামী বেদনা পান। ভাড়াটেকে ক'বার বলেছেন কথাটা। হয়তো এ কারণেই ও নেপথ্য-চারিণী হয়েছে। শ্রীযুক্তা ফ্রোয়েলিখের ছিল জামা-কাপড়ের দোকান। দোকানের সংস্থানটি বেশ অনুকূল—শহরের একেবারে বুকের ওপর বড় রাস্তার ধারে। জাঁকিয়ে ওঠার সম্ভাবনাটা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু বর্তমান মালিকের উদাসীন স্বভাবের ফলে কি বাগান কি দোকান উভয় ক্ষেত্রেই নিষ্ফলতা নিষ্করুণ হয়ে উঠল। সম্ভাবনা চাপা পড়ল ঘাস-জঙ্গলেই। ব্যবসা আর বাগান তো অত্যন্ত ঝঞ্ঝাটের কাজ আর নিত্যকর্মও নয়। কিন্তু দৈনন্দিন গৃহকর্মও শ্রীমতী স্বহস্তে করেন না। ঝি আছে, সকালে এসে ঘরের কাজ সেরে দোকানে খানিকক্ষণ বসে। সে-সময়টা শ্রীমতী হয় শয্যায় নয় প্রসাধনে। ফোগেল-

গৃহিনীর মতে এ দুঃসাহসিক অনাচার। সুতরাং তরুণী ভাড়াটের ওপর তিনি খুশি নন। তাঁর নীতিতে নিজের হাতে কাজ করাই মেয়েদের আত্ম-মর্যাদার পরিচয়। বিশেষ ক'রে ক্রোয়েলিখের মত অবস্থা যার, তার পক্ষে এইরকম পরস্মৈপদী ব্যবস্থা শুধু হেয় নয়, পাপ।

মাঝে মাঝে ওর ঘরের পরদা তুলে তোলা থাকে। ওই ফাঁকে ক্রিসতফের ঘর থেকে ও ঘরখানা দেখা যায়। রাত্রিবাস পরে খালি পায়ে, অলস মন্থর ছন্দে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে ঘরের মালিক; অথবা মূর্তির মত ব'সে আছে আরশীর সামনে এক ভাবে স্থির হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রিসতফের চোখে চোখ পড়ে যায়। কিন্তু উঠে পরদাটি টেনে দেবে আলস্য-শিথিল দেহের ও মনের সে তাগিদ নেই। এ পক্ষের শালীনতা-বোধ অপেক্ষাকৃত বেশী; জানলা থেকে স'রে যায় সে নিজে, পাছে সেবাইন লজ্জা পায়। কিন্তু প্রলোভনটা মরে না; লজ্জায় লাল হ'য়ে আর একবার চকিত দৃষ্টিতে তাকায়। লতার মত পেলব অনাবৃত বাহু দু'খানি ধীরে ধীরে অলস ভঙ্গিতে ওপর উঠে মাথার চুলকে ঘিরে এলিয়ে পড়ে থাকে…আঙুলে আঙুলে জড়ান হাত দুটির ওপর মাথাটি পেছন দিকে এলিয়ে দিয়ে কে জানে কোন স্বপ্নে ডুবে থাকে ও মেয়ে; চম্‌কে ওঠে যখন অবশ হ'য়ে শিথিল হাত খসে পড়ে, অপরূপ দৃশ্য—কিন্তু ক্রিসতফ নিজের চোখে ধূলো দেয়—অপরাধটা ইচ্ছাকৃত নয় জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে ফেলেছে মাত্র। ফেললই বা দেখে, কোন লোকসান তো হয়নি, সঙ্গীত-সাধনায় কোথাও সুর কাটেনি। কিন্তু ভালো লাগে দেখতে। ভালো-লাগাটা সীমা ছাড়িয়ে ক্রমে দাঁড়ায় নেশায়; অবশেষে এমনি হয়ে দাঁড়াল যে ও-পক্ষের প্রসাধনে যে সময়টা লাগে তার চেয়ে বেশী সময় কাটে ক্রিসতফের প্রসাধিকাকে দেখার নেশায়। ফ্রাউ সেবাইন কোকেট নয়, এটা হলফ্ ক'রে বলা

চলে ; আসলে, ও অলস। ঔদাস্য শুধু ওর স্বভাবে নয়, দেহ-চর্চার বেলায়ও ও অমনি । রোজা বা এমেলিয়ার মত কুশল-প্রসাধনের পরিশ্রম ওর অসাধ্য। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে কাটে বটে অনেকক্ষণ—তবে তা শৃঙ্গারে নয়। একেবারে নিছক স্বপ্ন দেখে অমনি বিনা কাজে গা এলিয়ে। একটা পিন গুঁজেই ওর ক্লান্তি ··আয়নায় প্রতিফলিত মুখখানা ক্লান্তিতে করুণ। এত ক'রেও দিনের শেষে পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে পোষাকই পরা হ'য়ে ওঠে না।

প্রায়ই ঝি যাবার আগে সেবাইন তৈরী হ'য়ে বেরুতে পারে না। দোকান খালি প'ড়ে থাকে। খদ্দের আসে, ঘন্টা বেজে চলে। শোনে, কিন্তু চেয়ার থেকে উঠতেই পারে না। অবশেষে অতি ধীরে ধীরে ওঠে, তাড়াহুড়ো নেই। মুখের হাসিটি ক্ষুণ্ণ হয় না। পা পা ক'রে দোকানে আসে ; তেমনি অলস মন্থরতায় খদ্দেরের প্রার্থিত জিনিষটি খোঁজে। খানিকক্ষণ খুঁজে হয়তো খোঁজ মিলল না ; হয়তো বা মিলল কিন্তু সে নাগালের বাইরে। আনতে হবে মই, চড়তে হবে ওপরে, তবে সে বস্তু হস্তগত হবে। সর্বনাশ! এত ঝঞ্ঝাট! সত্যি বড় ঝঞ্ঝাট, কি আছে আর কি নেই তার হিসেব রাখা, যা নেই জোগাড় ক'রে ভাণ্ডার ভ'রে রাখা—তার চাইতে ব'লে দাও, নেই। আপদ চুকে যায়। বিরক্ত হ'য়ে খদ্দের চ'লে যায়। যাক্, কি আর করা যায়! যার খুশি যাবে, ধ'রে তো রাখা যায় না! আশ্চর্য গা-ছাড়া মানুষ। মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা। রাগ নেই, বিরাগ নেই। যে যা ইচ্ছে বলো। একটা অতি সহজ, শান্ত, স্থির ঔদাস্য ওর মুখে। ওর বিরুদ্ধে তোমার কোনো নালিশ থাকে তো তোমার মুখের কথা মুখেই থাকবে। বলবার প্রবৃত্তি হবে না, বোকা বনে যাবে নিজেই। বরঞ্চ ওর হাসির উত্তরে একটু মিষ্টি হেসে তুমি চলে যাবে নালিশ খারিজ ক'রে। অবশ্যি ফিরবে

না আর। না-ই এল, কি আর হবে। কিছুই যায় আসেনা ওর। খদ্দের অক্ষয় নয়, কিন্তু ওর হাসিটি অক্ষয়।

ছোটখাট ফ্লোরেন্স দেশীয় চেহারা। বাঁকা গভীর রেখায় আঁকা ভ্রূ। তারি নীচে দীর্ঘ পক্ষের অন্তরালে অর্ধোন্মীলিত দুরবগাহ দুটি নীল চোখ। নীচের পাতা সামান্য ভারী; সুন্দর একটি ভাঁজ পড়েছে তার তলায়। ছোট নাকটি যেন সূক্ষ্ম তুলির টানে আঁকা—ডগাটি একটু ওল্টান-মত। নাকের ঠিক নীচে আর একটি সূক্ষ্ম বাঁকা রেখা। শ্রান্ত ম্লান-স্মিতে আধ-খোলা ওষ্ঠ দুটি। নীচের ওষ্ঠটি কিঞ্চিৎ পুরু এবং মুখের নীচের অংশে ফিলিপ্পি লিপির আঁকা কুমারীর ছবির গাম্ভীর্য। গায়ের বর্ণে মাটির আভা; চুলে সোনার রাগ—খোঁপাটি কোনো মতে আলুথালু ক'রে হাতে জড়ান। মাঝারী গড়ন। চলা-ফেরা, নড়া-চড়ায় তন্দ্রার জড়িমা; সাজ পোষাকে অবহেলা—জামায় বোতাম নেই—জীর্ণ শ্রীহীন জুতো—সর্বাঙ্গে ঔদাস্যের তার লেবেল। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে চেহারাটি সুকুমার; কথা মধুর; ভঙ্গিতে সহজ সাদর আমন্ত্রণ। সন্ধ্যের সময় দাওয়ায় এসে যখন বসে, তরুণ পথচারীরা ফিরে ফিরে চেয়ে যায়। ওর মনে দাগ ফেলে না, কিন্তু চোখে পড়ে সব। মুখের কৃতজ্ঞতা-ভরা খুশির ভাবে তার স্বীকৃতি—নীরবে যেন বলে, 'ধন্যবাদ, ওগো ধন্যবাদ দৃষ্টির এমনি প্রসাদ রেখো আমার পর'।

খুশি ক'রে ওর খুশি, কিন্তু কষ্ট ক'রে খুশি করার দায় নেবার মত উদ্যম নেই ওই ওর স্বভাবে।

অয়লার-ফোগেলদের মাপকাঠিতে সেবাইন মূর্তিমতী অনাচার। ওর চলন ভালো না, বলন ভালো না, ওর কুঁড়েমী, ওর বিশৃংখল গৃহস্থালী, আলুথালু পোষাক, কিছুই ভালো না। ওর ভদ্র-ঔদাস্যটা গুমর, মুখের বাঁধা হাসিটি বিদ্রূপ; স্বামীর মৃত্যুতে ঘটা ক'রে শোক

করেনি, মেয়ের অসুখে কেঁদে ভাসায়নি, দৈন্য নিয়ে দীন হয়ে থাকে না, এসবই ওর বাড়াবাড়ি ; দৈনন্দিন সুখ দুঃখের মালা গাঁথা নীরব একান্ততা ওর ধৃষ্টতা। মেয়েটার স্বভাবও বদলায় না। ওর চিত্তাকাশের ডানা-মেলা পাখীটাও মুখ থুবড়ে পড়ে না। এও কি কম অপরাধ! ফোগেল-গৃহিনীর পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য। সব ওর ইচ্ছে ক'রে এদের জব্দ করার—অয়লারদের আবহমান কালের ঐতিহ্যকে মুখ ভ্যাংচাবার ফন্দী। অয়লারের শুক্‌নো কর্তব্যে ছুটির স্বাদ নেই। তাই খাটে ওরা নিরানন্দে, স্থির হয়ে পারে না বসতে ; পায়না তৃপ্তি। তাই ওরা কোলাহল করে, কলহ করে, হাসে না, খুশি হয় না। জীবন ওদের কাছে উদার আকাশ নয়—ওদের মতে কোনো সম্ভ্রান্ত সম্মানিত মানুষ মাত্রেরই নয়—এবং না-হওয়াটাই সুস্থ মনের লক্ষণ। অতএব জীবনটা ওদের ওড়ার জিনিষ নয়, বেত-মারা গুরু মশায়ের পাঠশালা। ওরা ক্রীতদাসের মত নীরবে দুঃখের বোঝা বহন করে। কিন্তু ও মেয়েটা শুয়ে, বসে, দিন কাটিয়ে আর কিছু না ক'রে বোঝাটাকে হাল্কা রাখে। ওই শান্ত ভাবটা ওর বিদ্রোহের ধ্বজা। তবু ওই বিদ্রোহিনীই পায় পূজো। এই যদি হয় আভিজাত্য—তবে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, যে সকলেই পাগল হয়নি। ফোগেল-গৃহিনীর মতো সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ এখনও আছে সেইটেই ভরসার কথা। পারিবারিক ভোজন-বৈঠকীতে সাধারণতঃ সেবাইন থাকে মুখ্য আলোচ্য। ওর ওপর থাকে খড়খড়ির ফাঁকে ওদের গোপন সতর্ক পাহাড়া। ক্রিসতফ অন্যমনস্ক ভাবে শোনে। কিন্তু কান দেয় না, কারণ প্রতিবেশী-চর্চা এ বৈঠকীর দৈনন্দিকী। সেবাইন সম্বন্ধে ও জানেই বা কি। দেখেছে তো শুধু দু'খানি খোলা বাহু আর দুটি শুভ্র কাঁধ। ভালো লেগেছে বটে। কিন্তু দু' একটি অবয়বই তো গোটা মানুষটা নয়। আস্ত মানুষটার ভালো-মন্দের নিরিখ তার অবয়ব নয়। তবু মমতায় মন

ভরে। এবং শ্রীমতী ফোগেলকে বিদ্রূপ ক'রে চলতে যার ভয় নেই সেই নিঃশঙ্কিনীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়।

ভিতরের আঙ্গিনায় সারাদিন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। বিকেলটা আর থাকা যায় না ওখানে। রাস্তার ধারে ঘরগুলোতে তবু কিছু হাওয়া আছে। অয়লার, তার জামাই আর লুইসা প্রায়ই গিয়ে বাইরের সিঁড়িতে বসে সন্ধ্যার সময়। এমেলিয়া আর রোজা কেবল দু' একবার উঁকি মেরে যায়। তাদের ছুটি নেই। কাজের মানুষ। নিজেরা বসে না; বসে-থাকার দলকে দু'চোখে দেখতে পারে না। দিন রাত্রি সপ্তমে-চড়া স্বগতোক্তিতে সেই কথাটা ব্যক্ত হ'তে আর বাকী নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংসারের মানুষ যেন পাথর, এমেলিয়ার তীক্ষ্ণ কথার ধারে তাদের গায়ে আঁচড় বসে না। সুতরাং ও কাজ করে সশব্দ-তাণ্ডবে। এ বাড়ীর কুঁড়ে মানুষগুলোকে যে ও কত তুচ্ছ করে তা জানিয়ে দেবার ওই হ'লো ওর ভাষা। এ বিষয়ে রোজা মায়ের আদর্শ ছাত্রী।

অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর জামাই আবিষ্কার করেন তাদের ঠাণ্ডা লাগছে। সুতরাং গিয়ে ঘরে ঢোকেন এবং শয্যায় আশ্রয় নেন সন্ধ্যা না উতরোতে। শিগ্‌গির ঘুমানোটা ওদের অভ্যাস। বাঁধা অভ্যাসে এতটুকু নড়চড় হ'লে ওদের মনে হয় সর্বনাশ হ'ল।

রাত ন'টার পর বাইরে থাকে কেবল লুইসা আর ক্রিসতফ। সারা দিন লুইসার কাটে ঘরের মধ্যে নির্জন কারাবাসে। বিকেলের দিকে ক্রিসতফ চেষ্টা করে মাকে নিয়ে একটু বাইরে বসতে। একা সে বাইরে আসবে না, রাস্তার গোলমালকে ভারী ভয়; রাস্তাটাই ছেলে-পুলেদের খেলার মাঠ। ওদের কোলাহল, আর খেলার উৎসাহে পাড়ার যত কুকুরের দল ভারী উৎসাহিত হয়ে ওঠে—দল বেঁধে তারা কোরাস

দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে। কোথা থেকে যেন পিয়ানোর শব্দ আসে; ওদিকে কে ক্লারিওনেট্ বাজায়···মানুষের কথা-বার্তা, আনা-গোনা···বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জটলা। এই শব্দের হাটে একলা লুইসার মনে হয় ও যেন অথৈ জলে পড়েছে—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে; ছেলেকে পাশে নিয়ে সাহস আসে, ভয়ের বস্তু তখন ভালো লাগে। ক্রমে ক্রমে আসে রাত্রির স্তব্ধতা, বালখিল্যের দল ঘুমিয়ে পড়ে; কুকুরেরা কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গোঁজে···জটলা ভেঙ্গে যে যার ঘরে যায়। ধীরে সব কোলাহল শান্ত, পথ-প্রতিবেশ নিঝুম হয়ে যায়। বাতাসও যেন পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এবারে স্বভাব-কোমল স্বরে লুইসা এমেলিয়া বা তার মেয়ের কাছ হ'তে শোনা সারাদিনের টুক্‌রো টুক্‌রো খবর শোনায় ছেলেকে। এসব খবর লুইসার আগ্রহের বস্তু নয়, ছেলের সাথে যোগ-সূত্র। আর কোনো বিষয় হাতের কাছে মেলে না। ক্রিসতফ বোঝে অবলম্বন যতই বাজে হোক, মার প্রয়োজনের দিক থেকে এদের আসল মূল্য অনেক। কাজেই মায়ের কথা একটিও ওর কানে না গেলেও, মুখে চোখে আগ্রহ থাকে সযত্ন-উচ্চারিত। সারাদিনকার ইতিহাস ওর চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে; ও তারি মধ্যে হারিয়ে যায়।

একদিন রাতে ঠিক এমনি সময়ে, দোকান ঘরটার দরজা খুলে গেল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে; বসল ওদেরই কাছ থেকে অল্প দূরে সব থেকে অন্ধকার জায়গাটায়। ক্রিসতফ মুখ দেখতে পেল না, কিন্তু চিনতে পারল। ওর চিন্তার জাল যেন দম্‌কা হাওয়ায় কুটি কুটি হ'য়ে উড়ে গেল। সাথে সাথে বাতাসে লাগল মধু। লুইসা এমনি কথায় মগ্ন, সে টের পেল না কিছু। মায়ের প্রতি ক্রিসতফের মনোযোগ যেন হঠাৎ বেড়ে গেল—নীরব-শ্রবণ মাঝে মাঝে স্বল্প-ভাষণে জীইয়ে উঠল কোন

অজানা প্রাণ-স্পর্শে। ওর কথা আর কেউ শুনুক হয়তো এমনি একটা গোপন ইচ্ছা রয়েছে মনে। অদূরের মূর্তিটি কিন্তু নিশ্চল ; ঈষৎ অসমান পা দু'খানি, শিথিল-ভাবে একখানি আর একখানির ওপর রাখা। হাত দু'খানি আড়াআড়িভাবে এলিয়ে আছে কোলের 'পর। আনমনা দৃষ্টি সামনের দিকে। লুইসার ঘুম পেয়ে গেল, সে চ'লে গেল ভেতরে। ক্রিসতফ গেল না, বসবে আর একটু।

রাত প্রায় দশটা। দোকান-পাটও বন্ধ হ'য়ে এল। জানালাগুলো খানিকক্ষণ মিট্‌মিট ক'রে অন্ধকার হয়ে গেল। পূর্ণ-নীরবতার বুকে রইল দুটি নীরব প্রতিমা—যেন হৃদ্‌পিণ্ড থেমে গেছে, দৃষ্টি গেছে পাথর হ'য়ে। কেউ কারো দিকে চায় না। কেউ যেন কারো চেনা নয়। দূর প্রান্তর হতে কাটা ফসলের গন্ধ আসে।

কাছেরই একটি বাড়ীর অলিন্দ থেকে আসে লবঙ্গ-লতিকার সৌরভ। বাতাসে স্পন্দন নেই—মাথার ওপরে ছায়াপথের জ্যোতির্ময় বিস্তার। দক্ষিণে চিমনীটার ঠিক ওপরে রক্তাভ জুপিটার যেন তার রথের ঈষ বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের পাণ্ডুর নীলশ্রীর বুকে তারার দল ডেইসী ফুলের সমারোহে ফুটে আছে। পল্লীর গির্জায় ঢং ঢং ক'রে ১১টা বাজল—সাথে সাথে অন্য গির্জার ঘড়িগুলোতে জাগল তার ঝংকার—কোনটা স্ফুট সু-উচ্চার একক শব্দে, কোনটা চাপা গুঞ্জিতে। বাড়ীর ঘড়িগুলিতেও কোথাও মৃদু কোমল বিলম্বিত-সঙ্গীতে, কোথাও কোকিল-কুহুতে সময়ের সংকেত ধ্বনি জাগল।

দুজনেরই যেন হঠাৎ একই সাথে তন্দ্রা ভাঙ্গল। একই সাথে চেয়ার ছেড়ে উঠল। ঘরের দরজায় পা বাড়িয়ে, অকস্মাৎ নিঃশব্দ অভিবাদনের পর ক্রিসতফ চ'লে গেল তার নিজের ঘরে। সন্তর্পণে মোমবাতিটি জ্বালল, তারপর হাতের তেলোয় মাথা গুঁজে ডেস্কের সামনে বসল। শূন্য

মনের ওপর দিয়ে সুদীর্ঘ প্রহর ভেসে গেল। হৃদয়-মন্থন করা গভীর নিশ্বাস ফেলে বিছানায় এল গভীর রাতে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই যন্ত্র-চালিতের মত দাঁড়াল এসে জানালার ধারে। তাকাল সেবাইনের ঘরের দিকে। তার ঘরের পর্দা নামানো। সারা সকাল, সারা দিন পর্দা আর উঠল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা মাকে নিয়ে ক্রিসতফ আবার বাইরে এসে বসল। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে চলল এই প্রচ্ছন্ন অভিসার। লুইসার ভালো লাগছে—খাওয়ার পরেই দরজা জানালা সেঁটে প্যাঁচার মত অন্ধ-ঘরে বন্দী দশায় থাকা ঘুচেছে ক্রিসতফের। যথা নিয়মে, যথা-নির্দিষ্ট আঁধার-টিতে দেখা যায় একখানি নীরব চেনা ছায়া। ত্বরিত মস্তক-হেলনে পারস্পরিক নীরব অভিবাদন লুইসার চোখে পড়ে না। ক্রিসতফ মায়ের সাথেই কথা ব'লে চলে।

সেবাইনের মেয়ে রাস্তায় খেলা করে। মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। ন'টা বাজলে মেয়েকে ঘুম পাড়াতে ভেতরে যায়। ঘুম পাড়িয়ে নিঃশব্দে নিজের জায়গায় আবার ফিরে আসে। ওর ফিরতে একটু দেরী হলে ক্রিসতফের ভয় হয়, আর বুঝি এল না। কান পেতে রাখে ও-ঘরে পায়ের শব্দ শোনা যায় কিনা। খুকু ঘুমায়নি—তার দুষ্টামীভরা খল খল হাসির শব্দ ভেসে আসে। তারপর পোষাকের হাল্‌কা মোলায়েম খসখসানীর ভাষায় বিশেষ একজন যে আসছে, তারি খবর আসে। ক্রিসতফ মুখ ফিরিয়ে মায়ের সাথে ভারী মন দিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করে। কখনও ওর মনে হয় সেবাইন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অনাবৃত ফেরাবে না ওই প্রসন্ন দৃষ্টির বরদান ; নিজের দৃষ্টি তুলে ধরে—দৃষ্টি তো নয়, যেন দৃষ্টির অঞ্জলি ; কিন্তু কখনও চার চোখ মেলে না।

সেবাইনের মেয়ে ওদের মাঝখানে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। খুকু অন্য ছেলেপুলেদের সাথে রাস্তায় খেলায় মাতে। থাবায় মুখ লুকানো ঘুমন্ত ভালোমানুষ কুকুরটাকে খামোখা খোঁচা দেয় সবাই মিলে। লাল চোখ মেলে গোঁ গোঁ ক'রে রেগে ওঠে জানোয়ারটা। মানবকের দল ভয় পায়। ভয় পাওয়াটাই ওদের খেলা। হাততালি দিয়ে ছুটে পালায় সব এদিক ওদিক। খুকু ভয়ানক চীৎকার ক'রে ছোটে আর পেছনে ফিরে ফিরে চায়, সত্যি যেন কুকুরটা তাড়া করেছে। তারপর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুইসার। স্নেহে গ'লে গিয়ে লুইসা মধুর হাসে। খুকীকে কোলে নিয়ে আলাপ জমায়, সেই সূত্রে আলাপ জমে তার মায়ের সাথে। ক্রিসতফ এ আলাপে যোগ দেয় না। সেবাইনের সাথে একটি কথাও হয় না। এ পক্ষও চুপ। পরস্পরকে এই অস্বীকার যেন ওদেরই স্বেচ্ছা-ব্যবস্থা। কিন্তু মা আর সেবাইনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার ক্ষুদ্রতম টুকরো-টুকুও ও পরম যত্নে খুঁটে খুঁটে আহরণ করে। মা কি তার কোনো খবর রাখে। সে ভাবে ছেলে তার অভদ্র। নূতন পরিচিতার কাছে এজন্য লুইসা লজ্জায় সংকুচিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যাকে উদ্দেশ ক'রে এ লজ্জা সে স্বয়ং কি রকম বিব্রত হয়ে পড়ে। দু' একটা কথা বলে কোন ছলে ভেতরে চলে এসে বাঁচে।

লুইসার হল সর্দি। একটি সপ্তাহ সে বাইরে এল না। রাতের নীরব সভায় সেবাইন আর ক্রিসতফ হল একান্ত। কিন্তু একান্ততা অন্তরঙ্গ হয় না। কেন জানি ভয় করে। সহজ হবার চেষ্টায় সেবাইন মেয়েকে নিয়ে পড়ল। তাকে কোলে বসিয়ে এমনি আদর করতে লাগল, যে আদরটা হলো অত্যাচার, এবং বাড়াবাড়িতে ছোট মেয়েটা অস্থির হয়ে উঠল। ক্রিসতফ অপ্রতিভ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না, এবার কি করবে। চোখ ফিরিয়ে থাকবে? না যোগ দেবে ওদের সাথে!

পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ না থাকলেও, পরিচয় বাকী নেই লুইসার দৌলতে। ভাবলে, কিছু না বলাটা অশোভন।

কয়েক বারই আরম্ভ করতে গেল। কিন্তু কথা যেন গলায় বেঁধে থাকে। মুস্কিলের আসান করে খুকু লুকোচুরি খেলতে খেলতে ক্রিসতফের চেয়ারের পেছনে লুকয়। ক্রিসতফ ওকে ধরে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খায়। ছোটদের যে খুব ভালোবাসে তা নয়। তবু আজ খুকুকে চুমু খেয়ে কেমন অদ্ভুত ভালো লাগে। খেলায় ব্যস্ত খুকু—কোল থেকে নামবার জন্য তার কি ছটফটানী। ক্রিসতফ ক্ষ্যাপাবার জন্য তাকে রেখেছে ধরে। খুকু কামড়ে দিলে ওর হাতে। ক্রিসতফ হাত ছেড়ে দিল। খুকু ধপাস করে মাটিতে প'ড়ে গেল। সেবাইন হেসে উঠল। দুজনে খুকুর দিকে তাকিয়ে দু'একটা কথা কওয়ার প্রয়াস পেল বটে, কিন্তু সে নিতান্ত বাজে, অবান্তর কথা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রিসতফ কথার খেই টেনে রাখতে পারলে না [রাখাটা ওর কর্তব্য]। কথা নেই। সেবাইন-এর কাছ থেকেও কোন সাহায্য মিলল না। কেবল ক্রিসতফের নিজের কথার প্রতিধ্বনিই ফিরে আসে।

'চমৎকার সন্ধ্যাটি।'

'হ্যাঁ, সত্যি ভারী চমৎকার।'

'ভেতরের উঠোনটা ভারী গুমোট, ওখানে থাকা যায় না, দম বন্ধ হয়ে আসে।'

'সত্যি, বড় গুমোট ওখানটায়।'

তারপর আবার কথা হাতড়ান। সেবাইন হঠাৎ আবিষ্কার করে, মেয়েকে ঘুম পাড়াবার সময় হয়েছে। মেয়েকে নিয়ে সেই যে ভেতরে ঢুকল আর বেরুল না।

ক্রিসতফ ভয় পায়—সেবাইন বুঝি ওর সাথে একলা থাকতে

চায় না। মা যতদিন না বের হন হয়ত সে পালিয়েই ফিরবে ছল ক'রে। কিন্তু ওর সমস্ত আশংকার নিরসন ক'রে সেবাইন ঠিক সময়টিতে রোজকার মত এল পরের দিন ; এবং দেখা গেল আজ ওর কথা বলার ভারী উৎসাহ। কিন্তু উৎসাহটি যে খাঁটি নয় কৃত্রিম, তা বুঝতে দেরী হল না। স্পষ্ট বোঝা গেল সেবাইন আজ তার স্বভাবের ওপর জুলুম করছে। কথা বললেও স্বচ্ছন্দ হ'তে পারছে না সে। আলাপ হ'লো প্রশ্নোত্তর-সর্বস্ব এবং সুদীর্ঘ নীরবতায় খণ্ডিত। এত দীনতা ? নিজের উপর ক্ষেপে উঠল সেবাইন। অটোর সাথে প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ে ক্রিসতফের। তখনও কথা বলতে পারেনি, এখন আরো পারল না। অবিশ্যি অটোর মত ধৈর্য নেই সেবাইনের। খানিকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ও হাল ছেড়ে দিলে। কথা যোগাল না।

নিরুপায় হয়ে ক্রিসতফও চুপ করল।

তবু মৌন ভ'রল মধুর প্রশান্তিতে, রাতখানি হলো নিবিড় ; হুটি তরুণ প্রাণ চিত্তের গভীরে হ'লো একান্ত। সেবাইন ব'সে ব'সে আনমনে দোলে, যেন স্বপ্ন-সায়রের ঢেউএর দোলায়. ক্রিসতফেরও মন ডানা মেলে কোন অচিন আকাশে। কারো মুখে কথা নেই। অমনি কাটে কতক্ষণ কে জানে। তারপর ক্রিসতফ যেন নিজের সাথে আলাপ জোড়ে। গাড়ী বোঝাই ষ্ট্রবেরী যায় রাস্তা দিয়ে। বাতাসে তার সৌরভ আসে ভেসে। অস্ফুট উল্লাসের ধ্বনি অমনি বেরিয়ে আসে ক্রিসতফের কণ্ঠ থেকে। সেবাইন তু'একটা কথা কয় জবাবে। তারপর আবার সব চুপ। এই থেকে থেকে চুপ হ'য়ে যাওয়া, আর মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো হালকা কথার ফুলকারী, ওরা যেন অন্তর ভ'রে উপভোগ করছিল। তু'জনের মনে একই কথা নাচে, বুকে একই স্বপ্ন দোলে। কিন্তু সে কথা ওরা বোঝে না,

স্বপ্নের খেই পায় না। যদি বা বোঝে, সে থাকে ওদের নিজেরও অগোচর গোপন মণি-কোঠায়। রাত যখন এগারটা বাজল, মিষ্টি হেসে বিদায় নিলে।

পরদিন ওরা আর কথা কইবার চেষ্টা করল না। অব্যক্ত মৌনে পায় গভীরতর ভাষা। অনেকক্ষণ পরে পরে ছিটকে পড়া দু' একটা কথায় জানিয়ে দিয়ে গেল একই গানের সুর বাজে দুজনার বুকের তলায়।

সেবাইন হাসে। বলে :

'চুপ ক'রে থাকাই ভালো। আমরা ভাবি কথা না কইলে বুঝি চলবেই না। আসলে যত বিপদ কথা কইলেই।'

স্থির বিশ্বাসের সাথে ক্রিসতফ বলে :

'যা বলেছ। কিন্তু সবাই যদি এ সত্যটা মেনে চলে—'

দুজনেই হেসে ওঠে। দুজনেরই মনে পড়ে এমিলিয়ার কথা।

সেবাইন বলে :

'ওরে বাপ্ স! ওকে দেখলেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'যার কথা বলছ তার হাত-পায়ের রক্ত বোধ হয় সাত জন্মে ঠাণ্ডার লেশও হয় না। সর্বদাই টগ্ বগ্ ক'রে ফোটে।' মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে বলে ক্রিসতফ।

ওর ভঙ্গি দেখে সেবাইনের হাসি পায়।

'তা হাসবে বৈকি! তোমার গায়ে তো আর আঁচ লাগছে না।'

'লাগছে না-ই তো। লাগতে দিলে তো! ওই ভয়েই তো ঘরে দোর এঁটে থাকি।' অতি মৃদু, অতি মোলায়েম, অতি চিক্কণ একখানি নীরব হাসি সেবাইনের ওষ্ঠে সূক্ষ্ম রেখায় ফুটে উঠল। সন্ধ্যার সৌম্য প্রশান্তির পটে এই স্নিগ্ধ হাসিটুকু অনুপম হ'য়ে উঠল। উদার উন্মুক্ত

নির্মল বাতাসে ক্রিসতফের বুক উঠল ভরে। হাত-পা টান করে আড়ামোড়া ভেঙ্গে ব'লে উঠল : 'চুপ করে থাকাই ভালো।'

'ঠিক বলেছ।'

'সত্যি, কথা না কয়ে দিব্যি চলে যায়। এই তো তোমায় আমায় বোঝাবুঝি হয়ে গেল, কই একটা কথাও তো কইতে হলো না।'

আবার গভীর নীরবতা। স্নিগ্ধ মৃদু স্মিতের আখরে সে নীরবতায় পরিপূর্ণ-হৃদয়ের প্রশান্তি লেখা। কিন্তু অন্ধকারে সে-লেখা পরস্পরের দৃষ্টির আড়াল হ'য়ে রইল।

যতক্ষণ কাছে থাকে—দুইটি চিত্তে বাজে একই রাগিনী। কিন্তু সে-খবর কি ওরা পায়! পরস্পরকে কতটুকু জানে ওরা! সেবাইনের কোন কৌতূহল নেই, কিন্তু ক্রিসতফ জানতে চায় বৈকি! পরের দিন সন্ধ্যায় শুধায় :

'তুমি গান ভালোবাসো?'

'উঁহুঁ, একটুও না। গানের মাথামুণ্ড বুঝিই না কিছু, ভালো লাগবে কি ছাই!' নির্বিকার জবাব এল।

এমনি অবলীলায়, এমনি সহজে, বিনা দ্বিধায় আপনাকে খুলে ধরা!

মিথ্যে কথা শুনে শুনে ক্রিসতফ যেন পাগল হয়ে গেছে! জিজ্ঞাসা করো কাউকে, 'গান ভালোবাসো—অমনি মাথা নেড়ে এমনিভাবে বলবে 'নিশ্চয়, শুধু ভালোবাসি—গান আমার প্রাণ!' মনে হবে, কথাটা বুঝি সত্যি। কিন্তু গান শুনবার সময় মুখের দিকে তাকাও, মনে হবে কুইনিনের বড়ি গিলছে। আজ ও মুগ্ধ হয়ে গেল। যে মানুষটা বলতে পারলে অকপটে যে গান ভালোবাসে না, সে মহাপুরুষ।

আবার জিজ্ঞাসা করে : 'পড়তে ভালোবাসো?'

'উঁহুঁ, বই টই নেই।'

আচ্ছা ক্রিসতফ বই এনে দেবে ওকে।

'ওরে বাবা ! প্যাঁচা-মুখো গম্ভীর গম্ভীর বই ?' ওর মুখে শংকার ছায়া পড়ে।

'না না গম্ভীর বই হবে কেন ? অন্য বইই দেব—কবিতার বই।'

'তারই বা ওজন কম কি ?'

'আচ্ছা, উপন্যাস ?'

ঠোঁট ফুলে ওঠে সেবাইনের।

অবাক্ করলে, উপন্যাসও ভালো লাগেনা মেয়ের ?

না, তা লাগে বটে। তবে ও বইগুলো যা সাংঘাতিক বড়। শেষ করা যায় অত বড় বই কখনও ? আরম্ভ তো করে। পাতা ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে পড়েও যায়। কিন্তু পড়তে পড়তে এগিয়ে তো গেল—ওদিকে ততদিনে গোড়া বেশ পরিষ্কার হয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত যায় খেই হারিয়ে এবং বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়তে হয়। সেবাইনের পড়া ওই পর্যন্ত।

'এই বুঝি তোমার বই ভালো লাগা ?'

'ভালো লাগবে কি, সব তো মিথ্যের ঝুরি। আর বেশী ভালো লেগেই বা কি হবে ? বই ছাড়া ভালো লাগবার আরও ঢের ঢের জিনিষ আছে।

'ও, বুঝেছি—থিয়েটারে যাওয়া হয় খুব।'

'উঁহুঁ।'

'যাওনা থিয়টারে ?'

'বাপ্ স্ যে গরম আর লোক গিস্ গিস্ করে ! আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ধরে যায়। আর যারা পার্ট করে, যেন বহুরূপী সব ! তার চেয়ে বাড়ীই ভালো !'

এখানে ক্রিসতফ একমত ওর সাথে।

'কিন্তু থিয়েটারে দেখার কত জিনিষ আছে। এই নাটকটাই ধরো না!'

অন্য মনস্কভাবে সেবাইন জবাব দেয়: 'তা ঠিক কিন্তু আমার সময় নেই।'

'সারাটা দিন করো কি?'

হাসে সেবাইন।

'কত কি—'

'তা তোমার আবার দোকানটাও আছে।'

'দোকান!' নির্বিকারভাবে জবাব দেয়: 'দোকানে আর কতটুকু সময় লাগে!'

'মেয়েটি রয়েছে, অনেকটা সময় তার পেছনেও যায় তো।'

'না না ভারী লক্ষী মেয়ে খুকু। নিজেই সারাদিন খেলে। আমার ধারও ধারে না।'

'তা হলে?'

নিজের অবিবেচনায় নিজেই লজ্জা পায় ক্রিসতফ। কিন্তু সেবাইনের বেশ মজা লাগে। বলে:

'হাজার হাজার কাজ, তার কি লেখা-জোখা আছে।'

'কি কাজ!'

'কি কাজ শুনবে! কত বলব! এই ধরো এক—ওঠা, দুই—মুখ ধোয়া, তিন—সাজ পোষাক পরা, চার—কি রান্না হবে তার ভাবনা, তারপর, রান্না করা, খাওয়া—এক খাওয়া শেষ হলে আর এক খাওয়ার কথা ভাবতে বসো, ঘর ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা—কত কি করা! এসব করতেই তো দিন কাবার। তারপর সারাটা দিনই বুঝি বলদের মত

কেবল কাজের ঘানিতে ঘোরা যায়! কিচ্ছু না ক'রে অমনি বসে থাকার জন্য সময় চাইনে বুঝি!'

'তোমার বিশ্রী লাগে না?'

'বিশ্রী লাগবে কেন? একটুও লাগে না।'

'যখন একদম কোনো কাজ থাকে না, তখনও না? ভালো লাগে হাত পা কুঁকড়ে বসে থাকতে?'

'বা রে! স্রেফ বসে থাকতেই তো সব চাইতে বেশী মজা! যা ভালোটা লাগে আমার!'

পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হেসে ওঠে।

'বাঃ বাঃ চমৎকার! আয়েস আর কাকে বলে --' ক্রিসতফ বলে। 'অমন ঠুঁটো হয়ে থাকতে মোটেই পারি না আমি।'

'পার না! সত্যি! কিন্তু আমার তো মনে হয় বেশ পারো।'

'শিখছি সবে।'

'বেশ বেশ, শেখ। পারবে তুমি।'

কথা শেষ হ'য়ে গেলে ক্রিসতফ দেখল ও একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। চমৎকার একটা স্বস্তি লাগছে। কেবল চোখের একটু দেখা, ওতেই ও এত খুশি। চিন্তা ভাবনা, অস্বস্তি, উত্তেজনা, সব যেন বাষ্পের মত উড়ে যায়। যতক্ষণ কথা কইছিল সর্ব-সংশয়ের, সর্ব-ভাবনার ওপরে উঠে চিত্ত যেন ভাসছিল হাল্কা মেঘের মত। চুপ ক'রে সেবাইনের কথা ভাবলেই যেন ও লঘু হয়ে হাওয়ায় উড়তে থাকে। কিন্তু নিজের কাছেও এ কথাটা স্বীকার করতে ওর ভয়। এদিকে সেবাইন কাছে এলে এক অনুপম রসে হৃদয় ওর ভরে ওঠে, আপনাকে হারিয়ে ফেলে তার গভীরে। রাতের নিদ্রা অবধি এমনি শান্ত, এমনি গভীর হ'লো, ভাবলে এতদিন কোথায় ছিল এ নিদ্রা!

কাজ থেকে ফিরে এসে দোকানে এক বার উঁকি মারে রোজ। সেবাইনের সাথে দেখা হয় ; একটি দিনও ফাঁক পড়ে না। একটু মিষ্টি হাসি, সম্ভাষণ দেয়া নেয়া। কখনও দরজায়ই দাঁড়িয়ে থাকে সেবাইন। দু'একটা কথা হয় হয় তো। দরজা খুলে খুকুকে ডেকে মিষ্টির ছোট্ট মোড়কটি হাতে তুলে দেয় ক্রিসতফ।

একদিন ও ঠিক করলে দোকানের ভেতরটা দেখবে। ওয়েষ্টকোটের বোতাম কেনার ছলে এসে ঢুকল দোকানে। সেবাইন খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু পাওয়া গেল না বোতাম। সব কিছু মিশে খিচুড়ী হয়ে আছে। তার ভেতর থেকে বেছে বের করা এক মহা ব্যাপার। ওর অগোছাল স্বভাব ক্রিসতফ টের পেয়ে ফেলবে ভেবে সেবাইন একটু দমে যায়। ক্রিসতফ হেসে নিজেই ভালো ক'রে খুঁজবার জন্য ঝুঁকে পড়ে।

দুই হাতে দেরাজগুলো চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সেবাইন :

'দেখো না দেখোনা, সব খিচুড়ী পাকিয়ে আছে—' নিজেই খোঁজে ব্যস্ত হয়ে। কিন্তু ক্রিসতফ ওকে ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়ে দেয়। ও রেগে গিয়ে দেরাজ বন্ধ ক'রে বলে :

'যাও যাও, নেই বোতাম এখানে। পরের গলিটায় লিসির দোকানে দেখগে যাও। ওখানে ঠিক পাবে। সব থাকে ওর দোকানে।' ব্যবসার এই অপূর্ব পদ্ধতি দেখে হেসে ওঠে ক্রিসতফ।

'এই তোমার ব্যবসা করা? অমনি ক'রে খদ্দের ভাগিয়ে ব্যবসা করো নাকি?'

'তা—, হ্যাঁ ভাগাই তো। কিন্তু তুমি আর ভাগলে কোথায়?' আন্তরিকতার সুর ঢেলে বলে সেবাইন। একটু লজ্জিত হয়। বলে :

'ওঃ গুছিয়ে রাখা কি যে সে ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। রোজ ভাবি গোছাব—নাঃ, ঠিক কাল যদি না গোছাই দেখো তুমি।'

'সাহায্য করব?' ক্রিসতফ বলে।

'না লাগবে না। অবশ্যি পেলে তো ভালোই হ'ত। কিন্তু টিকটিকির দল সব হাঁ ক'রে আছে। এক্ষুণি ঢাক পেটাবে পাড়াময়। তা ছাড়া ওই তো কাজ। তার জন্য আবার সাত পাড়ার মানুষ ডাকা! ছিঃ ছিঃ লজ্জার কথা!' আবার কথা চলে :

'বোতাম কিনবে না?' ক্রিসতফকে বলে। 'কই যাচ্ছ না লিসির দোকানে?'

'কক্‌খনও যাব না। তোমার দোকান গোছান হোক। এখান থেকেই নেবখন।'

এক্ষুণি কি যে বলল সেবাইন নিজেই ভুলে গেছে। জবাব দিল :

'ওরে বাবা, তা হ'লেই হয়েছে! অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হবে তা হ'লে!'

ওর এই সরলতায় দুজনেই কৌতুকে হেসে ওঠে।

ক্রিসতফ বন্ধ দেরাজটার কাছে এগিয়ে এসে বলে :

'দাও আমি দেখছি।'

সেবাইন ছুটে এসে বাধা দেয় : 'না না, ছেড়ে দাও লক্ষীটি, আমি বলছি বোতাম নেই।'

'যদি বেরয়! রাখো বাজী।'

বোতাম তক্ষুণি পাওয়া গেল। বিজয়ের হাসি উছলে উঠল ক্রিসতফের মুখে। আরও বোতাম চাই ওর। আবার ঘাঁটতে শুরু করে। কিন্তু সেবাইন হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নেয় ছোঁ মেরে। ওর গর্বে ঘা লাগে। নিজেই খুঁজতে সুরু করে।

আলো নিবে এল। জানালার কাছে সরে আসে সেবাইন। ক্রিসতফ একটু দূরে বসে আছে। খুকু ওর কোলে জাঁকিয়ে বসে কল্ কল্ করছে। শুনবার ভান করে ক্রিসতফ, এবং আনমনা ভাবে দু' একটা উত্তরও দেয়। চোখ দুটী রয়েছে সেবাইনের দিকে। অনুভব করছে সেবাইন। ও আরও ঝুঁকে পড়ে বোতামের বাক্সের উপর। ওর ঘাড় এবং গালের সামান্য একটুই কেবল দেখতে পাচ্ছে ক্রিসতফ। তবু দৃষ্টির ছোঁয়ায় ওর গালটা লাল হ'য়ে উঠল: ওই লালের রাগ লাগল কি ওর নিজের মুখেও!

খুকু অনর্গল কথা ব'লে চ'লেছে, জবাব না পেয়েও। সেবাইন যেন পাথর হ'য়ে গেছে। কি করছে দেখা যাচ্ছে না। ক্রিসতফ ঠিক জানে কিছু করছে না ও। হাতের বাক্সটার দিকেও ওর চোখ নেই। নিস্তব্ধতা জমে ওঠে থরে থরে। খুকু অস্থির হ'য়ে ওঠে। ক্রিসতফের কোল হ'তে নেমে বলে: 'তোমরা কথা বলছনা কেন?'

সেবাইন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিল। বাক্সটা হাত থেকে নীচে প'ড়ে গিয়ে বোতামগুলো ঘরময় ছড়িয়ে প'ড়ল। খুকু উল্লাসে হাততালি দিয়ে ওঠে। হামাগুড়ি দিয়ে ছোটে পলাতক বোতামের পেছন পেছন। সেবাইন আবার জানালার কাছে স'রে আসে। শার্সিতে গাল ঠেকিয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন বাইরের দুনিয়ায় ও হারিয়ে গেছে।

ক্রিসতফ অস্বস্তি বোধ করে। শুভ রাত্রি জানিয়ে চ'লে যায়। সেবাইন মুখ ফেরায় না। নীচু স্বরে ছোট্ট ক'রে প্রতি-সম্ভাষণ জানায় শুধু।

•

রবিবার বিকেলের দিকে কেউ থাকে না। বাড়ীর সবাই সান্ধ্য উপাসনায় যায়। সেবাইন যায় না। সেদিন বিকেল বেলা সবাই চলে

গেছে গির্জায়। সেবাইন দরজার ধারে তার ছোট বাগানটিতে ব'সে— গির্জার মিঠে ঘণ্টাগুলো যেন সেবাইনকে বৃথাই ডেকে ডেকে সারা হ'ল। গির্জায় যায়নি বলে সেবাইনকে বকার ভান করে ক্রিসতফ। নির্বিকার চিত্তে সেবাইন জবাব দিলে, সকালবেলাকার উপাসনায় অবশ্য সবাইকে যেতেই হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। অতি-ভক্তিতে চোরের লক্ষণ। ও নিজেকে বুঝিয়ে রেখেছে বেশ ক'রে সন্ধ্যার উপাসনায় না যাওয়ার জন্য ভগবান রাগ না ক'রে বরঞ্চ খুশিই হবেন।

'বাঃ বেশত, ভগবান একেবারে তোমার মৎলব মাফিক তৈরী চিজ দেখছি।' ক্রিসতফ বলে।

দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠে সেবাইন বলে: 'ওঃ! ওঁর জায়গায় হ'লে আমার তো ভয়ানক বিরক্তি ধ'রে যেত।'

'তুমি যদি ভগবান হ'তে,' ক্রিসতফ বলে: 'তাহলে দুনিয়ার দিকে ফিরেও চাইতে না।'

'অন্ততঃ এটুকু বলার জন্যে ফিরে চাইতাম যে আমি চাই আর না চাই আমার দিকে দয়া ক'রে যেন কম চায় দুনিয়া।'

'ওঃ ভারী ব'য়ে যাবে!'

'ছিঃ!' সেবাইন বলে: 'বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।'

'বাড়াবাড়িটা কি দেখলে! আমি তো শুধু বলেছি, ভগবান তোমার মত। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে বলো! নিশ্চয় ভগবান গর্ব বোধ করছেন তোমার মত হয়ে।'

খানিক হেসে, খানিক রেগে সেবাইন বলে: 'চুপ করলে!' ওর ভয় হ'তে লাগল, ভগবানের অপমান হ'চ্ছে। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

'তা'ছাড়া এক রবিবারেই যা একটু বাগানে চুপ ক'রে শান্তিতে বসতে পাই।'

'যা বলেছ। তা, ওরা চলে গেছে এখন।' ক্রিসতফ বলে।

পরস্পরের দিকে তাকায় ওরা।

'কি রকম ঠাণ্ডা সব দেখেছ! আশ্চর্য নয়; এ বাড়ী এমন শান্ত দেখে বড় একটা অভ্যাস তো নেই। মনে হচ্ছে অন্য কোথায় এসেছি।' আস্তে আস্তে সেবাইন বলে।

ক্রিসতফ হঠাৎ রেগে ওঠে:

'জানো ওটাকে এক এক সময় আমার গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছে হয়।'

'ওটা' যে কে, আর ব'লে দেবার দরকার হয় না। সেবাইনের ভারী মজা লাগে। বলে: 'আর অন্য সবাইকে?'

ক্রিসতফ একটু লজ্জা পায়: 'হুঁ, রোজা রয়েছে।'

'বেচারা!' সেবাইন বলে।

চুপ হয়ে যায় দু'জনে।

'এমনি চুপচাপ শান্ত যদি সব সময় থাকত!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্রিসতফ বলে।

হাসি-উজ্জ্বল চোখ দু'টি ক্রিসতফের দিকে তুলেই নামিয়ে নেয় সেবাইন। ক্রিসতফ এতক্ষণে লক্ষ্য করল ও কি একটা করছে।

'কি করছ?' জিজ্ঞাসা করে।

[আইভী-ছাওয়া বাগানের বেড়াটা রয়েছে দুজনের মাঝখানে]

হাতের পাত্রটি দেখিয়ে সেবাইন বলে: 'দেখছ না, মটর শুটি ছাড়াচ্ছি।' দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে ব'লতে ব'লতে।

'বেশ বেশ।' হাসতে হাসতে ক্রিসতফ বলে।

'বেশ না ছাই। রাত দিন কেবল খাওয়া খাওয়া কর রাক্ষসের মত।'

'পারলে দেখছি তুমি হাঁড়িকুঁড়ির পাট তুলে দিয়ে কেবল হাওয়া খেয়ে থাক।'

'থাকিই তো।' জোরের সঙ্গে বলে সেবাইন।

'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার মটর।' ব'লে বেড়া ডিঙ্গিয়ে এধারে চ'লে এল ক্রিসতফ।

দরজার কাছে চেয়ারে ব'সে ছিল সেবাইন। তার পায়ের কাছে দাওয়ায় এসে বসে ক্রিসতফ। সেবাইনের কোলের ওপর ঢালা সবুজ মটরশুটির রাশ। তা থেকে মুঠো ভ'রে তুলে নিয়ে ছাড়িয়ে রেখে দেয় ওর দুই হাঁটুর মধ্যে রাখা পাত্রটিতে। যার এত কাছে এসে ব'সতে পারলে তার মুখের দিকে চাইতে পারলে না ক্রিসতফ ; চোখ রইল তার পায়ের দিকে—কালো মোজায় ঢাকা দু'খানি পা ; একখানি পা জুতো থেকে খানিক বেরিয়ে আছে।

আবহাওয়া গুমট ; মেঘ রয়েছে আকাশের বুক চেপে। বাতাস যেন দাঁড়িয়ে আছে থমকে। একটি পাতাও নড়ছে না। বাগানের ঘেরা-পাঁচিলের ওপারে পৃথিবী যেন নেই।

খুকুও বন্ধুদের সাথে খেলতে গেছে। নিরালার এই একান্ততায় ওরা এখন অনন্য। কথা নেই, কিই বা বলবে। সেবাইনের কোল থেকে মটরশুটি নিয়ে আনমনে ছাড়িয়ে চলে ক্রিসতফ। কখনও আঙ্গুলে আঙ্গুল ছুঁয়ে যায়—পুলক-শিহরণ নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে ওর সর্ব দেহে ; মটরশুটির শ্যামলিমায় ডোবা আর এক জোড়া হাতের আঙ্গুলগুলো যেন বেজে ওঠে এক নূতন রাগিনীতে। কাজ যায় থেমে। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে আলিঙ্গন ; আবার তখনি চোখ ফিরে যায়। দেহের স্পন্দন থামে ;

অন্য দিকে তাকিয়ে নিশ্চল প্রতিমার মত ব'সে থাকে দু'জন। চেয়ারে এলিয়ে পড়ে সেবাইনের শিথিল দেহ ; শিথিল হাত দু'পাশে ঝুলে পড়ে ; নিশ্বাস দ্রুত, ওষ্ঠ আধ-খোলা ; দৃষ্টি স্থির।

ক্রিসতফেরও যেন নিশ্বাস পড়ে না ; কাঁধে হাতে লাগছে সেবাইনের পায়ের উষ্ণ স্পর্শ। মাটির শীতল স্নিগ্ধতার উপর উত্তপ্ত হাত দু'খানি চেপে ধরে। রাখে সেবাইনের অনাবৃত পা-খানির উপর। আর পারে না সরিয়ে আনতে—প্রিয়-দেহের ঘনিষ্ঠতায় হাত যেন একেবারে বাঁধা পড়ে। শিরায় শিরায় বয়ে চলে কোন্ মত্ততার হিল্লোল। জোয়ার জেগেছে—এ মাতাল স্রোতকে ঠেকাবে কোন বাঁধ? কোন বিদিকে ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে? ছোট্ট পা-খানির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো চেপে ধরে মুঠো ক'রে। সেবাইনের দেহ আসে অসাড় হ'য়ে, কপালে দোলে স্বেদ-বিন্দুর মালা। ওর মাথা ধীরে ধীরে নেমে আসে ক্রিসতফের দিকে···

পরিচিত কণ্ঠের পরিচিত ধ্বনিতে চকিতে আবেশ ভেঙ্গে যায় টুকরো টুকরো হয়ে। চমকে ওঠে দুজনে। লাফিয়ে উঠে বেড়া পার হ'য়ে যায় ক্রিসতফ। সেবাইন মটরগুলি তুলে নিয়ে ভেতরে চ'লে যায়। ভেতর-কার উঠানে এসে ফিরে তাকায় ক্রিসতফ। সেবাইন দরজায় দাঁড়িয়ে। চার চোখের দৃষ্টি আবার মিলে যায়। গাছের পাতায় টুপ্ টাপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে। দরজা বন্ধ ক'রে দেয় সেবাইন। শ্রীমতী ফোগেল আর রোজা ভেতরে আসে···ক্রিসতফ চ'লে যায় নিজের ঘরে।

দিন-শেষের সোনালী আলো বৃষ্টি-ধারায় নিবে যায়। এক দুর্বার আবেগে ডেস্ক ছেড়ে উঠে পড়ে ক্রিসতফ। ছুটে যায় জানালার কাছে··· আকুল বাহু দুটি ছুটে গিয়ে কাকে খোঁজে সামনের জানালায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখের বাতায়নের আধ-খোলা অবকাশে, ঘরের ভেতরকার আধো-

আঁধারে···ক্রিসতফ দেখল···আকুল-বাহু-মেলা প্রিয় মূর্তি। সত্যি···? না দৃষ্টি-বিভ্রম··· ?

ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে বাগানের ধারে। লাফিয়ে উঠল বেড়ার ওপর। খেয়াল নেই, চার-পাশে রয়েছে শাসন-কঠিন কয়েক জোড়া চোখের রক্ত চাহনি। যে-বাতায়নের আধ-খোলা পথে এই মাত্র প্রিয়-মূর্তির আবির্ভাব হ'ল, আকুল সন্ধানী দৃষ্টি তাকেই খোঁজে। কিন্তু সে-জানালা বন্ধ। সব নিস্তব্ধ···নিঝুম···বাড়ীখানাই যেন ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ও থমকে থেমে যায়। বৃদ্ধ অয়লার তার ঘরে যাচ্ছিল। ওকে দেখতে পেয়ে ডাকল। ফিরে এল ক্রিসতফ। ওর মনে হল···কি যেন কি স্বপ্নের ঘোরে ছিল ও এতক্ষণ।

বেশীদিন রোজার কাছে এ ব্যাপার লুকনো রইল না। রোজা ভয় জানে না, হিংসাকে চেনেনি এখনও। ও কেবল দিতে চায়, কিছু বাকী না রেখে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে। নাই বা পেল প্রতিদান। ক্রিসতফের ভালোবাসা ও পায়নি। এবং এই না-পাওয়াকেই ও বেদনার অর্ঘ্যে সাজিয়ে মাথায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু ওকে ভালো নাই বাসুক, আর কোনো মেয়েকে ক্রিসতফ ভালোবাসবে এমন সম্ভাবনা ওর মনে আসেনি।

সেদিন রাতে খাবার পর, হাতের এতদিনকার সেলাইটা শেষ হ'য়ে গেল। মন খুশিতে ভ'রে উঠল। ইচ্ছে হ'ল এমনি গিয়ে ক্রিসতফের সাথে একটু গল্প করে। মা একটু আড়াল হ'লেই ও চুপ ক'রে বেরিয়ে এল ঘর থেকে ; ইস্কুল-পালানো ছেলের মত পা পা ক'রে চুপি চুপি এল বাইরে। ভাবলে ক্রিসতফকে অবাক ক'রে দেবে ; বলেছিল না সেলাইটা সাত জন্মে শেষ হবে না ! বাইরেই ব'সে আছে ওরা, গিয়ে চোখের সামনে তুলে দেখিয়ে দেবে, সাতজন্ম কেন একটা জন্মও

লাগল না। ভারী মজা হবে। কিন্তু ভেবে দেখলে না, ও পক্ষেরও মজা লাগবে কিনা, সেখানে ওর স্থান কোথায়। ওর নিজের ভালো লাগাটাই বড় হ'য়ে রইল।

ক্রিসতফ আর সেবাইন রোজকার মতই এসে বসেছে বাইরে। রোজার ভেতরটা কেমন একটু খচ্ ক'রে উঠল। কিন্তু তবু ও থামল না। হাল্কা কৌতুক-ভরা স্বরে ক্রিসতফকে ডাকতে ডাকতে এসে উপস্থিত হ'ল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় রোজার কর্কশ কণ্ঠ বড় বেসুরো হ'য়ে বাজল ক্রিসতফের কানে। চম্‌কে উঠল, রাগে ওর ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। রোজা বিজয়-গর্বে সেলাইটা ক্রিসতফের মুখের সামনে আস্ফালন করতে লাগল। ক্রিসতফ ধৈর্য হারিয়ে ধমকে উঠল। তবু রোজা দমল না।

'শেষ হয়েছে তো, কেমন বলেছিলে. হবে না!'

'বেশ হয়েছে, রাজা হয়েছ, এখন যাও আর একটা ধরোগে।' রুক্ষভাবে ক্রিসতফ বলে।

রোজা এবারে দমে যায়। সমস্ত আনন্দ এক ফুঁয়ে নিবে গেল।

ক্রিসতফ ঝেঁঝেঁ বলল: 'একটা কেন একশোটা করগে না। বুড়ো বয়সে বলতে পারবে যে ব'সে ব'সে গেলোনি, অন্তত একটা কাজ করেছ।'

রোজার চোখ ফেটে জল এল। বললে: 'এত রাগ করছ কেন ভাই?'

ক্রিসতফ লজ্জা পায়। ভালো ক'রে কথা বলে। মিষ্টি কথায় রোজা ভুলে যায়। সাহস ফিরে আসে। আবার অভ্যাসমত চেঁচিয়ে কল কল করতে শুরু করে। চীৎকার ক'রে কথা বলা ওদের বাড়ীর রেওয়াজ, চেষ্টা করলেও ওরা গলা চাপতে পারে না। প্রথমে তিক্ত স্বরে কেবল হাঁ না ক'রে জবাব সারতে লাগল ক্রিসতফ। কিন্তু শেষে আর পারলে না, একেবারে পেছন ফিরে চুপ ক'রে বসে রইল।

ব'সে ব'সে ছটফট করতে আর রাগে জলতে লাগল। রোজা বুঝল ক্রিসতফ খুব চটেছে। সুতরাং থামা দরকার। কিন্তু থামতে গিয়ে গলা উঠল আরো উঁচু পরদায় ; বাক্য-স্রোত হ'ল খরতর। সেবাইন একটু দূরে তার অভ্যস্ত অন্ধকারটিতে ব'সে শ্লেষে তাচ্ছিল্যে মিশিয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। আর পারলে না, বড় শ্রান্ত বোধ হ'ল—মনে হ'ল প্রিয় সন্ধ্যাটির অপমৃত্যু হ'ল। উঠে চলে গেল ভেতরে। ও চ'লে গেছে ক্রিসতফ টের পেল খানিক পরে এবং পাওয়া মাত্র বিনা ভূমিকায় কোনোমতে একটা সংক্ষিপ্ত শুভরাত্রি জানিয়ে চ'লে গেল।

হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রোজা অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে। দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। ছুটে চ'লে এল নিজের ঘরে একেবারে নিঃশব্দে, যাতে মা টের না পান। নইলে হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু কথা কইতে ও পারবে না, একটিও না, কারো সাথে না। টলতে টলতে কাপড় বদলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল ; বিছানার চাদরে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল অঝোরে। ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করতে মন চাইলে না ; চাইলে না জানতে ক্রিসতফ সেবাইনকে ভালোবাসে কিনা। ও তো দেখেই এল—ক্রিসতফ-সেবাইনের সভায় ও একেবারেই অনাহূতা, অনাদৃতা—কিন্তু সে অনাদরের পরিমাণ যে কতখানি তার হিসেব করতে চাইলে না। সব ব্যঞ্জনার ঊর্ধ্বে জেগে রইল আজ ও সব খোয়াল। জীবনের সব অর্থ লুটাল মাটির ধূলায়।

পরদিন আশা আবার ফিরে এল তার নিত্যকালের কুহক নিয়ে। গত সন্ধ্যার কথা মনে প'ড়ে ভাবল, কাল বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে। অতখানি পাগলামো করার কিই বা ছিল! ক্রিসতফ যে ওকে ভালোবাসে না এ তো ও জানেই, এবং মেনেও নিয়েছে! কিন্তু ...কিন্তু...তবু আশায় পথ চাওয়ার শেষ কই! ভালোবাসা

দিয়ে ক্রিসতফকে জয় করবেই একদিন না একদিন—এই ভরসায় বুক বেঁধে থাকবে। কিন্তু নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায়না কথাটা। আচ্ছা, ক্রিসতফ ওকে ভালো হয় তো বাসেনা কিন্তু সেবাইনকে ভালোবাসে এ বিসদৃশ ধারণা কোথেকে এল! কোথায় সে, আর কোথায় এই মেয়ে! ওই মার্জিত-বুদ্ধি, দীপ্তিমান ছেলে, সে কেমন ক'রে সেবাইনের মত এই অতি-সাধারণ বাজে মেয়েকে ভালোবাসতে পারে! কথাটা ভেবে খানিকটা যেন আশ্বস্ত হয় নিজের মনেই। কিন্তু তবু ওর সন্ধানী দৃষ্টি টিকটিকির মত সারাক্ষণ ক্রিসতফের সাথে সাথে ফিরতে লাগল ছায়ার মত। এই অশোভন ব্যবহারে ক্রিসতফ গেল খেপে। কিন্তু এর পর যে-ব্যবহার করল রোজা, তার ফল হ'ল সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রিসতফ-সেবাইনের সান্ধ্য আসরে পরের দিনও এসে হাজির হ'ল। এবং আসতে লাগল নিয়মিত। আগের দিনের মত আজও রোজার কোলাহলে সন্ধ্যাটির অপমৃত্যু ঘটল; আজও নিঃশব্দে সেবাইন কখন উঠে গেল এবং তার পরেই আসর শূন্য ক'রে চ'লে গেল ক্রিসতফও। এতগুলো প্রমাণে ওর চোখ খুলে গেল; বুঝলে ও অনাদৃতা, ওকে কেউ চায়না। কিন্তু বুঝেও ঠিক বুঝলে না, খোলা চোখে তাকিয়ে দেখলে না নিজের অমার্জিত হাত দিয়ে ও নিজের কপাল ভাঙ্গছে।

পরের দিন সেবাইন আর এলই না। রোজার পাশে ব'সে ক্রিসতফ ওর আসার পথ চেয়ে রইল।

তার পরের দিন ক্রিসতফকেও দেখা গেল না। ভাঙ্গা হাটে রোজা এসে দাঁড়াল একা। রণাঙ্গন হ'তে দুজনেই স'রে দাঁড়িয়েছে। অভিসার-সন্ধ্যাটিকে খুইয়ে ক্রিসতফ আগুন হ'য়ে উঠল। এবং যত রাগ গিয়ে পড়ল নির্বোধ মেয়েটার ওপর। ক্রিসতফ নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল। এত

বড় অপরাধ ও ক্ষমা ক'রবে না। হায়রে অদৃষ্ট! নিজের ভাবনায় ডুবে দুর্ভাগা মেয়েটার হৃদয়খানাকে একবার ও দেখলে না!

কিন্তু দেখল সেবাইন। ফাঁকি চলল না ওখানে। বেশ কিছুদিন আগেই ও বুঝতে পেরেছে। নিজের মনের খবর পাবার আগেই রোজা যে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী এ কথা ও বুঝে নিয়েছে। কিন্তু চুপ ক'রে রইল। ও জানে জয়মাল্য ওরই গলায় দুলছে। অতএব সুন্দরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতায় ও নিঃশব্দে দূরে দাঁড়িয়ে পরাজিতা প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যর্থ প্রয়াস দেখতে লাগল।

ভুল চালের শোচনীয় পরিণাম রোজা করুণ চোখে দেখতে লাগল রণাঙ্গনে একা দাঁড়িয়ে। এখনও পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে পারলে ভাল হ'ত; অন্ততঃ কিছুকালের জন্য। কিন্তু ওর বুদ্ধি বিপরীত; বরাবরের মত আজও ধরল উল্টো পথ। এবং মারাত্মক ভুল ক'রে বসল।

ভাবলে সেবাইনের কথা তুলে একটু পরখ করে দেখিই না কেন? দুরু দুরু বক্ষে সেবাইনের প্রসঙ্গ তুলল—বলল সেবাইন সুন্দরী। কাটা একটি জবাব দিলে ক্রিসতফ, শুধু কি সুন্দরী, পরমা সুন্দরী। কি উত্তর আসবে রোজার জানা ছিল, তবু উত্তরটা যখন এল, বুকে প'ড়ল হাতুড়ীর ঘা। রোজা জানে সেবাইন সুন্দরী। কিন্তু তেমন ক'রে দেখেনি। আজ প্রথমবার নিরীক্ষণ ক'রে দেখল, এবং দেখল ক্রিসতফের চোখ দিয়ে। প্রত্যেকটি অবয়ব সুকুমার, ছোট নাকটি, সূক্ষ্ম রেখায় টানা দুটি ঠোঁট; তনু দেহটির চলা-ফেরা ছন্দে-গাঁথা...। ভগবান ...সর্বস্বের মূল্যেও যদি ওই দেহখানি পেত! ওই সুকুমার দেহের আধারে নিজের হৃদয়খানিকে নিয়ে ও বাঁচতো! কিন্তু কেন? কেন এই অনুচিত কামনা! থাক আজ সে বিচার। ওর নিজের দেহ!

পরম কুৎসিত মনে হ'ল ও বস্তুটাকে। হ্যাক্কার আসতে লাগল। কিন্তু কোন পাপে এই কুরূপ দেহ ও পেল! দেহটা দুর্বহ বোঝা হ'য়ে উঠল আজ। এক মরণ ছাড়া এ থেকে মুক্তি নেই!...কিছুতেই নেই! ভালোবাসা পায়নি। কিন্তু তা নিয়ে ও নালিশ করতে পারেনি। গর্বে বেধেছে। নালিশ করবে না; করার ওর অধিকার নেই। নিজেকে মাটির ধূলোয় মিশিয়ে দিতে চাইল।—কিন্তু সহজাত বুদ্ধি মাথা তুলে দাঁড়ায়...এ অন্যায়...ঘোর অবিচার। রোজা কেন কুৎসিত হ'ল! কেন হ'লনা সেবাইন? কেন সেবাইন পেল ভালবাসা, কেনই বা পেল না ও? কেন...কেন...কোন পাপে?...বিদ্বেষে বিষিয়ে উঠল রোজার সারা অন্তর। কোন গুণে ক্রিসতফ ওকে ভালোবাসল! ও মেয়ের কোন গুণ আছে? কুঁড়ের একশেষ, অহংকারী—মাটিতে পা পড়েনা। না দেখে ঘর সংসার, না দেখে নিজের মেয়েটাকে; সংসারের কুটোটি অবধি নাড়েনা; সংসার তো নয় আঁস্তাকুঁড়! সারাদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় আর নয়তো বিছানায় গড়ায়। নিজের ছাড়া কোনো দিকে তাকায় না পর্যন্ত!...এই সৃষ্টিছাড়া জীবটাকেই কিনা ক্রিসতফের ভালো লাগলো! সেই ক্রিসতফ, যে এত কঠিন, এত কঠোর...এত যার সূক্ষ্ম বিচার, খুঁৎখুঁতে মন! সেই ক্রিসতফ, যে রোজার সব থেকে বড় শ্রদ্ধার বস্তু, আদরের পাত্র! কেমন ক'রে অমন হ'ল ক্রিসতফ! কখনও কখনও অতর্কিতে ক্রিসতফকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেবাইনকে গালি দিয়ে ফেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কেমন ক'রে যেন বেরিয়ে যায়—কে যেন ঠেলে দেয় ভেতর থেকে—পরক্ষণেই মরমে ম'রে যায় —লজ্জায় বেদনায় সারাটা দিন ও কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে থাকে। মন তো ওর কঠোর নয়, কারো নিন্দা-চর্চা করতে ওর রুচিতে বাধে, কিন্তু কেমন ক'রে কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যায় নিজেই বুঝতে পারে না। ক্রিসতফের

কাছ থেকে জবাব আসে অত্যন্ত পরুষ ভাষায় ; ভদ্রতা ক'রেও পালিশ দিয়ে কথা বলে না। ওর হৃদ্‌পিণ্ডকে যেন শতখান ক'রে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। নিজের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আঘাত পেয়েছে ক্রিসতফ। এখন সেই আঘাত ও কঠিন হাতে ফিরিয়ে দেবে। এবং দেয়। রোজা কোনো জবাব করেনা ; মাথা নীচু করে ঠোঁট কামড়ে কান্না চেপে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। আমারি অপরাধ! আমারি অপরাধ! ক্রিসতফের প্রেমের পাত্রকে আঘাত দিয়েছি, এ আঘাত তো ওরই বুকে বেজেছে অতএব এ শাস্তি আমার প্রাপ্য—আমার প্রাপ্য।

কিন্তু অত সংযম এমেলিয়ার নেই। এবং ওই সর্ব-দর্শী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে তরুণী প্রতিবেশীর সাথে ক্রিসতফের ঘনিষ্টতার খবর চাপা রইল না। অয়লারের চোখেও প'ড়ল। ওদের মধ্যেকার সম্পর্কটা আন্দাজ ক'রে নিতে একটুও দেরী হ'লনা। ক্ষুদে ওস্তাদটিকে একদা জামাই পদে বরণ করার গোপন মৎলব গোড়ায়ই বানচাল হ'তে দেখে ওরা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। ক্রিসতফের ব্যবহার ব্যক্তিগত অপমান হ'য়ে ওদের গায়ে বাজল। অথচ বেচারা ক্রিসতফ ঘুণাক্ষরেও জানে না, ওর ভাগ্য-নির্ণয় হ'য়ে গেছে। এবং ওর সম্মতি নেবার প্রয়োজন হয়নি। এমেলিয়ার রাজত্বে প্রতিবাদ অচল ; সুতরাং নানাভাবে সেবাইন সম্বন্ধে যে-প্রতিকূল মত এমেলিয়ার তরফ থেকে ব্যক্ত হ'য়েছে, তা যে ক্রিসতফ গ্রাহ্য করে নি এটা ওর মনে হ'ল অক্ষমণীয় স্পর্ধা।

ক্রিসতফ গ্রাহ্য না করলে হবে কি ? ক্রিসতফের ভালোর জন্য এমেলিয়া সুযোগ পেলেই সেবাইনের কুৎসা শোনায় ; খুঁজে বেছে এমনি সব কথা বের করে যাতে ক্রিসতফের বুকে আঘাত লাগে এবং সেবাইনের

প্রতি ওর মন ভেঙ্গে যায়। ক্রিসতফ কাছে থাকলেই কোনো না কোনো ছলে সেবাইনের প্রসঙ্গ তোলে। মনের হিংসায় ভাষার সংযম থাকে না, এবং প্রসঙ্গটা হয়ে ওঠে পাঁক। মেয়েদের হিংসা পুরুষের চাইতে অনেক গুণ বেশী ভয়ংকর। হিত ও অহিত দুই-ই পুরুষের চাইতে ওরা অনেক বেশী করতে পারে এবং মেয়েরা অনেক বেশী কুশলী এ বিষয়ে। এমেলিয়াও এখন নূতন পথ ধরল। সেবাইনের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে আটপৌরে মানুষটাকে নিয়ে প'ড়ল। ও যে অত্যন্ত নোংরা সেই কথাটাই ক্রিসতফের সামনে প্রমাণ করার জন্য উঠে প'ড়ে লাগল। সেবাইনের প্রসাধন-কালীন গোপন পর্বটিকে এমেলিয়া জানালার ফাঁকে চোরের মত দেখেছে। অত্যন্ত নির্বিকার স্থূলত্বে তার যে-বর্ণনা এখন দিতে লাগল তা অত্যন্ত বীভৎস রকম নগ্ন। এ পরেও অনেক কিছুই নাকি ব'লতে পারলে না লজ্জায়; অতএব যা বাকী, রইল তা ইঙ্গিতে এবং আরও নগ্ন চেহারায়।

রাগে লজ্জায় ক্রিসতফ বিবর্ণ হ'য়ে যায়। ঠোঁট দুটো সাদা কাগজের মত হ'য়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। রোজা যেন আগে থেকেই বুঝতে পারে। সুতরাং সে মার মুখ চেপে ধরে, এমন কি সেবাইনের পক্ষও নেয় সময় সময়। কিন্তু এমেলিয়া থামবার মেয়ে নয়, সে আরও হিংস্র হ'য়ে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে ক্রিসতফ লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে। টেবিল চাপড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলে, মেয়েমানুষের পেছনে টিকটিকির মত লেগে থাকা আর তার কুৎসা রটান, এর মত ঘেন্নার কাজ আর নেই। বেচারী সেবাইন নেহাৎ শান্ত শিষ্ট, একধারে প'ড়ে আছে, কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই; তার গায়ে কেন কাদা ছিটোন! যারা ছিটোয় তারা

মানুষ নয়। কিন্তু সবাই মনে যেন রাখে ও মেয়ের একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না কেউ।

সুতরাং এমেলিয়ার অভিষ্ট সিদ্ধ হ'লনা। ক্রিসতফের মনের আকাশে সেবাইন আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠল।

এমেলিয়া বোঝে বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। বুকে যেন কাঁটা বেঁধে।

রণ-কৌশল একটু বদলে নিয়ে বলে—ভালমানুষ বললেই হ'ল। বলতে তো আর ট্যাক্স লাগে না। ভালোমানুষ না হাতী। কারো কিছু সাত জন্মে ক'রলে না উঁকি মেরে দেখলে না কাউকে, না হয় বাপু নিজেরটাই কর ভালো ক'রে! তাও নয়! এমনি বেদ্দ কুড়ে! এই নাকি ভালো মানুষ!

ক্রিসতফ মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়—ওঃ কাজ! দেখা গেছে কাজের নমুনা। বাপস! কাজ তো নয় হাড়-জালান! কর্তব্যের ঠেলায় জান শেষ। যদি আনন্দই দিতে না পারা যায়, তবে আর কর্তব্য কর্তব্য ক'রে চেঁচিয়ে কি হবে? কর্তব্য মানে কি কেবল অন্যের হাঁড়ির ভাত গোনা? রক্ষে করুন ভগবান, সাত জন্মে যেন অমন কর্তব্য থেকে আর কর্তব্য করনে-ওয়ালাদের হাত থেকে।

তিক্ততা বেড়েই চলে। এমেলিয়ারও তেজ কমে না, ক্রিসতফও এক চুল নামে না। ক্রিসতফ জেদ ক'রে দেখিয়ে দেখিয়ে সেবাইনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যখন তখন গিয়ে ওর দরজায় ধাক্কা দেয়, গল্প করে... দুজনে মিশে ঢলাঢলি করে রোজা আর এমেলিয়াকে দেখিয়ে দেখিয়ে। এমেলিয়া বেছে বেছে চাখা চোখা গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মেটায়। কিন্তু বেচারী রোজা—এমন সূক্ষ্ম চিকন নিষ্ঠুরতায় ওর নিরপরাধ সরল হৃদয়খানা ভেঙ্গে খান খান হ'য়ে যায়;

ও বুঝতে পারলে ওরা চায়না ওকে, ও কেবল ওদের ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অঝোরে ও বুক ভাঙ্গা কান্না কাঁদে।

ক্রিসতফ শিখেছে, অন্যায়ের মার খেয়ে খেয়ে এখন অন্যায় ক'রে মার দিতে শিখেছে।

কিছুদিন পরে এল সেবাইনের ভাই। ময়দার কল আছে। লেনডেগে থাকে। তার ছেলের নামকরণোৎসব। এসেছে সেবাইনকে নিতে, সেবাইন শিশুর গড্-মাদার হবে। ক্রিসতফকেও নিমন্ত্রণ ক'রলে। এসব হৈ হল্লা ক্রিসতফের ভালো লাগে না, তবু যেতে রাজী হ'ল—সেবাইনের সঙ্গও পাবে আর ফোগেলদেরও একটু চোখ টাটাবে।

সেবাইন, রোজা আর এমেলিয়াকেও নিমন্ত্রণ ক'রল; জানতো তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওর নিমন্ত্রণ। সত্যি সত্যি তাই হ'ল! ভারী হিংস্র তৃপ্তির স্বাদ পেলে এমেলিয়া। রোজার ভারী ইচ্ছে ছিল, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেবাইনকে ওর অপছন্দ ছিল না। বরঞ্চ ক্রিসতফ ওকে ভালোবাসে ব'লে মাঝে মাঝে ওর প্রতি রোজার অন্তর মমতায় ভ'রে উঠে। ইচ্ছে হয়, হৃদয় খুলে দেখিয়ে দেয় সেবাইনকে, দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু রয়েছে মা—আর মায়ের আদর্শ।

রোজার অভিমান মাথা তুলল, ও শক্ত ক'রল নিজেকে; ব'লে দিলে যাবে না। ওরা চ'লে গেলে—ওর চোখের সামনে কেবল ভেসে বেড়াতে লাগল দুটি সুখী নর-নারীর ছবি; জুলাইয়ের সরস দিন ..গাঁয়ের অবারিত দাক্ষিণ্যে এক সাথে ঘুরে বেড়িয়ে, স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়ে, প্রিয়-সান্নিধ্যে দুটি মানুষ খুশি হ'য়ে উঠেছে। আর ওর ভাগ্যে রইল সংকীর্ণ ঘরের ঘুপচিতে ব'সে বক্‌বকানী শোনা। দম বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি ওর! রাগ হল···হায়রে অহংকার, একি মরবে না!···যদি

আর একটু সময় থাকত!·· কিন্তু কি হ'ত থাকলে! এ ছাড়া আর কিই বা করত!

মিলার, ক্রিসতফ আর সেবাইনকে আনার জন্য তার ছোট্ট গাড়ীটা পাঠিয়ে দিল। যাওয়ার পথে শহর থেকে আরো॰কয়েকজন নিমন্ত্রিতকে তুলে নিল ওরা। চমৎকার নির্মেঘ সরস দিন। ঝলমলে রোদ··· রাস্তার পাশে বাদামী রঙ্গের গাছে গাছে থোলো থোলো লাল চেরী, মাঠে মাঠে বুনো চেরীর গাছ, সবই যেন ঝল্‌মল্ ক'রছে। সেবাইনের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। কড়া হাওয়া লেগে ওর স্বভাব-পাণ্ডুর মুখখানা লাল হ'য়ে উঠেছে। ওর মেয়েটি ক্রিসতফের কোলে। পরস্পরের সাথে ওরা একটিও কথা কইলে না। কিন্তু সাধারণ আলাপ পরিচয় হাসি-হুল্লোড়ে যোগ দিলে পুরোপুরি। প্রিয় কণ্ঠটি কানে আসে, আর ছুখানি বুক ছুলে ছুলে ওঠে। একই গাড়ীতে চলেছে—গাড়ীর দোলায় এক সাথে চলার আনন্দ দোলে; ঘর-বাড়ী, মানুষ, গাছ যা দেখে শিশুর মত আনন্দে ওঠে নেচে; দেখায় পরস্পরকে যেন নূতন আবিষ্কার; চোখে চোখ মিলে যায়···সহজ খুশিতে হেসে ওঠে ছুজনে। সেবাইন গ্রাম ভালোবাসে, কিন্তু বড় একটা যায়নি গ্রামে। স্বভাবের ছুর্জয় আলস্যে এমনি বেড়াতেও যায়নি। সুতরাং নগণ্য জিনিষও আজ অপূর্ব লাগছে। ক্রিসতফের অভ্যস্ত চোখে অবশ্য এগুলো নূতন নয়।

প্রেমিকের সহজ-ধর্মে সেবাইনের চোখ দিয়ে পুরানো পৃথিবীকে আবার নূতন ক'রে দেখল ক্রিসতফ নূতন রঙ্গে। সেবাইনের অনুভূতি আনন্দ হ'য়ে ওর হৃদয়কে দোলাল, সেবাইনএর চিত্তের ভাবের মুকুল ওর হৃদয়ে ফুল হয়ে দল মেলল। ক্রিসতফ প্রিয়ার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিলে।

পৌঁছে দেখা গেল আঙ্গিনা-ভরা মানুষ। উল্লাসের উচ্চ রোলে আকাশ কাঁপিয়ে ওদের স্বাগত জানাল তারা। হাঁস, মুরগী, কুকুরের দলও সে স্বাগত-সম্ভাষণে যোগ দেয়। সেবাইন তো ছোটখাট, কিন্তু দাদাটি আকারে দৈত্য বিশেষ; লম্বা চওড়া জবরদস্ত জোয়ান, সুন্দর এক মাথা চুল। বোনকে ধরলে বুকে জড়িয়ে, এবং তারপর এমনি আলতো হাতে ছেড়ে দিলে যেন অতি পল্কা জিনিষ, এখনি ভেঙ্গে যাবে। ক্রিসতফ দেখে অবাক হয় ছোট্ট বোনটি বিরাট দাদাটিকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে ঃ দাদাটিও তাকে এটা সেটা নিয়ে খেপিয়ে অস্থির করে তুলছে। বিপুল-কায় লোকটা যেন ঐ এক কোঁটা মেয়ের পায়ের ভৃত্য। খুদে মালিকটির হুকুমের জন্য সে যেন পথ চেয়ে আছে। দুটি ভাই বোনের অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক। ভালোবাসা পাবার কোনো প্রয়াস সেবাইনের নেই; সবাই ওকে ভালোবাসবে, এইটেই যেন ওর স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। ভালোবাসা নাই পায় যদি, না পেলো, তাতেও ওর আক্ষেপ নেই। এই কারণেই ভালোবাসা পায়ও সকলের কাছ থেকেই।

একটা জিনিষ ক্রিসতফের মনঃপুত হল না। নামকরণের জন্য 'গড-মাদারের' সাথে একজন গড-ফাদারেরও প্রয়োজন। প্রচলিত রীতি অনুসারে এই সম্পর্কের মধ্যে শ্রীমান শ্রীমতীর ওপর কিছু অধিকার লাভ করেন। শ্রীমতী তরুণী হ'লে সে-অধিকার শ্রীমান প্রায়ই ছাড়েন না। এটা আগে জানতো না ক্রিসতফ। হঠাৎ দেখলে একজন কৃষক, মাথায় একরাশ সুন্দর কোঁকড়া চুল, কানে আংটা, হাসতে হাসতে সেবাইনের কাছে এসে ওর দুই গালে চুমু খেলে।

ক্রিসতফ চটে গেল সেবাইন-এর ওপর। যেন ওই লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেছে ছেলেটাকে। ও ভুলে গেল যে এটা সামাজিক নিয়ম।

বোকার মত রাগ করা। অনুষ্ঠানের সময় ওকে আলাদা থাকতে হ'ল। এতে ও আরো চটে গেল। শোভাযাত্রা মাঠের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সেবাইন বার বার প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ক্রিসতফ যেন দেখছে না কিছুই। সেবাইন বুঝতে পারে ক্রিসতফ চটেছে। এবং কেন যে তাও বুঝতে বাকী রইল না। ভারী মজা লাগে সেবাইন-এর। কারো সাথে সত্যি সত্যি ঝগড়া হ'লে এবং তাতে ওর কষ্ট হ'লেও বিবাদের কারণ বা ভুল-বোঝাবুঝি দূর করতে কখনও চেষ্টা করে না। কে করে অত ঝঞ্ঝাট? চুপ ক'রে থাকলে আপনিই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

খাবার সময় ক্রিসতফ ব'সল সেবাইনের বৌদি আর একটি মোটা মেয়ের মাঝখানে। এই মেয়েটিকে ও প্রার্থনায় নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকিয়ে দেখেনি। এখন একবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল। মেয়েটি মন্দ নয় দেখতে। প্রতিশোধ নেবার জন্য ও মরিয়া হ'য়ে মেয়েটির সাথে ফ্লার্ট করতে আরম্ভ ক'রল সেবাইনকে দেখিয়ে দেখিয়ে। উদ্দেশ্য সফল হ'ল বটে, সেবাইন দেখল; তবে হিংসা ক'রল না, কারণ হিংসে করবার মেয়ে ও নয়। যতক্ষণ নিজের পাওনা ঠিক পাচ্ছে ততক্ষণ ওর প্রেমিক হাজার জনকে প্রেম নিবেদন করলেও ওর আপত্তি নেই। বরঞ্চ ক্রিসতফ মুখ ভার ক'রে না থেকে স্ফূর্তি ক'রছে এতে ওর আরো ভালো লাগল। টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে ওর দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে হাসল সেবাইন। ক্রিসতফের সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। সেবাইন তা হ'লে নির্বিকার, ওর প্রতি সে উদাসীন। আবার মেঘের ঘন ছায়া নেমে এল ওর মুখের 'পর। আর কিছুতে সে মেঘ কাটল না; পার্শ্ববর্তিনীর কোমল আঁখির নিমন্ত্রণেও নয়, আকণ্ঠ তীব্র সুরার নেশায়ও নয়।

ঝিমুতে লাগল ব'সে ব'সে। নিজের উপরেই রাগ হ'লো কেন এই বিশ্রী হৈ চৈ-এর মধ্যে ও এল। হল্লা যেন আজ আর শেষ হবে না! সেবাইন-এর দাদা প্রস্তাব ক'রল—কয়েকজন অতিথিকে বাড়ী পৌঁছে দিতে নৌকা যাবে, সেই সাথে সবাই মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। ক্রিসতফের কানে গেল না সে কথা। সেবাইন যে ওকে ওর সাথে এক নৌকায় যাবার জন্য ডাকছে তাও দেখতে পেল না। খেয়াল হ'তে হ'তে সেবাইন-এর নৌকা ভরে গেছে; সুতরাং ওকে যেতে হ'ল অন্য নৌকায়। এই নূতন দুর্বিপাকে ওর মন আরও খিঁচড়ে গেল। কিন্তু যাত্রীরা প্রায় সবাই খানিকক্ষণের মধ্যে নেবে যাবে জেনে ও খুশি হ'য়ে উঠল। বিকেলখানি চমৎকার, জলের ওপর তার অপূর্ব লীলা আর নৌকা-বাওয়ার মাতামাতি। সরল দিল-খোলা মানুষ গুলির জোয়ার-জাগা খুশির সাথে ও মেতে উঠল। সেবাইন অন্য নৌকায়. সুতরাং ওর কোন সংকোচ বা বাধা রইল না। আগল খুলে দিয়ে সকলের সাথে ও মিশে গেল।

দু'জনে দু' নৌকায়। খুব গা ঘেঁষে যাচ্ছিল নৌকাগুলো প্রতি মুহূর্তে, এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায়। এগিয়ে যাবার সময় হাসতে হাসতে পরস্পরকে টিটকারী দিয়ে যায়। কখনও নৌকায় নৌকায় ধাক্কা লাগে—ক্রিসতফ দেখে সেবাইন হাসছে—ও ও হেসে ফেলে। মনের মেঘ কেটে গেছে দুজনের। ক্রিসতফের মন বলে, এবারে ওরা এক সঙ্গেই ফিরবে।

গান সুরু হল। টুকরো টুকরো গান—এক এক জন পালা ক'রে একটি লাইন গায়—বাকীরা তার ধূয়া ধরে। অন্য অন্য নৌকাগুলি পরস্পরের কাছ হ'তে একটু দূরে দূরে রয়েছে—তাদের আরোহীরাও শুনে শুনে তান ধরে। জলের বুকে ছোট ছোট পাখীর মত ফুর ফুর

ক'রে উড়ে বেড়ায় সুর। এক একজনের বাড়ীর ঘাট এলে, নৌকা তীরে লাগে—যাত্রীরা নামে—নৌকা বাঁধন খুলে স্রোতে ভাসে—যতক্ষণ না চোখের আড়াল হয় পাড়ে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। একে একে সবাই নেমে যায়। কোরাস থেকে একটি একটি ক'রে কণ্ঠ খ'সে পড়ে। অবশেষে রইল খালি সেবাইন, তার দাদা আর ক্রিসতফ।

এক নৌকায় ফিরল তিনজন। ভাটির স্রোতে আস্তে আস্তে চলছে নৌকা। হাল ধরেছে বারটোল্ড আর ক্রিসতফ; সেবাইন বসেছে গলুইর ওপর ক্রিসতফের সামনা-সামনি—দাদার সাথে কথা বলছে কিন্তু চোখ রয়েছে ক্রিসতফের দিকে। কথা বলার আড়ালে চোখে চোখ বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছে—কথা থামলে দৃষ্টির সুর কেটে যাবে। কথা বলছে, তোমায় দেখছি না, তোমায় দেখছি না তো। চোখ বলছে: কে তুমি গো? কে তুমি? আমার প্রিয়া তুমি? তাই গো তাই, যেই হও তুমি, তোমায় আমি ভালোবাসি।

আকাশে মেঘ···মাঠের বুক থেকে উঠছে কুয়াসার জাল; নদীর বুক থেকে বাষ্পের কুণ্ডলী উঠছে; সূর্য মেঘের আঁচল টেনে দিয়েছে মুখে। সেবাইন কালো শালখানা গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়েও শীতে কাঁপছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। তীর ঘেঁষে নৌকাখানি চলেছে উইলো গাছের দূর-বিসারী শাখা-জালের নীচ দিয়ে। যেতে যেতে সেবাইন-এর চোখ বন্ধ হ'য়ে আসে, মুখ খানা হ'য়ে আসে পাণ্ডুর; ওষ্ঠের রেখায় রেখায় বেদনা ঘন হ'য়ে ওঠে; স্পন্দন-হীনা বাক্য-হীনা সেবাইনের ভেতরে যেন কি এক তীব্র যাতনা—সমস্ত মুখ কালো হ'য়ে উঠেছে। সেবাইন যেন মৃত দেহ। ক্রিসতফের বুকে বেদনা মোচড় দিয়ে ওঠে। ও একটু ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে।

সেবাইন চোখ তুলে দেখে, ক্রিসতফের বেদনা-ঘন চোখের দৃষ্টি ওকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে ওর চোখে। ক্রিসতফের মনে হলো মেঘের ফাঁকে এক ঝলক সূর্যের আলো উছলে উঠল… আস্তে আস্তে বলে :

'তোমার অসুখ করেছে ?'

মাথা নেড়ে জবাব দেয় সেবাইন : 'না শীত করছে।'

পুরুষেরা তাদের ওভার-কোট খুলে ছোট শিশুর মত ক'রে ওর গায়ে মাথায় পায়ে জড়িয়ে দেয়। ও বাধা দেয় না, দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝ'ড়ে পড়ে। সূক্ষ্ম ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নিঃশব্দে বৈঠা হাতে নিয়ে বাড়ীর পথ ধরে সবাই। আকাশ থমথমে, নদী নিকষ কালো। মাঠের মধ্যে ছড়ান গৃহস্থ বাড়ীর মিটমিটে প্রদীপ-জ্বলা-জানালাগুলি যেন আলোর ফুলকি। বাড়ীর কাছে আসতেই মুসল ধারে বৃষ্টি এল—সেবাইনের দেহ হিমে একেবারে অসাড়।

রান্না ঘরে বড় ক'রে আগুন জেলে তার চারিদিকে বসে বৃষ্টি ধরবার অপেক্ষা ক'রতে লাগল সবাই। কিন্তু বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ বেড়ে চলল। সাথে সাথে চলল ঝোড়ো হাওয়া। শহর তিন মাইলের পথ। এই ঝড়-বাদলে সেবাইনকে কিছুতেই যেতে দেবে না তার দাদা। বরঞ্চ দুজনেই রাতটা থাকুক। ক্রিসতফের তেমন ইচ্ছে ছিল না থাকার। সেবাইনের দিকে তাকাল তার মতামত জানার আশায়। কিন্তু সে তাকিয়ে ছিল অগ্নিকুণ্ডের দিকে, হয়ত ক্রিসতফ যেন কোনমতে প্রভাবান্বিত না হয়, এই ও চাইছিল, তাই, ইচ্ছে ক'রে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল ও। ক্রিসতফ জানাল সে থাকতে রাজী আছে—সেবাইনের মুখ লাল হয়ে উঠল [হয় তো আগুনের আভাই পড়েছে]—ক্রিসতফ দেখল ওর চোখে মুখে খুশির আলো জ্বলছে…।

সন্ধ্যেটা বড় চমৎকার। বাইরে বর্ষার দাপট। ভেতরে ধোঁয়ায়-কালো। চিমনী থেকে সোনালী স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ওড়ে। তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারার ভূতুড়ে ছায়ার দল উড়ে বেড়ায় পাঁচিলে। বার-টোলড তার ক্ষুদে ভাগ্নীকে হাত দিয়ে ছায়াবাজী খেলতে শেখায়। অপটু হাতের শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া দেখে আপনি হেসে কুটিপাটি খুকী। সেবাইন ঝুঁকে প'ড়ে একটা ভারী চিমটে দিয়ে আগুন উসকে দেয়। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। ভ্রাতৃজায়া অনর্গল সাংসারিক খুঁটিনাটি ব'লে যায়। সেবাইন না শুনেই হুঁ হুঁ করে। ক্রিসতফ বারটোলড-এর আড়ালে ব'সে সেবাইনকে দেখে। ও প'ড়ে নিয়েছে সেবাইনের হাসিতে অভিনন্দনের যে-বাণী লেখা। সারা সন্ধ্যা একবারটীও একান্তে প্রিয়-সান্নিধ্যের বা সামান্য দৃষ্টি-বিনিময়ের একটু সুযোগ পেলে না ওরা। খুঁজলেও না।

একটু তাড়াতাড়িই সবাই শুতে গেল যে যার ঘরে। সেবাইন আর ক্রিসতফের ঘর পাশাপাশি। ক্রিসতফ পরীক্ষা ক'রে দেখল খিল সেবাইনের দিকে। ও বিছানায় গিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করে। জানালায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ। চিমনির মধ্য দিয়ে বাতাস বইছে সোঁ সোঁ ক'রে। ঠিক ওপরের ঘরটায় একটা জানালা কেবলি বাতাসে ধড়াস ধড়াস ক'রে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ঝড়ের দাপটে একটা পপলার গাছ বেঁকে বেঁকে মাটিতে শু'য়ে পড়েছে যেন গোঙাচ্ছে। ক্রিসতফের চোখে ঘুম নেই। কেমন ক'রে থাকবে! আজ একই গৃহে একই আবেষ্টনীতে প্রিয়ের অত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। মাঝখানে কেবল একটি পাঁচিলের ব্যবধান। সেবাইনের ঘর থেকে কোনো শব্দ আসছে না; কিন্তু ক্রিসতফ যেন ওকে দেখতে পাচ্ছে। বিছানায় উঠে

বসে। দেয়ালে মুখ রেখে ডাকে সেবাইনকে—অতি ধীরে, অতি কোমল আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে; আকুল বাহু দু'খানি শূন্যে কাকে যেন ধ'রতে যায়; ওর মনে হয় প্রাচীরের অপর পারে এমনি আকুল বাহু অন্ধকার শূন্যতায় ওকে খুঁজে ফিরছে…। ওর অন্তরের প্রতি তারে তারে বেজে চলল ওর আহ্বানে প্রিয়ার কল্পিত সাড়া—ওরই বুকের ভাষায়, ওরই ডাকা নাম ধ'রে—ধীর কোমল স্বরে। সাড়া কি ও নিজেই দিল? কার কণ্ঠ বাজছে ওর বুকের তলায়? না ওর ডাকে সত্যি প্রিয়া জাগল? প্রেমের মন্ত্রে প্রাণ পেয়ে প্রিয়া ডাক দিল! তার স্বরই কি ছড়িয়ে গেল ওর চিত্তাকাশে? কল্পনার নয়, ওর মানুষী প্রিয়ারই কণ্ঠ? ক্রমশঃ যেন সেই আহ্বান উচ্চ হ'তে উচ্চে উঠে অন্ধকারকে আলোড়িত ক'রে, শূন্যতাকে ভ'রে দিয়ে. স্তব্ধতার বুকে ঘূর্ণি জাগিয়ে ওর মর্মের তটে আছড়ে পড়ে। দুর্বার, পাগল-করা আহ্বান—কে ঠেকাবে এই ঝড়? লাফিয়ে উঠে পড়ে ক্রিসতফ শয্যা ছেড়ে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছয় দরজার কাছে। কিন্তু না, দরজা খুলবে না ও। দরজা বন্ধ—ভালোই হয়েছে। ওর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আর একবার দরজার হাতলের ওপর হাত রাখল—ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে রুদ্ধ দ্বার—ও যেন পাথর হ'য়ে গেল। সাবধানে বন্ধ ক'রে দিল—আবার খুলল—আবার বন্ধ করল—সংশয় জাগে এই মাত্র না বন্ধ ছিল দরজা?—ছিল·· ছিল···বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল···কিন্তু কে খুলল? ···ওর হৃদপিণ্ডে যেন ভূমিকম্প হ'তে লাগল···নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এল। বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ল নিশ্বাস নেবার জন্য। আবেগের ঢল নেমেছে—ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রিসতফকে. ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে; ও দেখতে পাচ্ছে না···পাচ্ছে না শুনতে। সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত···

নিশ্চল পাষাণীভূত ক্রিসতফ। কেমন যেন ভয়—দিন…পহর…মাস—এই অচেনা পরম আনন্দ খানির জন্য ওর ছিল কামনা-ঘন প্রতীক্ষা—আজ সেই আনন্দ যখন পরম অতিথির মত দ্বারে এল—কেবল দ্বারে নয়, একেবারে বুকের কাছ থানটিতে—হাত বাড়ালেই পাবে একেবারে মুঠোর মধ্যে—তখনই এই ভয়! দেহ ভূমিকম্পের মত কাঁপছে থর থর ক'রে। দামাল ছেলেটার বুকে ভালোবাসার পাগলা-ঝোরা; কিন্তু তবু নতুন-চেনা কামনা গুলোর ভয়ে আঁৎকে উঠল; হঠাৎ গভীর যন্ত্রণায় স'রে এল দূরে। লজ্জা পেল; এই মুহূর্তেই ও এ-কি করতে যাচ্ছিল! আপন প্রবৃত্তির সেই অনাবৃত রূপ দেখে ও যেন মরমে ম'রে গেল। বিপুল ভালোবাসায় ভালোবাসার বস্তুকে ও ভোগের বস্তু ক'রে তুলতে পারলে না—ভোগের এই সাংঘাতিক সুখ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আজ ও সব দিতে পারে—ভালোবাসার বস্তুকে ভোগে অশুচি ক'রে ভালোবাসা যে যায় না—যায় না—।

ভয়ে ভালোবাসার বিক্ষুব্ধ ক্রিসতফ আবার গেল দরজার কাছে… খিলের ওপর হাত রাখল…কিন্তু দরজা খুলতে হাত সরল না—শিথিল হ'য়ে খ'সে পড়ল।

দ্বারের ওদিকে আর একজন—হিম-কঠিন মেজের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সেবাইন।

সময়ের স্রোত ব'য়ে চলে—রুদ্ধ দ্বারের দুই প্রান্তে দুইজন দাঁড়িয়ে… কতক্ষণ…কে জানে কতক্ষণ…মিনিট নয়, ঘণ্টা নয়…যেন অসীম অনন্ত কাল…। স্থান কালের হিসেব অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তবু মর্ম দিয়ে চেনা প্রিয়-সান্নিধ্য-ঘন এই স্থান, আবেগ-উদ্বেল এই মুহূর্তখানি—সে পরিচয়কে অঙ্গে মেখে চারখানি বাহু সম্মুখে প্রসারিত। কিন্তু এত গভীর এত বিশাল ক্রিসতফের প্রেম, দ্বারের বাধা সরিয়ে প্রিয়াকে স্পর্শের সীমায়

আনতে কিছুতেই পারলে না···সেবাইনের আমন্ত্রণ, আবেগ-ভরা প্রতীক্ষা —তার সাথে মেশা ভয় পাছে প্রিয় মানুষটি আসে স্পর্শের পরিসীমায়··· অবশেষে ক্রিসতফ পণ করলে ও দ্বারের বেড়া ভাঙ্গবে···সেই মুহূর্তে সেবাইন তার মন বাঁধলে। আগল পড়ল দরজায়।

মূর্খ! মূর্খ! ক্রিসতফ তুমি মূর্খ। সমস্ত দেহের ভার চাপিয়ে দেয় বন্ধ দরজার পর। খিলের ওপর ওষ্ঠ রেখে মিনতি করে:

'সেবাইন, দরজা খোল।'

ওর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, আকুল আহ্বান শোনে সেবাইন···দরজার কাছে পাষাণ-প্রতিমার মত থাকে দাঁড়িয়ে; ও যেন জমে গেছে···হিম-শিলা··· দাঁতে দাঁতে খট খট ক'রে বাজছে ··ধমনী থেকে সমস্ত শক্তি নিঃসৃত; দরজা খুলবার বা শয্যায় যাবার এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নাই···

দুরন্ত তুফানে বাইরে গাছ ভাঙ্গছে মড় মড় ক'রে; দরজা জানালা আছড়ে প'ড়ছে প্রচণ্ড শব্দে। অবসন্ন দেহ, আতুর হৃদয় নিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা শয্যায়। ভাঙ্গা মোটা গলায় মোরগ ভোরের খবর হাঁকল; জল-সিক্ত জানালার পথে রাত্রিশেষের প্রথম আলোর চরণরেখা পড়ল! বর্ণহীন ফ্যাকাসে সকাল, তখনও বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির ক'রে; বৃষ্টি-ভেজা, রং-চটা গোমরা-মুখ সকাল···

তাড়া-হুড়ো ক'রে বিছানা ছেড়ে ওঠে ক্রিসতফ। রান্নাঘরে গিয়ে সকলের সাথে গল্প জোড়ে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠেছে ও। সেবাইনের একলা-সান্নিধ্যকে ওর ভয় করছে। যদি সেবাইনকে আবার একলা পাওয়া যায়, কখনও পারবে না সে ঘনিষ্ঠ একান্ততা সইতে। বারটোলড্-গৃহিনী যখন এসে বললে সেবাইনের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়েছে ও সকালে যাবেনা, ক্রিসতফ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নিরানন্দ ঘর-ফেরা। পীতাভ কুয়াশার জালে, মাঠ, ঘাট, গাছ, ঘর-বাড়ী, আকাশ সব কিছু ছাওয়া। কুয়াশার আধা-স্পষ্ট আড়ালে গাছ-ঘর-বাড়ি সব যেন প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিবে গেছে—মরে গেছে পৃথিবী—কাফন দিয়ে ঢাকা তার শব। সপসপে মাঠের পথে, প্রেতায়িত পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে, কুয়াশার জালের মধ্য দিয়ে চলেছে ক্রিসতফ—ক্রিসতফ নয়, ক্রিসতফের প্রেত। পৃথিবীর বুক হতে আজ আলো মুছে গেছে—ক্রিসতফের আজ জীবন-খানিও মুছে গেল—নিঃশেষে। মানুষ নেই আর ক্রিসতফ, এ ক্রিসতফ তার প্রেত।

বাড়ী এসে দেখে সবার মুখ রাগে থম্‌থমে। হতভাগা লক্ষীছাড়া ছেলেটা ওই মেয়েটার সাথে কোথায় রাত কাটিয়ে এল কে জানে! —কলঙ্ক! কলঙ্ক! সকলের মুখের ভাবে যেন একটা স্তব্ধ চীৎকার—কলঙ্ক! কলঙ্ক! ঘর থেকে বেরুল না আর ক্রিসতফ—খিল এঁটে বসে নিজের কাজ করে। সেবাইন ফিরল পরের দিন। তার ঘরেও খিল পড়ল—পাছে পরস্পরের সাথে দেখা হ'য়ে যায়। তখনও ঠাণ্ডা যায়নি, দিনগুলো স্যাঁৎসেতে। ঘর থেকে কেউ বেরয় না ওরা। কেবল বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে কখনও কখনও দেখে পরস্পরকে। সেবাইনের বুকে প্রেমের আগুন জ্বলেছে। সেই জ্যোতির্বসন অঙ্গে প'রে ও যেন ধ্যান-মগ্ন হয়েছে। ক্রিসতফ তার কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুব দিল। দেখা হ'লে সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ জানায় বটে—কিন্তু তার ওপর যেন বরফের খোলস। সম্ভাষণ জানিয়েই মুখ ফেরায়—যেন আবার হারিয়ে গেছে। মনের মধ্যে কোন ভাবের জোয়ার ভাটা খেলছে, কে তার হিসেব রাখে! পরস্পরের ওপর, নিজের ওপর, সব কিছুর ওপর ওদের ভারী রাগ হ'য়েছে। গ্রামান্তরের সেই

রাত্রিখানি ওরা স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিয়েছে—বড় লজ্জা। কিন্তু এ লজ্জা যে কিসের জানেনা ওরা···একখানি রজনীর তমিস্রায় ওদের বুকে তুফান উঠল, রক্তে জাগল জোয়ার—লজ্জা কি তারি? না সে-জোয়ারে ঝাপিয়ে পড়েনি ব'লে। কেন লজ্জা? কেন অমন লুকিয়ে থাকা; কেন পরস্পরের কাছ থেকে পালিয়ে ফেরা। ওরা পালিয়ে ফেরে বেদনা থেকে বাঁচবে বলে। যা ভুলতে চায়, যা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়, প্রিয়-সান্নিধ্যে তারাই আসে গভীর বেদনার রূপ ধ'রে। কেবল দর্শনও আজ বেদনা ব'য়ে আনে। তাই, চার-দেয়ালের মধ্যেকার এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন যেন পরস্পরকে ভুলবার জন্য ওদের যৌথ ব্যবস্থা। কিন্তু ভোলাই কি সম্ভব? কি এক রূপহীন বৈরিতা মনের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। ভেতর কুরে কুরে খায়··· পাঁজরগুলো মুচড়ে মুচড়ে ভাঙ্গে। ক্রিসতফ দেখেছে সেবাইনের হিম-কঠিন চোখের দৃষ্টি— দেখেছে সেই তুহিন-শিলায় গভীর তিক্ত-ঘৃণার কিলবিলানি। দেখেনি কি সেবাইনও? ওর বুকেও জ্বলছে আগুন। দুহাতে তাকে চাপতে চায়—না দেবেনা জ্বলতে—মানবে না, মানবে না —এ আগুনকে ও স্বীকার করবে না। কিন্তু সব চেষ্টা ভেসে যায়—ও আগুন থেকে ওর মুক্তি নাই। দাহ ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে— লজ্জা তার শিখায় শিখায় জ্ব'লে ওঠে। ওর বুকের তলায় যে-তুফান উঠেছে—বুঝিবা ক্রিসতফ তার হাওয়ার দাপট দেখেছে। প্রিয়ের কাছে ধরা না দিলেও ও যে আপনাকে নিবেদন করেছিল সেই ঝড়ের রাতের রুদ্র-লগ্নে, সে-খবরও বুঝি ওর অগোচর নয়। লোকটার কাছে বেমালুম সব ফাঁস হ'য়ে গেছে। এ লজ্জা রাখবে কোথায় সেবাইন? কিসে যাবে ওর দাহ?

এমনি সময় এল কলোন আর ডিউসেলডরফ থেকে ক্রিসতফের

কনসার্টের নিমন্ত্রণ। লুফে নিল ও এ-সুযোগ। দু-তিনটে সপ্তাহ অন্ততঃ বাড়ীর বাইরে থাকা যাবে। কনসার্টের জন্য নূতন সুর রচনা আর তার প্রস্তুতিতে ক'টা দিন একেবারে ভরে রইল—যে-সব স্মৃতি চিত্তকে শোষণ করেছে অহর্নিশ তারা আর এ-কয়দিন ঠাঁই পেলেনা। সেবাইনের মনের মেঘও কোন হাওয়ায় উড়ে গেল—আবার সুরু হ'লো তার প্রতিদিনকার স্রোতে তন্দ্রালু ভেসে যাওয়া। পরস্পরের প্রতি এল কেমন ঔদাস্য। সত্যি কি ভালোবেসেছিল ওরা? আজ সংশয় হয়।

হয়ত ক্রিসতফ সেবাইনের কাছে বিদায় না নিয়েই চলে যেত। কিন্তু যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কোন এক অদৃশ্য শক্তির টানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো ওরা। সে-দিন রবিবার—বিকেলে সবাই গেছে গির্জায়। গোছাবার কিছু কাজ বাকী ছিল—ক্রিসতফ গিয়েছিল বাইরে কেনা কাটা করতে। পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে সেবাইন বসেছিল তার বাগানে। এমন সময়, ক্রিসতফ ফিরে এল। দেখল ওকে। ইচ্ছে ছিল ছোট্ট একটুখানি আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণ জানিয়ে ও চলে যাবে। কিন্তু থাম্‌ল কিসের টানে। সেবাইনের মুখখানা যেন বড় ফ্যাকাশে—না থেমে পারলে না ক্রিসতফ! অনুতাপ? ভয়? না কোন অচেনা হাওয়া উঠল ওর হৃদয়ের দিগন্তে! দাঁড়াল থম্‌কে, সেবাইনের দিকে ফিরে—বেড়ার ওপর ঝুঁকে শুভ-সন্ধ্যা জানাল। প্রতি-সম্ভাষণ না জানিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিল সেবাইন। হাসল মৃদু মন্থর হাসি। ওতো শুধু হাসি নয়—প্রসন্ন আকাশ! আলোর ভাষায় ডাক পাঠাচ্ছে: ওগো সুহৃদ, আর রোষ রেখোনা। এবারে হাত মেলাও। সেবাইনের এত বড় দক্ষিণ-রূপ ক্রিসতফ আর দেখেনি। বেড়ার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতখানা হাতে নিয়ে নীচু হয়ে চুমু খেল। হাত টেনে

নিল না সেবাইন। ক্রিসতফের ইচ্ছে হ'ল নতজানু হ'য়ে বলে 'আমি তোমায় ভালোবাসি···ওগো আমি তোমাকেই ভালোবাসি।' কিন্তু নীরব চাহনির মূক ভাষা সব ব্যর্থতার উর্ধ্বে উঠল। কোনো কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিলেনা এ কয়দিন কেন পালিয়ে বেড়িয়েছে। কয়েকটি মুহূর্ত—তারপর সেবাইন হাত ছাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। ক্রিসতফও মুখ ফেরাল—পাছে হৃদয়ের চঞ্চলতা ধরা পড়ে। তারপর শান্ত স্থির অনাহত দৃষ্টিতে আবার চার চোখের দৃষ্টি বিনিময়। সূর্য চলল অস্ত-দিগন্তে। বেগুনী, জরদ, মভ রং-এর সূক্ষ্ম শিখা রাঙ্গা পাখীর মত মেঘ-মুক্ত হিম আকাশের বুকে উড়ে বেড়াতে লাগল। শীতের একটা কাঁপন খেলে গেল সেবাইনের দেহময়। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আলোয়ানখানা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিল। ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করল :

'কেমন আছ ?'

মুখটা সামান্য একটুখানি বেঁকে গেল শুধু, উত্তর দেবার মত প্রশ্নই নয়। তারপর আবার বাক্য-হীন চেয়ে থাকা। ওরা যেন পরস্পরকে খুইয়ে ব'সে ছিল, এইমাত্র আবার পেলো. তারি সুখ মৌন-দৃষ্টিতে স্তব্ধ আকাশে তারার মত দুলতে লাগল।

নীরবতা ভাঙ্গলে ক্রিসতফ :

'কাল চ'লে যাচ্ছি আমি।'

সেবাইনের চোখে মুখে ভয় উঠল কালো হ'য়ে : 'যাচ্ছ—?'

তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল ক্রিসতফ : 'দু'তিন সপ্তাহের জন্য মাত্র।'

'দু'তিন সপ্তাহ—?' নৈরাশ্য ঘন হয়ে ওঠে সেবাইনের স্বরে।

বুঝিয়ে বলে ক্রিসতফ, চুক্তিটা দু'তিন সপ্তাহের জন্য হ'য়ে গেছে। এবার ফিরলে সারা শীত আর কোথাও এক পা নড়বেনা ও।

'শীত কা-আ-লে—' সে তো বহুত দেরী !'

'কোথায় দেরী, কে বললে, এই তো এলো ব'লে—'

কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে সেবাইন। চোখ নামিয়ে নেয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করে : 'আবার কবে দেখা হবে ?'

প্রশ্নটা বুঝলেনা ক্রিসতফ, কেননা উত্তর তো দিয়েই রেখেছে। বলে : 'কেন ? এই যে বললাম, দিন পনের কুড়ি হবে ; খুব বেশী হ'লে হপ্তা তিন। এ আর এমন বেশী কি ?'

তবু চোখে বেদনার ছায়া নেমে আসে। ক্রিসতফ ওকে ক্ষ্যাপাতে চেষ্টা করে :

'দেরী হলেই বা কি। দেরী বা শিগগির তুমি বুঝবেই বা কি করে ? ঘুমিয়েই তো মেরে দেবে।'

'হবে।' সেবাইন উত্তর দেয়। মাথা নীচু হ'য়ে যায়। হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিখানি যেন শির্ শির্ ক'রে কাঁপে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ডাকে, 'ক্রিসতফ !' কেমন ক্লিষ্ট আর্তস্বর, যেন বলতে চায় : 'যেওনা তুমি, থাকো—'

ক্রিসতফ ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নেয়—বোঝেনা, ওর এই পনেরো দিনের অনুপস্থিতি সেবাইনের কাছে কি এমন বড় লোকসান হ'য়ে উঠল। কেন অমন করছে ও ! 'যাবনা, যাবনা, আমি—' আকুলি বিকুলি করে ওর কণ্ঠে, বুকে। কেবল বুঝি সেবাইনের কাছ থেকে একটু ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা। সেবাইন যদি একটিবার বলে, যেওনা তুমি !

সেবাইন কি বলতে গেল, অমনি সামনের দরজা খুলে গেল, এল রোজা। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল সেবাইন। দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে আর একবার পেছন ফিরে ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

ক্রিসতফ ভেবেছিল, সন্ধ্যের দিকে আর একবার অন্ততঃ দেখা হবে। কিন্তু ফোগেলদের চোখের প্রহরা রইল সারাক্ষণ, এবং মাও রইলেন সাথে সাথে ; আর যা ওর স্বভাব, গোছান কিছুতেই হ'য়ে উঠে না ; অতএব শেষ মুহূর্তে আর সময় পেলেনা যে গিয়ে বিদায়টুকু নিয়ে আসবে।

পরের দিন খুব ভোরেই ওকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। সেবাইনের দুয়ারের সামনে দিয়ে পথ—ইচ্ছে হল, একটিবার জানালায় আস্তে ক'রে টোকা মেরে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যায়। অমনি অমনি চ'লে যেতে মন কিছুতেই সরছিল না। বিদায় নেওয়া হয়নি সন্ধ্যে-বেলা রোজা এসে পড়ায়। কিন্তু শেষে ভাবলে হয়ত ও ঘুমিয়ে আছে, জাগালে অসন্তুষ্ট হবে। আর জাগিয়ে বলবেই বা কি ? তাছাড়া যদি যেতে দিতে না চায়! না গেলে তো চলবে না! ব্যবস্থা বহুদূর এগিয়ে গেছে। সেবাইনের ওপর জোর খাটাতে এবং দরকার হ'লে একটু আধটু কষ্ট দিতেও ক্রিসতফের বাধবে না—যেন দাবী হিসেবেই। কিন্তু নিজের কাছেও কথাটা স্বীকার করবে না ও। ওর অনুপস্থিতিতে সেবাইনের সম্ভাবিত-দুঃখটাকে ও তেমন আমল দিলেনা। ভাবলে, সেবাইনের মনের কোণে ওর জন্য যদি মমতা থাকে, এই সাময়িক ব্যবধানে তা আরও গভীর হবে।

ষ্টেশনে গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। মনের কোণে একটু খচ খচ করতে থাকল। কিন্তু ট্রেন চলতে আরম্ভ করার সাথে সাথে সব ভুলে গেল। উদ্দাম যৌবন, হৃদয় যেন ভাদ্রের নদী। প্রথম সূর্যের রক্ত-রাগে রাঙ্গা পুরানো শহরটির দিকে তাকিয়ে যৌবনোদ্দীপ্ত মন আনন্দে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠল। আনন্দে প্রণাম করল সেই আশ্চর্য রূপকে। আগে চলার হালকা সুরে পেছনে-থাকার দলকে জানালে বিদায়। এবং তার পরে সকলের কথা গেল মন থেকে মুছে।

ডিউসেলডরফ ও কলোনে যতদিন ছিল, তার মধ্যে সেবাইনের কথা ওর মনে হ'য়েছে মাত্র এক দিন। দিন রাত জলসা, সভা, সমিতি, ডিনার, বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়নের ঝোড়ো হাওয়ায় বেড়াল উড়ে ; সফল-প্রয়াসের আনন্দ আর গর্বে রইল বুক ভরে ; পেছনের স্মৃতির না হ'লো ঠাঁই না হ'লো অবকাশ। আসবার দিন পাঁচ পরে একদিন কেবল রাত্রিতে ওকে স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ; বুঝল, ঘুমের ঘোরে সেবাইনের কথাই ভাবছিল এবং হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাবার কারণও ওই। কিন্তু কি ভাবছিল, তা আর কিছুতেই মনে করতে পারল না। মনটা অস্বস্তিতে ভরে রইল, শরীরটাও অসুস্থ বোধ হ'ল। অবশ্যি অস্বাভাবিক বা অবাক হবার কিছু নয়। কারণ সন্ধ্যেবেলায় একটা জলসার পর এক নেমন্তন্নে ওকে টেনে নিয়ে যায় সবাই। সেখানে শ্যাম্পেনের মাত্রা কিছু বেশী হয়ে পড়ে। ফলতঃ রাতে ঘুম হ'লোনা, উঠে পড়ল। একটা নূতন সুরের ছক ওর মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল ; মনকে বোঝাতে চাইল, ওই জন্যই ঘুম ভেঙেছে। তখুনি লিখে রাখলে স্বর-লিপি। লেখার সময় মনে কোন মেঘ ছিল না ; থাকলেও তা ছিল ওর অজ্ঞাত। কিন্তু লেখা সঙ্গীতটা পড়ে দেখলে, যেন ব্যথার একখানা নদী। অবাক হ'ল না, কারণ এমন তো কতবারই হয়েছে।

খুব বেদনা-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন সুর রচনা করেছে, চেষ্টা সত্ত্বেও দুঃখের সুর বেরয়নি। বেরিয়েছে এমনি হাল্কা খুশির সুর, যা ওর নিজের মনের স্বাভাবিক সুরটির একেবারে বিপরীত। সুতরাং আর বিশেষ ভাবলে না এ কথা। চিত্তের বিপুল জগতে এমনি কত আশ্চর্য ব্যাপারই তো ঘটছে, যা চিরকাল ওর অবোধ্য রয়ে গেল। তক্ষুণি আবার ঘুমিয়ে পড়ল এবং ঘুমুল একটানা সকাল পর্যন্ত।

তিন চার দিন আরো বেশী থাকতে হ'ল। যাওয়া পিছিয়ে যাওয়ায় ওর বেশ ভালোই লাগল। যেতে তো ইচ্ছে করলেই পারে; আর তাড়াই বা কি এমন যাবার! ফেরার পথে ট্রেনে ব'সে সেবাইনের কথা মনে এল। চিঠিও লেখেনি একখানা বেচারাকে। এমন কি চিঠি পত্র কিছু এল কি না, সে খবর নেবার কথাও মনে ছিল না। কাউকে চিঠি পত্র না লিখে যে ও এমনি চুপ ক'রে আছে, এতে মনে মনে বেশ আত্ম-প্রসাদ লাভ করল। বাড়ীতে ওর একটা স্থান আছে, পথ চেয়ে থাকার, ভালোবাসার লোক আছে এ সম্বন্ধে ও সচেতন। ভালোবাসা? কে ভালোবাসে? কই ভালোবাসার কথা তো কেউ কাউকে কখনও বলেনি ওরা! বলার দরকার হয়নি। ও তো অমনি জানা ছিল! কিন্তু অমনি-জানা সত্যকেও পাকা করে নেওয়ার দরকার। কেন করেনি ওরা এতদিন? কেন, কিসের এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা? বলতে গেছেও ক'বার; প্রতিবার হয় লজ্জা এসে কণ্ঠ চেপেছে, নয় কুণ্ঠায় বুদ্ধি হয়েছে ঘোলাটে। নয় অন্য কোনো আকস্মিক বাধা ঘটেছে। প্রতিবার কিছু না কিছু বাধা ঘটেছে। কত দীর্ঘ সময় বৃথায় চলে গেল অবহেলায়। কেন গেল? এমনি ক'রে কেন হারালো অমূল্য সময়? প্রিয়ার মুখ থেকে প্রিয় কথা ক'টি শুনবার জন্য, প্রিয়ার কানে কানে প্রিয় কথা ক'টি বলবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে ক্রিসতফ। ট্রেনের শূন্য কক্ষে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—'ওগো ভালোবাসি, ভালোবাসি।' শহরের যত কাছে এলো, ততই বেশী অধীর হ'য়ে উঠল। যন্ত্রণায়, বেদনায় শতধা হ'য়ে গেল। ওগো ট্রেন, চলো আরো জোরে চলো, আরো জোরে চলো! আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ও দেখতে পাবে তাকে—আর একটি ঘণ্টা মাত্র! কি আনন্দ…

ভোর সাড়ে ছ'টায় এসে পৌঁছুল বাড়ী। তখনও কেউ ওঠেনি। সেবাইনের জানালা বন্ধ। পা টিপে টিপে ভেতরের উঠনে এল যাতে সে শুনতে না পায়। অবাক ক'রে দেবে ওকে। ভেবে উল্লসিত হ'য়ে উঠল। নিজের ঘরের কাছে গেল আস্তে আস্তে। মা তখনও ঘুমিয়ে। নিঃশব্দে স্নান ক'রে চুল আঁচড়ে নিল। ক্ষিদে পেয়েছে ভয়ানক। রান্নাঘরে গিয়ে খুঁজে আসা যায়, কি আছে না আছে। কিন্তু মায়ের ঘুম যদি ভেঙে যায়। আঙ্গিনায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। জানালা খুলে দেখল, রোজা উঠে ঝাঁট দিচ্ছে। রোজকার মতই ও সকলের আগে উঠেছে! খুব চাপা স্বরে রোজাকে ডাকলে। রোজা চম্‌কে উঠল। ক্রিসতফকে দেখে বিস্মিত পুলকে ওর চোখ ঝলমল ক'রে উঠল, তারপর অকস্মাৎ ও গম্ভীর হয়ে গেল। ক্রিসতফ ভাবলে ওর রাগ এখনও পড়েনি। ও আজ ভারী খোস-মেজাজ। এগিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে:

'শিগগির খেতে দাও, রোজা। এমনি সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছে যে এক্ষুনি খেতে না পেলে তোমাকে ধরে খাব।'

রোজা একটু হেসে ওকে নীচের তলায় রান্না ঘরে নিয়ে গেল। এক বাটি দুধ এনে দিয়ে সামনে বসল! ও কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কেমন হল গান ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন ক'রে গেল এক নিঃশ্বাসে। বাড়ী ফেরার আনন্দে রোজার বক্‌বকানী শুনতে এবং তার জবাব দিতেও ওর ভালো লাগছিল আজ। কিন্তু প্রশ্নের ঝড়ের মাঝখানে রোজা হঠাৎ থেমে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মুখখানা হঠাৎ কি এক অব্যক্ত বিষাদে কালো হয়ে উঠল। একটু পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে কথা আরম্ভ করল। আবার থামল...। এবারে লক্ষ্য করল ক্রিসতফ।

'কি হলো রোজা? রাগ যায়নি বুঝি?'

খুব জোরে জোরে নেতিবাচক মাথা নাড়ল রোজা। তারপর ওর অভ্যস্ত আকস্মিকতায় হঠাৎ ক্রিসতফের হাতখানা ধ'রে ব'লে উঠল :

'উঃ ক্রিসতফ—'

ভয় পেয়ে গেল ক্রিসতফ। হাত থেকে খাবার পড়ে গেল ; মুখ দিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বেরুল : 'কি, কি হয়েছে ! বলো শিগগির—'

'কি হবে, ক্রিসতফ ? সাংঘাতিক খবর—।'

ঝট্‌কা মেরে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে ক্রিসতফ। জিজ্ঞাসা করে :

'এ—এ—খানে ?'

ওদিকের ঘরখানার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রোজা। ক্রিসতফ চীৎকার ক'রে ওঠে :

'কি সেবাইন ? কি হয়েছে ?'

কেঁদে ওঠে রোজা :

'নেই, সে নেই—'

ক্রিসতফের চোখের সামনে নিকষ কালো আঁধার নেমে এল। উঠে দাঁড়াল, টলতে লাগল ; টেবিল ধরে সামলে নিল। ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপরকার জিনিষপত্র ছত্রখান হ'য়ে পড়ে গেল। চীৎকার করে কাঁদতে চাইল। ভেতরে যেন একটা ভয়াল আগুন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। ও যেন উন্মাদ হয়ে উঠল।

রোজা তাড়াতাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল ভয় পেয়ে। ক্রিসতফের মাথাটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল ও ; চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে অঝোরে। একটু সামলে নিয়ে ক্রিসতফ বলে :

'মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে কথা !' কিন্তু জানে ও এত বড় সত্যি মিথ্যে হতে পারে না। তবু মানবে না, মানবে না ও, মানতে পারবে না। নিজেকে মিথ্যে বোঝাতে চাইল, হতে পারে না, কিছুতেই এত

বড় অঘটন ঘটতে পারে না। রোজার অশ্রু-ভেজা মুখের লেখা প'ড়ে সংশয়ের অবকাশ রইল না আর। ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল ক্রিসতফ।

রোজা মাথা তুলে ডাকে : 'ক্রিসতফ!'

ক্রিসতফ দুই হাতে মুখ ঢাকে! রোজা ঝুঁকে পড়ে : 'ক্রিসতফ, মা আসছেন!' ক্রিসতফ উঠে পড়ে : 'আমায় যেন দেখতে না পান—'

ওর হাত ধ'রে ওদিককার জ্বালানী কাঠ রাখার গুদাম ঘরটায় নিয়ে যায় রোজা। দুই চোখ জলে ঝাপসা, পথ দেখতে পায় না ক্রিসতফ। হোঁচট খেয়ে টলে টলে চলে। চালার মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় রোজা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, একটা কাঠের ওপর ব'সে পড়ে ও। রোজা বসে জ্বালানি কাঠের স্তূপের উপর। বাইরের শব্দ সামান্য শোনা যায় এখানে। হ্যাঁ, এখানে ও কাঁদতে পারবে প্রাণ ভরে। বাইরে থেকে শোনা যাবার ভয় নেই। বাঁধ ভেঙ্গেও গেল। কান্নার বন্যা ছুটল—তটভাঙ্গা, দিক-হারা বন্যা। ক্রিসতফের চোখের জল দেখেনি রোজা এর আগে। নিজের বালিকা-সুলভ সহজ-অশ্রুর সাথেই ওর ছিল পরিচয়। বেদনার এমন বিপুল রূপ, আর তা পুরুষের, দেখে ভয়ে বেদনায় ও বিহ্বল হয়ে গেল। ক্রিসতফের প্রতি নিবিড় গভীর ভালোবাসায় ওর হৃদয় উথলে উঠল—এ ভালোবাসায় কোনও স্বার্থ-বুদ্ধির জটিলতা নেই; একেবারে শুচি, শুভ্র, পরিপূর্ণ, ত্যাগ আর মায়ের মত আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার উন্মুখতায় মহিমান্বিত। রোজা ওর জন্য দুঃসহ দুঃখ-ভাগী হ'তে পারলে যেন বাঁচে। ওর সমস্ত দুঃখের হলাহলকে নিঃশেষে পান ক'রে স্বয়ং নীল-কণ্ঠ হ'তে চায়। দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে : 'কেঁদনা ক্রিসতফ, কেঁদনা।'

ক্রিসতফ হাত সরিয়ে দেয় : 'না আমি বাঁচতে চাইনা, চাইনা—'

'না, না, ওকথা বলোনা, বলোনা।'

'পারব না—এমনি ক'রে পারব না—কি হবে বেঁচে থেকে?'

'ক্রিসতফ, ক্রিসতফ, একা নও তুমি, ক্রিসতফ—তোমারও ভালোবাসার মানুষ আছে—'

'চাইনে আমি। কিছু চাইনে—কারো ভালোবাসা চাইনে—কাউকে ভালোবাসিনে—কাউকে নয়। আমি শুধু ওকেই ভালোবাসতাম—।'

দুই হাতে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদে ক্রিসতফ। ক্রন্দনের বেগ বেড়ে চলে। রোজা কোনও সান্ত্বনার ভাষা পায় না। কিন্তু ক্রিসতফের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ওর বুকে তীরের ফলার মত এসে বিঁধল। ক্রিসতফ ভাবছে কেবল তার নিজের দুঃখের কথা। যে-মুহূর্তে রোজা নিজেকে ভাবলে ক্রিসতফের নিকটতম একান্ততম আত্মীয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙলো ওর স্বপ্ন। দেখলে ওর চারদিকে ধূ ধূ করছে জনহীন তেপান্তরের মাঠ···শুধু বাইরে নয়, ওর বুকের মধ্যেও···শোক ওদের হাতে রাখী বাঁধতে পারলে না, ছুঁড়ে ফেললে দুস্তর সাগরের দুই পাড়ে। রোজা বুক-ভাঙ্গা কান্নায় লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে চোখের জল মুছে ক্রিসতফ কি জিজ্ঞাসা করতে গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক'টা শব্দ বেরুল মাত্র: 'কি করে—কি করে—?'

রোজা বুঝল, বলল: 'যেদিন তুমি গেলে ঠিক সেদিনই হলো ইনফ্লুয়েন্‌জা, দেখতে দেখতে হু হু ক'রে বেড়ে গেল—'

পাঁজরা ভাঙ্গা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল: 'ওঃ খবর দিলে না কেন একটা?'

'লিখেছিলাম তো চিঠি। কিন্তু ঠিকানা কি ছাই কাউকে দিয়ে গেছ? থিয়েটারের আফিসে গিয়ে খোঁজ নিলাম, কেউ জানে না তোমার ঠিকানা।'

ক্রিসতফ জানে কত ভীরু রোজা, এবং কি কষ্টই না ওকে করতে হয়েছে। বললে :

'চিঠি লিখতে কি—ও কি—ও কি—বলেছিল?'

মাথা নাড়ে রোজা,…

'না বলেনি কেউ, আমি নিজেই ভাবলাম—'

রোজার হৃদয় দুলে ওঠে ; ক্রিসতফের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে চোখের জলে ওর মাথা ভিজিয়ে দেয়। এই শুচি শুভ্র স্নেহের মহিমা মর্মে মর্মে বুঝল ক্রিসতফ। একটু সান্ত্বনার ওর বড় প্রয়োজন আজ। চুমু খায় রোজাকে। বলে :

'রোজা এত ভালো তুমি? ওকে তুমিও ভালোবাসতে?'

বাহুর বন্ধনে ছেড়ে দিলে রোজা। মুখে কোনো ভাষা ফুটল না। কেবল চেয়ে রইল আবেগ-গভীর দৃষ্টিতে। সে তো দৃষ্টি নয়, উদ্ঘাটন! 'ভালো যাকে বেসেছি সে-মানুষ সে নয়, সে নয়—' এই অনভিব্যক্ত স্বীকৃতিরই যেন দৃষ্টি-ময়ী উদ্‌ঘোষণা। ক্রিসতফ নূতন আলো দেখল। যে সত্যকে এতদিন চোখ মেলেও দেখেনি, দেখতে চায়নি, আজ তা পূর্ণ রূপে একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্রিসতফ জানল রোজা ওকে ভালোবাসে।

এমেলিয়ার ডাক শোনা গেল। রোজা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল :

'শ্ শ্ শ, দাঁড়াও, মা ডাকছে আমাকে। ভেতরে যাবে এখন?'

'না না যাব না, পারব না কারো সাথে কথা কইতে। মায়ের সাথেও না। আর একটুখানি একা থাকতে দাও আমায়।'

'আচ্ছা তাই থাকো, আমি এই এলাম ব'লে।'

গুদামের নির্জন অন্ধকারে একা রইল ক্রিসতফ। মাকড়সার জাল-ছাওয়া ছোট্ট একটা ঘুলঘুলির ফাঁকে সরু একটি আলোর রেখা এসে পড়েছে।

রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে ; দেয়ালের ওধারের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়ার মাটিতে পা ঠোকার শব্দ আসছে তার নাকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ-এর সাথে মিশে। ক্রিসতফ ভাবছে, যে-মধুর সত্যটা এই মাত্র ওর কাছে উদ্ঘাটিত হ'ল কই তাতে বুক দুলল কই ? না দুলুক, মুহূর্তের জন্য ওর সমস্ত চিন্তার জগৎ অধিকার ক'রে রইল—এতদিন যা বোঝেনি আজ তা বেবাক দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেল ; তুচ্ছ বলে অবহেলায় যে সব জিনিষ এক পাশে সরিয়ে রেখেছিল, আজ তাদের অর্থ একেবারে হাতের কাছে এসে ধরা দিল। অবাক হয়ে যায়, কার কথা ভাবছে ও ? অত বড় বেদনাকে ভুলে মন কেমন ক'রে অমন পলাতক হ'ল ? লজ্জায় ও এতটুকু হ'য়ে গেল। কিন্তু এত নিদারুণ দুঃসহ, এত ভয়ংকর সে-বেদনা, যে ওর ভয় হল, আর রক্ষা নেই। সেই ভয় ওর সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি, বুকের দুর্জয় সাহস, ওর প্রেমকে অতিক্রম ক'রে জোর ক'রে ওকে ওই অন্ধকার থেকে টেনে সরিয়ে আনলে। জলে ডুবে আত্ম-হত্যা করতে গিয়ে মানুষ যেমন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাতের কাছে কুটোটুকু পেলেও আঁকড়ে ধরে, যাতে মৃত্যুকে ঠেকান সম্ভব না হলেও অন্ততঃ খানিকক্ষণ ভেসে থাকা চলে ; বাঁচবার জৈব প্রেরণায় রোজার কথা ক্রিসতফের কাছে তেমনি অবলম্বন হয়ে উঠল।

যে মানুষটা ওরই জন্য দুঃখ পাচ্ছে তার দুঃখটা পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করে নিলে নিজের বেদনায়। যাকে ও কাঁদিয়েছে, তার কান্নার ভাষাটা ও পড়ে নিলে। রোজার জন্য একটা মমতা উদ্বেল হয়ে উঠল। মমতা, কিন্তু ভালোবাসা কোথায় ? কঠিন ! কঠিন ! আরো কত কঠিন হবে ! রোজাকে ও ভালোবাসতে পারলে না। তবে রোজা কেন ভালোবাসছে ওকে ! কোন লাভে, কোন প্রতিদানের আশায় ? বেচারা ! না, খুব ভালো মেয়ে রোজা ; এই মাত্র ক্রিসতফ প্রমাণ

পেল না কি তার! কিন্তু হোক রোজা ভালো মেয়ে, তাতে ওর কি! রোজার জীবনের কতখানি দাম ওর কাছে?

ক্রিসতফ ভাবে—

'যে নেই আর যে আছে তার মধ্যে ঠাঁই-বদল হল না কেন? যে আছে, সে না হয় নাই থাকতো! যে নেই সেই কেন থাকল না?'

ভাবনা এগিয়ে চলে:

'রইল যে-মানুষ, সে আমায় ভালোবাসে; আজ—কাল—সারা জীবন ধরে সে আমায় শোনাতে পারে তার ভালোবাসার কথা। কিন্তু যাকে হৃদয় দিয়ে আমি ভালোবাসলাম তাকে হরণ করল মৃত্যু। তার বুকের ভাষা মুখের কথায় ফুটবার সময় হলো না, না হলো আমার। যা ছিল পরম ক'রে শুনবার ও শোনাবার, চরম দিনের প্রত্যন্তে এসে তা অব্যক্ততায় ঠেকে রইল। শোনাও হবে না, শোনানও হবে না আর কোনও দিন—'

শেষ সন্ধ্যাটি হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়। রোজা এসে গেল—বলতে-যাওয়া-কথা বলা হয়নি—

রোজার ওপর বড় রাগ হয়, ঘৃণা হয়।

গুদামের দরজা খুলে যায়। খুব নীচু কোমল স্বরে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে হাতড়ে রোজা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। ক্রিসতফের গাটা শির্ শির্ ক'রে ওঠে ঘৃণায়। এই অনুচিত মনোভাবের জন্য ক্রিসতফ নিজেকে তিরস্কার করে। কিন্তু মন শাসন মানেনা।

রোজা নির্বাক। ভালোবাসা ওকে নীরব হ'তে শিখিয়েছে। ক্রিসতফ বাঁচল, ওর ঘা কাঁচা, এর ওপর রোজার বাজে বক্‌বকানীর জ্বালা সইত না। কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল ওর ওপর।

তবু জানতে ইচ্ছে করে। রোজাই একমাত্র মানুষ যে তার কথা ওকে শোনাতে পারে। ফিন্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করে :

'কবে— ?' মারা গেছে কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল না। সাহস হলো না।

জবাব দেয় রোজা :

'গত শনিবারের আগের শনিবার।'

ধোঁয়ার মত কি যেন মনে প'ড়ে যায়। বলে : 'রাতে ?'

রোজা অবাক হ'য়ে তাকায় : 'হ্যাঁ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে।'

সে-দিনের সেই সুরটা মনে পড়ে যায়। কি গভীর কান্নার সুর! শুধায় : 'খুব কষ্ট পেয়েছে কি ?'

'না, না। কপাল ভালো, ভোগেইনি বলতে গেলে। দুর্বল ছিল ভয়ানক। কাজেই বিশেষ লড়তে হয়নি। টুক ক'রে যেন খসে পড়ল।'

'সে—সে কি বুঝতে পেরেছিল ?'

'জানিনা—আমার মনে হয়···'

'কিছু ব'লে গেছে কি ?'

'না, কিছু বলেনি। ছেলেমানুষের মত শেষ পর্যন্ত নিজের জন্যই ভারী ব্যস্ত ছিল।'

'তুমি ছিলে কাছে ?'

'হ্যাঁ। প্রথম দু'দিন আমি একাই ছিলাম, তারপর ওর দাদা এলেন।'

রোজার হাত দুখানিতে কৃতজ্ঞতা-ভরা একটি চাপ পড়ে। 'ধন্যবাদ রোজা, ধন্যবাদ।' রোজার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ধমনীর উষ্ণ রক্তের ধারাটি যেন ছড়িয়ে পড়ে ওর মুখের 'পরে।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

ক্রিসতফের ঠোঁট দুখানি কাঁপতে থাকে।

একটা প্রশ্ন গলার কাছে ডানা ঝট্ পট্ করছিল এতক্ষণ। কাঁপা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে ছিট্কে একটুখানি কেবল বেরিয়ে আসে :

'কিছু—কিছু—আমায় কি কিছু বলে গেছে ?'

বিষণ্ণ ভাবে রোজা নিষেধ করে মাথা নেড়ে। যে-জবাব শোনবার জন্য ক্রিসতফের সমগ্র ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, সে জবাবখানি যদি দিতে পারত রোজা! যদি সব দিয়েও পারত! মিথ্যা কথা এল না ওর মুখে। সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলে :

'জ্ঞান ছিলনা কিনা।'

'কথা বলছিল তো!'

'হ্যাঁ, কিন্তু এত আস্তে যে কিছু বোঝা যায় নি।'

'বাচ্চাটি কোথায় ?'

'মামা নিয়ে গেছে।'

'আর তার— ?'

'গত সোমবারের আগের সোমবার তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

আবার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

এমেলিয়ার কণ্ঠ শোনা যায়। রোজার খোঁজ পড়েছে। ক্রিসতফ আবার একা—

মৃত্যুর সেই রাতখানি, মরণের প্রস্তুতির দিনগুলি যেন বাস্তব হ'য়ে ফিরে আসে—ওরই অসহায় দৃষ্টির সামনে দিয়ে মৃত্যু এসেছে অভিসারে—। একটিমাত্র সপ্তাহ—মাস নয়, বছর নয়, দিন—সাতটি দিন—। বলো ঠাকুর, বলো! বলো! এরই মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সে। এই তো সেদিন—ঝম্ ঝম্ ক'রে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি পড়ছিল—বৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে হাসছিল ক্রিসতফ। কত বড় সুখ সেদিন এসেছিল হাতের কাছে!

পকেটে একখানি কাগজে জড়ান নরম ছোট একটা মোড়ক হাতে এসে ঠেকে। এক জোড়া রূপোর বক্‌লশ। সেবাইনের জুতোর জন্য এনেছিল। এই এতটুকু ছিল পা দুখানি। মনে পড়ে যায় শেষ সন্ধ্যাটি। মোজায়-ঢাকা ছোট পা দুখানি নিয়েছিল মুঠোয় ভরে। কি সুন্দর পা। কি উষ্ণ, কি সুকুমার স্পর্শ! কোথায় চলে গেল ? ঠাণ্ডা বরফের মত জমে আছে বোধহয় ! ক্ষণিকের ওই উষ্ণ স্পর্শটুকুই প্রিয়া-স্পর্শের একমাত্র পরিচয় হয়ে রইল। তাকে ও ছোঁয়নি সাহস ক'রে ; বাঁধেনি বাহু-বন্ধনে ; নেয়নি বক্ষের আলিঙ্গনে। শেষ হ'য়ে গেল। সব নিঃশেষ। চিরদিনের মত ফুরিয়ে গেল।

পরিচয় হ'ল না—না দেহের সাথে, না আত্মার সাথে।

কেমন ছিল দেহখানি ? কিছুই মনে করতে পারছে না...

দেহটার ভেতরে যে মানুষটা ছিল, সেই বা কেমন ছিল ?

কোনো পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়নি।

স্মৃতির পটে কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না—না ওর, না ওর ভালোবাসার।

ভালোবাসা ? ভালোবেসেছিল না কি সে ?

কেমন ক'রে জানলে ক্রিসতফ ? কোথায় প্রমাণ !

একখানি পত্র নয়, এতটুকু কোনও চিহ্ন নয়...

কিছু নেই, কিছু নেই।

কোথায় খুঁজবে ? কোথা থেকে আহরণ করে আনবে স্মৃতির কণিকা ! হারানো প্রিয়-স্মৃতিকে রাখবে অন্তরের নিভৃতে ; নয় বাইরেই রচনা করবে তার দেউল। কিন্তু হায়রে কপাল ! সামান্যতম অভিজ্ঞানও সে রেখে যায়নি। একেবারে নিরবশেষ সমাপ্তি। আছে শুধু ওর প্রেম—যে-প্রেম দিয়ে অর্ঘ্য রচনা করেছিল ক্রিসতফ...আর আছে ক্রিসতফ

নিজে—দেউলে দেবতা নেই, পূজারী নিষ্ফল অর্ঘ্য সামনে নিয়ে পূজা বেদী আগলায়।

সব প্রয়াস সত্ত্বেও ওর রাশ ছিঁড়তে চায়। ও মরিয়া হ'য়ে ওঠে: অমন নিঃশেষে মুছে যেতে দেবে না প্রিয়াকে। সর্বনাশের মুঠি থেকে ও ছিনিয়ে আনবে তাকে—মৃত্যুকে করবে অস্বীকার। যে-টুকু পেছনে ফেলে গেছে ওর দেহান্তরী প্রিয়া সে-টুকু বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে রইল অন্ধ গভীর বিশ্বাসে। ও জানে, ক্ষয় নাই প্রেমের—ক্ষয় নাই প্রেমের অমৃত নিষেকে অভিষিক্ত হয়েছে যা—

"আমার মৃত্যু হয় নাই; কেবল পুরাতন গৃহ ছাড়িয়া গৃহান্তরে আসিয়াছি আমি। কিন্তু আমি এখনও তোমার মধ্যে বাঁচিয়া আছি, কারণ তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত রহিয়াছ। প্রিয়ের আত্মা প্রেমিকের আত্মার সাথে মিশিয়া এক হইয়া যায়।"

এ তো ওর পুঁথির পড়া-কথা নয়, ক্রিসতফের মর্মের কথা। আত্মার বাণী। আমরা সবাই কালের ক্যালভেরী * চূড়ায় এক দিন না এক দিন আসি।

শাশ্বত কালের সেই বেদনাই নূতন ক'রে বুকের আগুন জ্বালায়, শাশ্বত কালের ব্যর্থতা আর মৃত্যুঞ্জয়ী আশা নূতন করে রক্তে জাগায় দোলা। শাশ্বত কালের বাঁধা পথেই আবার নূতন ক'রে আমাদের চলা—যারা আমাদের আগে এই পৃথিবীতে এসেছিল, বেঁচেছিল, ভালোবেসেছিল, মৃত্যুর সাথে লড়েছিল, মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে এই পৃথিবী হ'তে চ'লে গেছে—তাদের পদ-চিহ্নের পাশে পাশেই আমাদের পায়ের চিহ্ন পড়ে।

নিজের ঘরে বন্দী ক্রিসতফ। জানালা দিয়েছে সেঁটে, যাতে সামনের ঘরের জানালাটা না চোখে পড়ে। ফোগেলদের এড়িয়ে চলে—ওদের

* যে পাহাড়ের ওপর যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল তার নাম।

দেখলেই কেমন ওর হুঙ্কার আসে। যদিও এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে ওর কোন নালিশ নেই। মনে মনে যত বড় শত্রুই হোক না কেন, এক হিসেবে এত সাধু প্রকৃতির ও ধর্ম-ভীরু এরা, যে শত্রুতা দিয়ে মৃত্যুকে বিড়ম্বিত করেনি। এবং ক্রিসতফের ব্যথা ওরা বুঝেছে এবং সম্মান ক'রেছে। কিন্তু সেবাইন বেঁচে থাকতে এরা সুহৃদের ব্যবহার করেনি; এই কথাটা স্মরণ ক'রে তার অবর্তমানে এখন ও কিছুতে সদয় হ'তে পারলে না।

সাময়িক হ'লেও ক্রিসতফের জন্য ওদের সহানুভূতিটুকু খাঁটিই। কিন্তু বাড়ীর সেই অষ্ট-প্রহরের মেছো-হাটায় মন্দা পড়ল না, তাই মনে হ'ল ফাঁকি না থাকলেও এরা ফাঁপা; এত বড় শোকাবহ ঘটনা ওদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনি [খুবই স্বাভাবিক হয়ত এটা]। হয়তো বা গোপনে ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। অন্ততঃ ক্রিসতফের ধারণা তাই। ওর সম্বন্ধে ফোগেলদের অভিপ্রায়টা বুঝতে পারার পর এ ধারণাটা আরও পাকা হ'ল। আসলে বাড়াবাড়ি ওরই; ফোগেলরা ওকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। কিন্তু না ঘামালেও রোজার পথ নিষ্কণ্টক হ'ল ব'লে এবারে ওরা নিশ্চিন্ত হল নিশ্চয়ই! আক্রোশটা পড়ল গিয়ে রোজার ওপর। এবং ওর সম্বন্ধে এদের [ফোগেলরা লুইসা, রোজা পর্যন্ত] এই স্পর্ধিত অনধিকার চর্চার শাস্তিটা ওই নিরপরাধ মেয়েটাকেই মাথা পেতে নিতে হল। ক্রিসতফ একেবারে মমতা-হীন কঠিন হয়ে উঠল। ওর স্বাধীনতায় হাত দেবার এতবড় সাহস! ভাবতেই ও আগুন হয়ে ওঠে। ভাবে, এতদিন তবু ওর একার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু অনধিকারীরা ওর মৃতা প্রিয়ার অধিকারেও থাবা বসাতে চায়। এত বড় দুঃসাহস! কাল্পনিক আশংকায় সে-অধিকারকে রক্ষা করতে ও বুক দিয়ে পড়ে। ওর এখন সন্দেহ হয় রোজাও ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু জানেনা ও ওর

বেদনাকে নারবে সে-মেয়ে অন্তরে বহন করে। বারে বারে আসে, মিঠে ক'রে দু'টো সান্ত্বনার কথা ব'লে যায়; সেবাইন-এর সম্বন্ধে আলাপ করে। রোজাকে তাড়িয়ে দেয় না ক্রিসতফ; সেবাইনের কথা বলার লোক চাই—এমনি লোক, যে তাকে জানে। অসুখের সময়কার, মৃত্যুর সময়কার প্রতিটি খুঁটিনাটি জানবার জন্য ও আকুল হয়ে থাকে। কিন্তু তবু সদয় হয় না ওর মন; আরো বেশী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অভিসন্ধি না থাকলে, রোজা অমন ক'রে এতবার ক'রে ওর ঘরে আসে যায়, এতক্ষণ থাকে, গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কেন! অন্ততঃ এমেলিয়া তো কখনও বরদাস্ত ক'রত না। পরিবারের এই চক্রান্তের মধ্যে রোজাও কি নেই! নিশ্চয়ই আছে। কিছুতেই রোজার দরদকে ও নির্ভেজাল ব'লে বিশ্বাস করতে পারল না।

কিন্তু ক্রিসতফ জানেনা এ কত বড় মিথ্যা। জানেনা রোজার সমবেদনায় হৃদয়ের অমৃত উজাড় করে দেয়া। ক্রিসতফের চোখে চোখ মিলিয়ে ও সেবাইনকে দেখতে চায়, ভালোবাসতে চায় তাকে ক্রিসতফের হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে। ক্ষণিকের জন্যও যদি কখনও ওর বিরুদ্ধ-চিন্তা ক'রে থাকে সে জন্য আত্ম-ধিক্কারে আজ ওর অন্তর ক্ষত বিক্ষত; রাতের প্রার্থনায় লুটিয়ে প'ড়ে আকুল হৃদয়ে মৃতার কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু ভুলতে কি পারে ও নিজে মরে নাই, বেঁচে আছে; দিনের প্রতিটি মুহূর্ত ক্রিসতফ রয়েছে ওর দৃষ্টির সামনে একেবারে প্রত্যক্ষ হ'য়ে; দিনে দিনে পলে পলে সে প্রত্যক্ষ-দেবতার অভিষেক হচ্ছে ওর প্রেমে: পরোক্ষের মানুষটাকে আজ আর ওর ভয় নেই—সে তো ফুরিয়েই গেছে; তার স্মৃতিটিও দিনে দিনে ক্ষয়ে আসবে চন্দ্র-কলার মত, তা নিঃশেষ হবে একদিন। তারপর রোজাই তো থাকবে অদ্বিতীয়া হয়ে—তারপর—তারপর—হয়ত একদিন—! নিজের ব্যথা, পাশের বন্ধুর ব্যথা—যে ব্যথা ওর আরও আপন, তা সত্ত্বেও নাম-না-জানা একটা খুশির দোলানী যেন রক্তে লাগে। একটা

অবুঝ দুঃসাহসী আশা মাথা তুলতে চায়। আরো রাগ হয় নিজের 'পরে। কিন্তু কতক্ষণ বা সে আশা! ঝিলিক মাত্র। ক্রিসতফের চোখ এড়ায় না। যে-দৃষ্টি দিয়ে ও চায় তাতে রোজার বুকের রক্ত জমে যায়। কঠিন অক্ষরে ঘৃণা লেখা সে-দৃষ্টিতে—নির্ভুল স্পষ্টতায় রোজা পড়ে সে-লেখা, বোঝে, একজন যখন গেল, ওর বেঁচে থাকা ক্ষমাহীন অপরাধ।

সেবাইনের জিনিষ পত্র নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী নিয়ে এল তার ভাই। কোথায় গান শেখাতে গিয়েছিল ক্রিসতফ, ফিরে এসে দেখে দুয়ারের কাছে স্তূপীকৃত খাট, আলমারী, চেয়ার, গদী, কাপড়-চোপড়—চলে-যাওয়া সেবাইনের ইহ-সংসারে ফেলে-যাওয়া যত কিছু। প্রচণ্ড এক হাতুড়ীর ঘায়ে ওর পাঁজরের হাড়গুলো যেন চুরমার হ'য়ে গেল। ছুটে চলে গেল—দেখতে পারলেনা; যাবার সময় ধাক্কা খেল বারটোলডএর সাথে। থামালে সে। জোরে হাতটায় ঝাঁকুনি দিয়ে মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে :

'কি হ'য়ে গেল, বলতো ভাই! কটা দিনের কথাই বা—কেমন আনন্দে কাটল সবাই মিলে। কে ভেবেছিল বলতো, বিনা মেঘে এমনি বাজ পড়বে। ফূর্তি তো ক'রেছিলাম, সেই ফূর্তিই হ'ল ওর কাল। নৌকাতেই ঠাণ্ডা লাগল। আর তাইতে শেষ হ'য়ে গেল। উঃ। কিন্তু কেঁদে হবেই বা কি? আজ ও গেল, কাল আমি যাব। এই তো সংসার, আর এই তো জীবন। যাক্, তুমি কেমন আছ ভাই? ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা সব ভালোই আছি।'

বারটোলডের মুখ লাল, ঘাম ঝরছে দরদর ক'রে, তার সাথে মিশে আসছে মদের গন্ধ। এই লোকটা ওর বিগতা-প্রিয়ার সহোদর! সেই সূত্রে তার যাবতীয় স্মৃতির ওপর ওর পূর্ণ অধিকার, এই কথাটাই

ক্রিসতফের কাছে লাগল অসহ্য। ওর মুখে সেবাইনের নামোচ্চারণও ওর ভালো লাগল না ; মনে হল এ ওর স্পর্ধা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ক্রিসতফ। অথচ ওর এই হিম-কঠিন চেহারাটা ধরাই পড়লনা বারটোলড এর চোখে। হারানো বোনের কথা বলার মানুষ পেয়েছে, সেই খুশিতেই দৃষ্টি ওর ঝাপসা হয়েছে। নইলে দেখতে পেত ওকে দেখে আগুন জলে উঠেছে ওই পাথরের বুকে। গাঁয়ের বাড়ীর দুদিনের সেই আনন্দ-মেলার স্মৃতিটাকে বারটোলড হঠাৎ যেন টান মেরে মাটিতে আছড়ে ফেলল নিতান্ত অবহেলায় ; কথা বলতে বলতে অবলীলায় ও নির্বিকার ভাবে সামনে ছড়ান জিনিষগুলো পা দিয়ে দিয়ে ছড়ায়। ক্রিসতফের আত্মা একেবারে ভূমি-মূল অবধি যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। কান্না উত্তাল হ'য়ে উঠল। ঠেকাতে চাইল কিন্তু বাঁধ গেল ভেসে। পেছন ফিরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু বারটোলড ছিনে জোঁকের মত রইল আঁকড়ে। এগিয়ে চলল সেবাইনের অসুখের কথা বলতে বলতে। প্রতিটি বেদনা-দায়ক খুঁটি-নাটির সবিস্তার বর্ণনা—বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত সোল্লাস উৎসাহ। অনেকেরই, বিশেষ ক'রে সাধারণ মানুষের এইই রীতি। ক্রিসতফ আর সইতে পারলেনা, কিন্তু কঠিন ক'রে রাখলে নিজেকে, যেন চোখের জলের বাঁধ না ভাঙ্গে। হঠাৎ মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলে বসল :

'মাপ করবেন, আমায় যেতে হবে এখন।' স্বর এমনি কঠিন, যেন দুটো বরফের পাহাড় ঠোকাঠুকি লেগে খট ক'রে বেজে উঠল।

আর একটি কথা উচ্চারণ না ক'রে চলে গেল।

অত্যন্ত অশোভন ব্যবহার। ভারী বিশ্রী ঠেকল বারটোলডের। ও ভেবেছিল ক্রিসতফ ওর বোনকে ভালোবাসে। কিন্তু এই কুৎসিত

নির্বিকার ব্যবহার ওর যেন অমানুষিক মনে হল। সিদ্ধান্ত করল ক্রিসতফ হৃদয়-হীন।

ক্রিসতফ একেবারে পালিয়ে এল নিজের ঘরে। ওর বুকের ওপর যেন পাথরের বোঝা ; নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জিনিষ-পত্র সরানোর পালা একেবারে চুকবার আগে দরজা খুললেনা। পণ করেছিল তাকাবে না ঐ দিকে—কিন্তু অদৃশ্য আকর্ষণ ওকে টেনে নিয়ে গেল ; কোণায় দাঁড়িয়ে পরদার ফাঁকে দেখতে লাগল—বিদেহী প্রিয়ার ঐহিক জীবনের সহচরদের বিদায়ের শোভাযাত্রা···ধীরে ধীরে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল···একটা অব্যক্ত রোদন পাক খেয়ে খেয়ে উঠল ওর অন্তঃস্থল হতে। একটা প্রবল ক্রূর প্রভঞ্জন যেন ওকে উড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে এক মরুভূমির ধূ-ধূ-করা শূন্যতার মধ্যে। ও পাগল হয়ে উঠল। মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়তে চাইল ওই পথের ধূলোয়, বলতে চাইল চীৎকার ক'রে : ওগো, নিওনা নিওনা, নিয়ে যেওনা ; আমার ধন দিয়ে যাও আমায়! দানবীয় শক্তিতে ধরে রাখলে নিজেকে। নেবে তো, সব কেন ! অন্ততঃ একটু, সামান্য একটু কিছু চিহ্ন রেখে যাক। ইচ্ছে হল মিনতি ক'রে ভিক্ষে ক'রে আনে ওর ছোঁয়া-লাগা একটি কণা—অন্ততঃ, তবু তো একটু থাকবে, একেবারে নিঃশেষে হারাবে না। প্রত্যক্ষ গেলেও প্রতীকে সে থাকবে বেঁচে। কিন্তু চাইবে কেমন ক'রে? বারটোলড কি দাম দেবে তার? যার জানবার সেই যখন জানলেনা আসল খবরটা, তখন নাই বা জানলে আর কেউ! আর জানান তো নয়, শুধু হৃদয়কে নিরাবৃত করা। তারপর হয়ত বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদেই উঠবে।···না না, থাক···কিছু বলবে না,···একটি কথা নয়। কেবল অসহায় নির্বাক চেয়ে থাকবে··· ওই সব-হারানোর মিছিল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে নিঃশেষ হয়ে ওর দৃষ্টির অন্তরালে, ওর অধিকারকে অস্বীকার ক'রে···

সব শেষ হ'য়ে গেল। শূন্য গৃহখানি দীনের মত প'ড়ে রইল। গেট বন্ধ হ'ল। ঘর দুয়ার কাঁপিয়ে গাড়ীর চাকা ন'ড়ে উঠল। জানিয়ে দিলে এবার যাত্রা হ'ল শুরু। অপসৃয়মান গাড়ীর ঘর্ঘর ক্রমে অস্পষ্ট হ'য়ে এল।

তারপর নিথর নিস্তব্ধতা।

সেই স্তব্ধতার ভাষায় জানা গেল…সব শেষ, একেবারে শেষ…।

ও আছড়ে প'ড়ল মাটিতে। এক ফোঁটা জল নেই চোখে…এ যেন সাহারার বুক—অনুভূতি নেই, বেদনা নেই, যেন সাহারারই শূন্যতা। সংগ্রাম নেই, নেই প্রতিঘাত…এ যেন মৃতদেহ।

দরজায় মৃদু আঘাত পড়ে। নিশ্চল ক্রিসতফ। আবার। দরজায় খিল দিতে ভুলে গিয়েছিল। এল রোজা। ওকে মাটিতে লোটান দেখে প্রথমে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠল; তারপর ভয়ে থমকে গেল। রেগে উঠল ক্রিসতফ :

'কি, কি চাই? বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও বলছি। আমায় একা থাকতে দাও।'

রোজা যায় না। কুণ্ঠিত হ'য়ে, দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভারী দীন দেখায় ওকে। দ্বিধা-জড়িত স্বরে ডাকে : 'ক্রিসতফ……'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় ক্রিসতফ। দুর্বলতা দেখে ফেলেছে রোজা। লজ্জায় যেন মরে গেল ও। হাত দিয়ে গায়ের ধূলো ঝেড়ে পরুষ কণ্ঠে বলে :

'কি চাই এখানে?'

সংকোচে দ্বিধায় এতটুকু হ'য়ে যায় রোজা। বলে : 'রাগ ক'রো না ভাই! অপরাধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি এসেছিলাম…এই একটা জিনিষ নিয়ে…'

হাতের মুঠোয় কি রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে দেয়, বারটোলড্এর কাছে চেয়ে এনেছি…একটা চিহ্ন। ভাবলাম তোমার ভালো লাগবে…'

ছোট্ট একটা রূপোর পকেট আয়না। এটার দিকেই চেয়ে ব'সে থাকত ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

রূপ দেখত না, শুধু সময় কাটাত।

ক্রিসতফ হাত বাড়িয়ে আরশীখানা নিলে, সাথে সাথে গ্রহণ ক'রল আরশী-ধরা হাতখানাও।

'রোজা…রোজা…'

রোজার স্নেহে ও যেন গলে যায়। ওর প্রতি যে অন্যায় করেছে তা বুঝে লজ্জা পায়। উচ্ছ্বসিত আবেগে নতজানু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে ধরা হাতখানিতে চুমু খায়। বলে :

'ক্ষমা করো…ক্ষমা করো…'

প্রথমে কেমন হকচকিয়ে যায় রোজা। তারপর বুঝতে পারে, অস্পষ্ট স্পষ্ট হ'য়ে যায়। মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, সারা দেহ ওঠে কেঁপে, চোখে অশ্রু নামে। কিসের ক্ষমা চেয়েছে ক্রিততফ? সে তো রোজার বুঝতে বাকী নেই!

'ক্ষমা করো…অন্যায় যদি ক'রে থাকি, ক্ষমা করো…"ভালো যদি নাহি বাসি…ক্ষম মোর সেই অপরাধ…" এই তো! শুধুই কি 'নাহি বাসি?' বরঞ্চ বল, যদি না বাসিতে পারি কোনো কালে, তবে ক্ষম ক্ষম মোর অপরাধ…! এই তো বলতে চাও ক্রিসতফ!'

হাত টেনে নেয় না রোজা…ও জানে ক্রিসতফ যাকে চুম্বন ক'রেছে সে ও নয়। ক্রিসতফও বুঝছে সত্য ধরা প'ড়েছে। রোজার অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে বাজছে ক্রিসতফের হৃৎকম্পন। বেচারাকে ও কোনোমতে

এতটুকু ভালোবাসা দিতে পারছে না, কেবল দুঃখ দিয়ে মারছে আর মারছে; সেই লজ্জায়, রাগে, আর বিক্ষোভে যেন ও জর্জরিত হ'য়ে উঠছে —আর সেই যাতনা অশ্রু হ'য়ে গলে গলে ঝরছে অনাদৃতার হাত বেয়ে।

অনেকক্ষণ অমনি গেল। ঘরের অস্পষ্ট আলোয়—দুজনেই কেঁদে চলেছে।

তারপর হাত টেনে নেয় রোজা। ক্রিসতফের ঠোঁটের ফাঁকে গুন গুনানির মত বেরয় 'ক্ষমা করো!'

কোমলভাবে ওর হাতের ওপর হাত রাখে রোজা। উঠে দাঁড়ায় ক্রিসতফ। নীরবে চুম্বন করে—ওষ্ঠের ওপর অশ্রুর ক্লিষ্ট স্বাদ…। ক্রিসতফ বলে কোমলভাবে :

'আমাদের বন্ধুত্ব কখনও ভাঙ্গবে না, রোজা…কখনও না।' আস্তে মাথা নীচু ক'রে নীরব সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে আসে রোজা—গুরু ভারে ওর বেদনা আজ ভাষা হারা।

দুজনেই ভাবে বেতালা পৃথিবীটা কোন পাগলের অনাসৃষ্টি। যে ভালোবাসল সে ভালোবাসা পেল না; যে পেল সে ভালোবাসল না। আবার যে-প্রেমিক প্রেম পেয়ে ধন্য হ'ল, প্রিয়-বিচ্ছেদের হাহাকারে দু'দিন না যেতে তার ধন্য আকাশ কালো হ'য়ে উঠল।…কেবলি বেদনা …দিকে দিকে বেদনার আবাহন। দুঃখ-ভাগী মানুষ—কিন্তু সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগা হলেই যে সব চেয়ে বড় দুঃখভাগী হবে, তার কোন অর্থ নেই।

ঘর সহ্য হয়না। বাইরে শান্তি খুঁজে ফেরে। পর্দাহীন জানালা আর শূন্য ঘর তীরের ফলার মত মর্মে বেঁধে।

কিন্তু আরও বড় দুঃখ ওর কপালে লেখা ছিল। খালি ঘরে নূতন ভাড়াটে বসালে অয়লার। সেবাইনের ঘরে দেখা গেল নূতন মুখ। পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে নূতন।

আর থাকতে পারল না। সারাদিন কাটে বাইরে। রাতে সব অন্ধকার হ'য়ে গেলে, কিছু আর দেখা যায় না যখন তখন ঘরে ফেরে ক্রিসতফ। আবার শুরু হয় গ্রামে মাঠে পথে প্রান্তরে ভবঘুরের জীবন। কিসের দুর্বার টানে একদিন গিয়ে উঠল বারটোলডের খামারে। ভেতরে গেল না, সাহস হ'ল না। ঘুরে বেড়াল আশে পাশে। খুঁজে বের ক'রল একটা জায়গা—ছোট্ট পাহাড়। তার ওপর থেকে দেখা যায় বারটোলড্এর বাড়ী, খেত, আর নদীটি। তারপর থেকে, পা অজান্তে এখানে চ'লে আসে প্রায়ই। দৃষ্টি এগিয়ে চলে নদীর আঁকা বাঁকা পথ ধ'রে ধ'রে সেই উইলো কুঞ্জের নিবিড়ে।

ক্রিসতফ দেখেছিল সেদিন সেই রহস্য-ভরা আলো-আঁধারে কেমন করে ধীরে অতি চুপি চুপি মৃত্যুর ছায়া নেমে এসেছিল সেবাইনের মুখে। এখান থেকেই দেখা যায় বাতায়ন দুটি, অত দূর থেকেও চেনা যায় তাদের —এক মহা-পরিচয়ে অন্তরঙ্গ দুই-কক্ষের দু'খানি বাতায়ন—দুর্যোগ-ময়ী রাত্রির গভীরে এই কক্ষেরই তমোময়ী শূন্যতায় ওরা সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিল বড় কাছাকাছি—মাঝখানে ছিল একটিমাত্র রুদ্ধ দ্বারের ব্যবধান···। সেই রুদ্ধ-দ্বারের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাইরের ঝরের আবেগে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল দুজন···কি উদগ্র···উন্মত্ত প্রতীক্ষা···কত কাছে··· তবু কত দূরে···ক্ষুদ্র রুদ্ধ-দ্বারের বাধা···যেন অসীম···অনন্ত···

সমাধিস্থান দেখা যায়···হয়ত এখানেই···

বিকৃতি আর ক্ষয়ের জগৎ।

ছেলেবেলা থেকে সমাধিস্থানে যেতে ওর ভয় করে। গ'লে গ'লে খসে খসে পড়া, বিকৃতিময় এই ক্ষয়ের সাথে যুক্ত করে প্রিয়জনের কথা ও ভাবতে পারে না। কিন্তু এতদূর থেকে তত ভয়ানক দেখায় না।

নাতি-বৃহৎ সমাধি-ভূমিটি ; শান্ত-সমাহিত··ঘুমন্ত রোদের সাথে যেন ঘুমিয়ে আছে।

···ঘুম···ঘুম···ঘুমতে ভালোবাসত সে···ঘুমাও, তুমি ঘুমাও, কেউ ভাঙবে না তোমার ঘুম এখানে। ঘুমাও প্রিয়া, ঘুমাও। ঝুঁটি-ওয়ালা মোরগ ডেকে ওঠে মাঠের কোন পারে···আরেক পার থেকে আসছে তার সাড়া···গৃহস্থের বাড়ী হ'তে আসছে গম-ভাঙ্গা কলের ঘর্ঘর, শিশুর কলকাকলী, মুরগীদের কলগুঞ্জন। ঐ তো দেখা যাচ্ছে— সেবইনের মেয়েটিকে···ছুটোছুটি ক'রে খেলায় মেতেছে···ওর হাসিখানি ও চিনে নিতে পারছে অবলীলায়। খামারের যেদিকটায় রাস্তাটা নেমে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সেদিকের গেটের পাশে একদিন ও লুকিয়ে রইল— খেলতে খেলতে এদিকটায় এসে প'ড়ল খুকু—ও কোলে নিয়ে চুমো খেল একটি।

খুকু ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দিল। এর মধ্যেই ওকে ভুলে গিয়েছে খুকু! ও জিজ্ঞাসা করে :

'এখানে ভালো লাগছে তোমার ?'

'হুঁ, খু-উ-ব। ভারী মজা এখানে।'

'যাবে না ওখানে আর ?'

'উঁহু।'

ছেড়ে দিলে। ভোলা শিশুর এই ভোলার লীলায় ওর বুক ভেঙ্গে যায়।··· তবু—সেবাইনই তো ওই মেয়ে···তারই আত্মজা··· সেবাইনেরই দেহ-সম্ভবা। কত ছোট এখনও। চেহারায় মায়ের আদল নেই একটুও। কিন্তু ওই সত্তার গভীরেই ও মিশে ছিল ; তারপর সেই মিলিত সত্তা থেকে কেমন ক'রে একদিন ও বেরিয়ে এল শিশুরূপে —সেও রহস্য-ভরা···হয়তো বা আসার পথে মায়ের সবটুকুই ফেলে

এসেছে ; হয়তো বা ক্ষীণ একটু সৌগন্ধ লেগে আছে এখনও ; হয়তো বা তাও নেই। আর আছে কণ্ঠে সেই স্বরের একটুখানি মূর্চ্ছনা, সেই ওষ্ঠের কুঞ্চন ; ঘাড় বাঁকানোর সেই ভঙ্গিটি। আর কিছু নয়। একই সত্তা-সম্ভব, তবু এক নয়, একেবারে আলাদা। সেই মাও চ'লে গেল। একই সত্তা! হারানো-মা আর এই মেয়ে—এক সাথে মেশামিশি হয়েছিল, একেবারে এক হয়ে। আজ ভাবতেও ব্যথা লাগে ক্রিসতফের। মনটা বিরূপ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মাথা উঁচু ক'রে নিজেকে কেবলি চোখ রাঙ্গায়—না, না, না, বিরূপ হয়নি ওর মন।

বাইরে কোথাও নয়, একমাত্র ওর অন্তরেই তার আসন পাতা। সন্ধান মেলে এখানেই। ছায়ার মত সে সদাই আছে সাথে, উর্ধ্বে আছে আকাশ হ'য়ে। এই নিরন্তর-সঙ্গটিকে সত্য ক'রে পায় ও নিরালায় বিশেষ ক'রে সেই পাহাড়ের ওপরকার ওর নির্জন আশ্রয়ে, অবিশ্বাসী মানুষের দৃষ্টির বাইরে, যেখানে প্রকৃতির অবাধ-উন্মুক্তির মাঝে সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে সেই প্রিয়-স্মৃতিখানি। এই সঙ্গটুকু পাবার জন্য ও মাইলের পর মাইল ভেঙ্গে দৌড়ে আসে, উর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ের ওপর ওঠে দুরু দুরু বক্ষে—যেন সত্যিই চ'লেছে প্রিয়-অভিসারে। যে-মাটিতে শয়ন রচনা করেছে বিশেষ মানুষটি, তারই বুকে সর্বাঙ্গ দেয় লুটিয়ে। অদৃশ্য পদসঞ্চারে আসে সেই বিশেষ—দেখা যায়না তার মুখ, শোনা যায়না তার কণ্ঠ, প্রয়োজনও নাই—সে আসে—অন্তরের খোলা সিংহদ্বারের পথ আপনি নেয় চিনে, তার আসন পড়ে ওর আত্মার গভীরে সর্ব-সত্তা জুড়ে। একেবারে নিঃশেষে ও পায় আপন পূর্ণ-অধিকারে, আত্মীভূত ক'রে। পাওয়ার বিপুলতায় ও আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় ; আবেগোত্তাল স্বপ্নের তরঙ্গে তরঙ্গে ও ভেসে চলে। বিবশ-চিত্ত, চতুঃপার্শ্বের বস্তুময়ী পৃথিবী হ'য়ে আসে অবলুপ্ত···মহা-শূন্যতার বুকে

সর্ব-চেতনাকে ব্যপ্ত ক'রে জেগে থাকে শুধু প্রিয়-সান্নিধ্যের অনুভূতি।

একটি দিনের স্বল্পায়ু একটি ক্ষণ, আর তার ক্ষণিক স্বপ্ন-মিলন। পরের দিন থেকেই কত ব্যর্থ সাধনা, কত বিফল প্রতীক্ষা—কিন্তু স্বপ্ন কোনো মন্ত্রে আর উজ্জীবিত হ'লোনা—সেই মহা-মুহূর্তের মহা-স্বপ্ন। এর আগে সেবাইনের মূর্তি ছিলনা ওর ধ্যানের বস্তু; আজ সেই মুখ সেই তনু-দেহের প্রতিমাকে স্মরণের দীপে আলোকিত ক'রে তুলতে চায় বারে বারে। কিন্তু তনুকা অতনু হ'য়ে লুকিয়ে ফেরে। সুদূর-বিসারী ঘন-তমিস্রার মধ্যে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিদ্যুৎ স্ফুরনের মত হয়ত চকিতের উদ্ভাস। প্রদীপ্ত, উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ক্রিসতফ।

ভাবে, হায় সেবাইন! সবাই ভুলে গেল তোমায়। ভুলুক, ভুলুক! আমি আছি, আমি আছি। আমার প্রেমের কনক-দীপ তোমার দেউলে অক্ষয় হবে। ওগো দেবি, ওগো রাণী আমার, তুমি আমার শাশ্বত কালের—তুমি হারাওনি—হারাবেনা। এই তো তোমায় আমি পেয়েছি, আমার মর্মে, আমার আলিঙ্গনে। এই আলিঙ্গনে বাঁধা থাকবে তুমি অনন্তকাল!

কিন্তু সেবাইনের স্মৃতি তখন অস্তাচলের পথে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জলের মত নিঃশেষের দিকে। ফাঁকাকে তাই স্তুতির ফাঁকি দিয়ে আড়াল করার প্রয়োজন। অনুরাগে তাই বারে বারে অঙ্গীকারের সীল-মোহর পড়ে। প্রিয়ার ধ্যানে ডুবে থাকতে চায় ক্রিসতফ। চোখ বন্ধ করে বেশ আড়ম্বরে কাজটা শুরু হয়। আধ-ঘণ্টা গেল, এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল চোখ খুলে দেখা গেল—কোথায় বা কি, সব ফাঁকা ধূ ধূ শূন্যতা···চোখ বুজে অমনি বসেছিল অতক্ষণ। ওর চিন্তাগুলো যেন স্পঞ্জএর মত নরম আর শোষণ-ধর্মী। বাতাসের গর্জন; পাহাড়ের গায়ে

নৃত্যপর ছাগল-ছানার গলার ঘণ্টার মিষ্টি রিনি-ঝিনি ; যে তনু-দেহ-গাছটির তলায় ও শুয়ে, তার পাতায়-পাতায় হাওয়ার কানা-কানি—প্রকৃতির বুকের এমনি অজস্র ধ্বনি-প্রবাহকে তারা শোষণ ক'রে, আত্মীভূত করে। ক্রিসতফের ভয়ানক রাগ হয় কেন এ চিত্ত-বিলাস? কিন্তু পলাতক ছায়াটাকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চেয়েছিল জীবন-সর্বস্ব ক'রে—তারি পেছনে পাগল হ'য়ে ছুটে ছুটে সর্ব সত্তা ছেয়ে, ক্লান্তি এল ও থেমে গেল আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। অনুভূতি-বৈচিত্র্যের অনন্ত প্রবাহে ও ভেসে চলল।

তন্দ্রার জড়িমা ঝেড়ে ফেলে জেগে ওঠে ক্রিসতফ। পাতিপাতি করে আকাশ পাতাল খুঁজে বেড়ায়, কোথায় সেবাইন যে-মুকুরে একদিন তার ছায়া প'ড়েছিল—খোঁজে আজো বুঝি সেই ছবি সেখানেই বাঁধা আছে। নদীর ধারে জলের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে—এই জলেই তো একদিন হাতখানি ডুবিয়েছিল সে—সে-হাতের ছোঁয়া আজ কি একটুও বাকী নেই? মুকুরের বুকে আর জলের বুকে নিজেরই ছায়া পড়ে। অজস্র ঘুরে বেড়াবার উন্মাদনা, আর অজস্র নির্মল বায়ুর প্রসাদে ওর দেহের স্বাস্থ্যবান সতেজ রক্ত তরঙ্গায়িত। সেই তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে ওর চিত্তাকাশের দিক্‌-দিগন্ত গুঞ্জরিত। ওর আবেশ কাটে।

পুরাতনে ক্লান্তি জাগে।

চিত্ত হয় নূতনের অভিসারী।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে : 'সেবাইন···সেবাইন···'

সঙ্গীত রচনা করে উৎসর্গ করে সেবাইনের উদ্দেশ্যে।

সঙ্গীত, প্রেম, কোন মন্ত্রে সেবাইনের উজ্জীবন হবে, হবে অভিষেক! কোথায় সেই মন্ত্র? জীবনে প্রেম এসেছে, এসেছে দুঃখ—কিন্তু সেবাইন? কোথায় সেবাইন তার মধ্যে? বেদনা আর প্রেমের

অভিযাত্রা ভাবীকালের পথে, অতীতের পাঁকে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকা তার ধর্ম নয়। অভিযাত্রী যৌবনকে রুখবে কে? কতটুকু ক্ষমতা ক্রিসতফের? ওর প্রাণ-বন্যায় পাহাড়ী ঢল নামে। দুঃখ-শোক, বেদনা, ব্যর্থতা—অগ্নিগর্ভ-ক্রিসতফের প্রাণ-বহ্নিকে জালিয়ে তোলে সহস্র শিখায়। বেদনা-নিষিক্ত হৃদয়ের স্পন্দনে প্রাণ-বন্যার ঢেউ লাগে। উচ্ছ্বসিত হয়ে গান গায়—সে তো গান নয়, যেন পাগলা-ঝোরার নৃত্য-মাতাল ছন্দ। ওর যা কিছু, সত্তার প্রতিটি কোষ অবধি যেন প্রাণ-সঙ্গীতে নেচে আর মেতে উঠল; শোকেও লাগল উৎসবের রং। ক্রিসতফের ঋজু স্বভাব, তাতে ছলনা থাকবে কতক্ষণ! নিজের ওপর ও বিরূপ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু জীবন তার দুর্বার স্রোতে ওকে বিবশ ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হৃদয় তখনও শোকে আঁধার; কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে নেচে উঠল প্রাণের হিন্দোল; সত্তার অভ্যন্তরে অভ্যুদয় হ'ল নূতন মহা-শক্তি-পুঞ্জের। সেই শক্তির কাছে ও আপনাকে সমর্পণ করে দিলে; গা ঢেলে দিলে বেঁচে-থাকার বিচিত্র, অনুপম আনন্দ-রস-প্রবাহে—যে-প্রবাহের জন্ম শুধু বলিষ্ঠের বুকে—চরম-হারানোর বেদনায়, বক্ষ-ঝরা শোনিতে—দুঃখ, শোক, নিরাশা, মৃত্যুর রুদ্র আঘাতে আঘাতে পাঁজর-জ্বালানো আগুনে; আর ওই আগুনের নৃত্যপরা শিখার তালে তালে যার তরঙ্গ-ভঙ্গ।

ক্রিসতফ জানে, ওর আত্মার গভীরতম গভীরে—দুর্গম দুর্ভেদ্য গোপন দেউলে রয়েছে সেবাইনের ছায়াময়ী প্রতিমা। উদ্বেলিত এই প্রাণ-বন্যায় সে-দেউল ভেসে যাবেনা…যায় না কারো। প্রত্যেক মানুষেরই আত্মার অভ্যন্তরে রচিত রয়েছে বিগত প্রিয়ের সমাধি-শয্যা—যেখানে অনন্ত কাল পরম শান্তিতে ঘুমায় তারা। তারপর এক দিন আবরণ ধ্ব'সে পড়ে—সমাধি-শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে আসে মৃতের দল।

যে-প্রেমিকের প্রেম পেয়ে, যে-প্রিয়কে প্রেম দিয়ে তারা জীবনে ধন্য হ'য়েছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে ওদের বিবর্ণশীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠে জাগে স্নেহাতুর হাসি। তাকিয়ে দেখে মায়ের গর্ভে শিশুর মত ওই বক্ষের তলায় ঘুমন্ত তাদের স্মৃতি।

তি ন

ম্যাডা

গ্রীষ্মের গুমটের পর একেবারে সোনা-ঢালা শরৎ। বাগানে ফলের গাছে গাছে যেন মহোৎসব। লাল টুকটুকে আপেলগুলি দেখাচ্ছে বিলিয়ার্ড-বলের মত। বছর-শেষের উৎসবের সাজ লেগেছে গাছে গাছে,—কোনটা অগ্নিবরণ, কোনটা পাকা তরমুজের মত, কোনটা কমলা-লেবুর রং, কোনোটায় ভাজা জিনিষের উজ্জল বাদামী। বনে বনে আবছা আলোর নাচ···মাঠে মাঠে জাফ্রান ফুলের গোলাপী শিখা।

রবিবারের বিকেল। পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে দৌড়ে নামছিল ক্রিসতফ—গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে। সমস্ত বিকেল ওই সুরটি ওর বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করেছে। মুখ হয়েছে লাল, চুলগুলি এলোমেলো; দুই হাত প্রবল ভাবে দুলছে চলার সাথে সাথে; পাগলের মত ঘুরছে দুই লাল চোখ। মোড়ের মাথায় এসেই এক কাণ্ড। এক পাঁচিলের ওপর এক রূপসী মেয়ে। প্রাণপণ বলে প্লাম গাছের ডালটিকে টেনে নুইয়ে পাকা পাকা প্লাম ছিঁড়ছে আর মুঠো মুঠো ফেলছে মুখে পেটুকের মত। দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক হ'য়ে

গেল। মেয়য়টির মুখ-ভরা প্লাম, বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল ক্রিসতফের দিকে। তারপরে হেসে উঠল একেবারে আকাশ-মাতান হাসি। ক্রিসতফও হেসে উঠল। মেয়েটি দেখতে চমৎকার না হ'লেও সুন্দর—গোল মুখ রোদের ঝিক্‌মিকে-পাড়-দেওয়া মেঘের দলের মত একরাশ কোঁকড়া চুলে ঘেরা; নিটোল দুই গোলাপী গাল; বড় বড় নীল গভীর চোখ—ঈষৎ বড়, ওপর দিকে ওল্টান নাক, ফুলকুঁড়ির মত ছোট টুক্‌টুকে দুটি ঠোঁটের ঈষৎ ফাঁকে দাঁতের শুভ্র সূক্ষ্ম রেখা; ঈষৎ বেরিয়ে থাকা ক্ষুদ্র বলিষ্ঠ ছেদকটির একটু ঝিলিক; পূর্ণ-গঠিত নিটোল অবয়ব; আঁটসাট বলিষ্ঠ, বৃহৎ পরিপূর্ণ দেহ। ক্রিসতফ যেতে যেতে বলল:

'বাঃ চমৎকার! বেড়ে চালাচ্ছ!'

অমনি মেয়েটি উঠল চীৎকার ক'রে:

'শুনছেন, শুনছেন, যাবেন না, আমি নামতে পারছি না, একটু ধরুন না…'

ক্রিসতফ ফিরে জিজ্ঞাসা ক'রল: 'নামতে তো পারছ না, উঠলে কেমন ক'রে?'

'কেন? হাত আর পা দিয়ে! একদম সহজ…'

'তা তো হবেই…পাকা পাকা প্লামের টানটি তো সহজ নয়!'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু খাওয়া শেষ হ'লে যে আর সাহস থাকেনা! নামতে গেলে পা ঠক্ ঠক্ করে…'

ক্রিসতফ প্রাচীর-অধিষ্ঠাত্রী জীবন্ত দেবীটির দিকে তাকিযে বলল:

'কেন, বেশ তো জাঁকিয়ে ব'সে আছ! লক্ষ্মী মেয়েটি হ'য়ে শান্ত হ'য়ে থাক দিকিন। কাল সকালে আসব'খন। আসি এখন তাহ'লে।'

কিন্তু গেলনা, দাঁড়িয়েই রইল। মেয়েটির ভাবখানা যেন ভারী ভয়,

পেয়েছে। পিট্ পিট্ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে হাত জোড় করতে লাগল ক্রিসতফ ওকে ফেলে যেন না পালায়। দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। মেয়েটি টুসটুসে ফল-ভরা ডালটি দেখিয়ে বলল : খাবে ?'

অটোর সাথে দুঃসাহসিক অভিযানগুলোর ফলে ক্রিসতফের পরদ্রব্যে আত্ম-বুদ্ধির ঔদার্য এখনও ঘোচেনি। সুতরাং গাছটা পরকীয় হ'লেও স্বচ্ছন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। কথা শেষ না হতেই ওপর থেকে ফল পড়তে লাগল ওর গায়ে মাথায়। অতিথিকে পরিতৃপ্ত ক'রে, শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করল :

'এখন…?'

মেয়েটাকে পাঁচিলের ওপর বসিয়ে রেখে ভারী মজা লাগছিল। ওদিকে ওপক্ষ অস্থির হ'য়ে উঠেছে। অবশেষে করুণা হ'ল : 'আচ্ছা, এসো দেখি', ব'লে হাত বাড়িয়ে দিলে। ও নামবার জন্য পা বাড়িয়েই ব'লে উঠল :

'দাঁড়াও, কিছু সম্বল জোগাড় ক'রে নি।'

বেছে বেছে ভালো দেখে এক কোচর প্লাম পেড়ে নিয়ে উদ্ধার-কর্তাকে হুশিয়ার ক'রে দিলে :

'দেখো বাপু, আবার চেপ্টে দিওনা যেন সব।'

নিষিদ্ধ কাজ করার লোভ সর্বদাই দুর্বার। শ্রীমতী ঝুঁকে প'ড়ে ক্রিসতফের বাড়ান হাত লক্ষ্য ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্রিসতফ জোয়ান হ'লেও, বোঝাটি তো হাল্কা নয়। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ল ও। কোনো মতে টেনে নামাল শ্রীমতীকে। দুজনে লম্বায় সমান, সুতরাং দুটি মুখ এল একেবারে সামনা-সামনি। ক্রিসতফের প্লাম-রস-মধুর ওষ্ঠ-জোড়া সহজ ভাবে নেমে এল সঙ্গিনীর ওষ্ঠে। সহজ সারল্যেই প্রতিদান এল।

'কোনদিকে যাবে ?' ক্রিসতফ জিজ্ঞাসা করে।

'জানিনে বাপু।'

'একাই বেরিয়েছ ? সাথে নেই কেউ আর ?'

'থাকবেনা কেন! বন্ধুরা আছে। কিন্তু কোথায় যে গেল সব খুঁজে পাচ্ছিনে।' ব'লেই হঠাৎ 'তোমরা কোথায় ?' ব'লে তার-স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল।

কোনো সাড়া এল না। ও-ও আর বিশেষ ব্যস্ত না হ'য়ে ক্রিসতফের সঙ্গেই চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু চলাটা আপাততঃ হল নিরুদ্দেশ।

'আর তুমি ? তুমি যাচ্ছ কোন দিকে ?'

'আমিও জানিনে।' ক্রিসতফ জবাব দিল।

'বেশ ভালো হ'ল, চল এক সাথেই যাওয়া যাক।' জামার ভেতর থেকে প্লাম বের ক'রে খেতে খেতে চলল।

'এত খেওনা বাপু, অসুখ করবে।' ক্রিসতফ বলে।

'হুঁঃ অসুখ হবে না, কচু হবে। সারাদিন তো খাই, কই অসুখ!' জবাব আসে।

প্লামে ফাঁপা ব্লাউসের ফাঁক দিয়ে সাদা শেমিজটি দেখা যায়। মেয়েটি বলে: 'প্লামগুলি সব গরম হ'য়ে গেছে।'

'দেখি তো!'

হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে একটা ক্রিসতফকে দিল এবং নিজে ছেলে-মানুষের মত আরেকটা চুষতে চুষতে অপাঙ্গে ক্রিসতফের খাওয়া দেখতে লাগল। কে জানে আজের এই অভিযানের শেস কোথায় ঠেকবে গিয়ে। অন্ততঃ ক্রিসতফের জানা নেই। হয়তো জানে ওই মেয়ে।

এক ঝাঁক মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ আসে: 'কু...উ...উ...

কুউ···উ···।' '···কু-উ···উ···উ···' প্রত্যুত্তর যায় এ পক্ষ থেকে। ক্রিসতফকে বলে : 'ঐ যে ওরা সব। বেশ হ'লো, থাক বাবা, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।' মুখে বললে বটে কিন্তু বলতে পারলে না ওর মন। মনে হ'ল এ বেশটা না হ'লেই ছিল ভালো। কিন্তু মেয়েদের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। ভালোই হয়েছে। নইলে সংসারে সর্বনাশ হ'য়ে যেত।

স্বরগুলি যেন আরো অনেকটা কাছে এল। রাস্তার কাছে এসে পড়েছে প্রায়। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পাশের খাদটা পার হ'য়ে বেড়ার ওপর চ'ড়ে ব'সে চোখের পলকে মেয়ে গাছের আড়ালে উধাও। ক্রিসতফ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল। শ্রীমতী হাত নেড়ে আদেশের ভঙ্গিতে ওকে কাছে আসতে ইশারা ক'রল। ও ইঙ্গিত অনুসারে এগিয়ে গেল। দুজনে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিছুটা দূর গিয়ে 'কু···উ···উ···ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল ও। বলল : 'ওরা খুঁজবে আমাকে দেখো।'

ওর বন্ধুরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প'ড়ে শুনতে চেষ্টা করে কোনদিক থেকে আসছে শব্দটা। ওদের সাড়া ওঠে···কু···উ···উ···। কিন্তু সঙ্গিনী ধরা দিল না। সে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে কেবলি পালায়। ওরা ডাকে—ঠিক উল্টো দিক থেকে আসে কু···উ···উ···। যেন এক শব্দময়ী আলেয়ার লীলা। বন্ধুরা দেখলে পলাতকাকে খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে না খোঁজা। অতএব উচ্চ কণ্ঠে বিদায় ঘোষণা ক'রে গান গাইতে গাইতে চ'লে গেল।

ভয়ংকর রেগে গেল ও এই অবহেলায়। ও ওদের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু ভাবেনি সঙ্গিনীরা এমন সহজে ওকে ছেড়ে দেবে। ক্রিসতফের কেমন অপ্রস্তুত মনে হ'তে লাগল। কোথাকার এক অজানা মেয়ের সাথে এমনি ক'রে লুকুচুরী খেলায় রস পাচ্ছিলনা

ও ; না পাচ্ছিল উৎসাহ। এরকম একলা তরুণ বন্ধুর সঙ্গ উপভোগ করার চিন্তা মনে আসেনি দুজনের একজনেরও। বরঞ্চ আশা-ভঙ্গ হওয়ায় ক্রিসতফের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। দুটি কঠিন মুঠি আকাশে আস্ফালন ক'রে রাগে ও চীৎকার ক'রে উঠল :

'বড্ড বাড় বেড়েছে! ফেলে চ'লে যাওয়া হল।'

'তুমিই তো তাড়াতে চাইলে ওদের।' ক্রিসতফ বলল।

'মোট্টেই না—'

'নিশ্চয়! পালাল কে তবে দৌড়ে?'

'আমি পালিয়েছি তা ওদের কি! ওরা খুঁজবে না তাই ব'লে? যদি হারিয়ে যেতাম?'

সম্ভাবিত দুশ্চিন্তায় যেন ভারী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল।

'দাড়াও না দেখাচ্ছি ওদের মজাটা...' লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে আরম্ভ ক'রল।

যেতে যেতে মনে প'ড়ে গেল পাশের লোকটার কথা। তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। একটু আগে যে ক্ষুদে দানবটি মনের মধ্যে দাপাদাপি করছিল সেটি নেই। কিন্তু কি যেন মনে হ'ল, ও আনমনা হয়ে নিরুৎসুক দৃষ্টিতে ক্রিসতফের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ চেতনা হল, খিদে পেয়েছে। খাবার সময় হয়েছে এ কথা পেটই জানিয়ে দিল। অতএব সরাইখানায় গিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধুদের সাথে জোটা দরকার। ক্রিসতফের বাহুটি বগল-দাবা ক'রে তার ওপর নিজের সমস্ত দেহভার ছেড়ে দিয়ে ককাতে লাগল,—ওঃ ভীষণ ক্লান্ত, আর চলতে পারছে না—কিন্তু এদিকে যেই একটা ঢালু জায়গা এল ক্রিসতফকে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে ছুটল।

যেতে যেতে ওরা কথা বলতে লাগল। এতক্ষণে পরিচয় হল। ক্রিসতফ সঙ্গীতকার, শুনে ওর তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। ও নিজে কাইজারষ্ট্রাস-এ [সহরের মধ্যে সব চেয়ে ফ্যাশান-দুরস্ত পাড়া] এক পোষাকের দোকানে কাজ করে। নাম য়্যাডেলহিড্; বন্ধুমহলে নামটা সংক্ষিপ্ত হ'য়ে হয়েছে 'য়্যাডা'। আজের দলে আছে ওরই একজন সহকর্মিনী, আর দুটি যুবক। একজন একটা ব্যাংকের কেরাণী আর একজন একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। আজ রবিবার ছুটির দিন; একটু ফুর্তি ক'রতে বেরিয়েছে সবাই। ঠিক হয়েছিল কাছের সরাইখানায় ওরা খেয়ে নেবে। ওখান থেকে রাইন নদীর ভারী চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। নৌকো ক'রে বাড়ী ফিরবে তারপর সবাই।

য়্যাডা আর ক্রিসতফ সরাইখানায় পৌঁছে দেখল দলের আর সবাই পৌঁছে গুছিয়ে বসেছে। য়্যাডা এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধুদের ওপর, কেন তারা কাপুরুষের মত তাকে ফেলে পালিয়েছে। ভাগ্যে ক্রিসতফ ছিল, তাই রক্ষা। ওর কথায় কান দিলে না কেউ। ক্রিসতফকে ওরা চিনতে পারল। ব্যাংকের কেরাণীটা ওর যশ শুনেছে বিস্তর, আর তার বন্ধু ক্রিসতফের গানও শুনেছে [শোনা গানের কলি গুনগুনাতে আরম্ভ করে দিল তখনি]। সবাই মিলে যে রকম খাতির ক'রলে ক্রিসতফকে দেখে য়্যাডা মুগ্ধ হ'য়ে গেল। সঙ্গিনী মীরা [আসল নাম হাসি আর জোহান্না] মুগ্ধ হল আরো বেশী। মেয়েটি শ্যামলা, চোখ দুটি মিট মিট করে সর্বদাই, কপাল উঁচু, চুল পেছন দিকে টেনে বাঁধা, মুখ চীনা ধাঁচের; একটু বেশী চঞ্চল, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। মাথাটা অজাকৃতি এবং দেহের রংটি তৈল-মসৃণ পাকা সোনার হ'লেও লাবণ্যের অভাব নেই। পরিচয় হওয়া মাত্রই মীরা গদগদ হ'য়ে উঠল। কত বড় সম্মানিত অতিথি

ক্রিসতফ। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সবাই ওকে আহারের নিমন্ত্রণ করল।

এমন রাজ-সম্মান ক্রিসতফ আর কখনও পায়নি। ও যেন ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠল। দুই সখীর মধ্যে ওকে নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। দুজনেই ছলায়-কলায় প্রেম নিবেদন করতে আরম্ভ করল। মীরা ঘনিষ্ঠতা দেখাতে গিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে গোপনে ওর পায়ে পা ঘসে, আর গোপন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চায়। বাইরের আচরণটা পুরোদস্তুর আনুষ্ঠানিক। য়্যাডা কোনো ঢাকা-ঢাকির ধার ধারে না; একেবারে খোলাখুলি ভাবে তার দৃষ্টি হ'য়ে ওঠে মোহিনী, সুন্দর ওষ্ঠ দুটির ভঙ্গিতে আসে মায়া; আরও যত অস্ত্র ছিল ওর ভাণ্ডারে সব এক এক ক'রে প্রয়োগ করতে লাগল মরীয়া হ'য়ে। ওদের হাব-ভাব এমনি নগ্নভাবে স্থূল, ক্রিসতফের ভারী অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, রুচিতে বাধল। কিন্তু তবুও ওর কেবল গোমরা-মুখ-দেখা চোখ যেন নূতন স্বাদ পেল এই বেপরোয়া প্রগলভতায়। মীরাকে ওর বেশ লাগল। মনে হ'ল য়্যাডার চাইতেও যেন বেশী দীপ্তিমতী। কিন্তু ওর লাস্য-ভরা হাব-ভাব আর রহস্যময় হাসি অত্যন্ত কুৎসিত লাগলেও ওকে আকর্ষণ ক'রল। কিন্তু আমোদোচ্ছলা য়্যাডা যেন প্রদীপ্ত প্রাণ-শিখা। তার কাছে মীরা একেবারে স্তিমিত। সে কথা মীরা জানে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মুখ গোমরা করলে না। আপাততঃ পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়ে হাসি-মুখে স'রে এল। এবং ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করতে লাগল কবে ওর শুভক্ষণ আসবে। য়্যাডা দেখলে, এখন ও অদ্বিতীয়া; অতএব যে-সৌভাগ্য ওর হাতের কাছে আপনি এগিয়ে এসেছে, তাকে আর হাত বাড়িয়ে ধ'রতে চেষ্টা ক'রলে না। যেটুকু ও করেছে সে কেবল সখীর বুকে হিংসা জাগাবার জন্য।

উদ্দেশ্যটা যখন সফল হল, তৃপ্ত-চিত্তে ডানা গুটিয়েও নিজের জালেই বাঁধা পড়ল নিজে। ক্রিসতফের চোখের দিকে চেয়ে দেখল—ওরই হাতের জ্বালানো কামনার আগুনের লক্লকে শিখা ওই দৃষ্টিতে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল, ও-আগুনের ঝলক লেগেছে ওর বুকেও। স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এতক্ষণের ছল-করা ইতরামী বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেল। মৌন-দৃষ্টিতে পরস্পরের স্বাগত হল উচ্চারিত। কিছুক্ষণ আগের চুম্বনটি যেন নূতন ক'রে নূতন রসে ও অধরে অনুভব করল। মাঝে মাঝে অন্যদের হাসি-তামাসার কলোচ্ছ্বাসে ওরাও যোগ দিয়ে চলল সমান তালে।

কিছুক্ষণ পরে সব একেবারে স্তব্ধ—মাঝে মাঝে কেবল অপাঙ্গে চেয়ে দেখে। অবশেষে আর চাইতে সাহস হ'ল না, পাছে মনের ভাব ধরা পড়ে। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখতে লাগল মনের দিগ্বালে নূতন রং-এর খেলা। খাওয়ার পরে যাবার জন্য তৈরী হল সবাই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দেড় মাইল রাস্তা—তারপর ঘাট। য়্যাডা উঠল প্রথমে, তারপর উঠল ক্রিসতফ। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে রইল আর সকলের প্রতীক্ষায়—নীরবে, পাশাপাশি। ঘন কোয়াশার আবছায়া; সরাইখানার একটি মাত্র ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় সে আবছায়া ঘনতর। মীরা তখনও আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে গা এলিয়ে প্রসাধন করছে। য়্যাডা ক্রিসতফের হাত ধ'রে এগিয়ে গেল বাগানের দিকে। আলোর হাট নেই এখানে। একটি অলিন্দ থেকে নেমে এসেছে দ্রাক্ষা-লতার ঘন জাল। তারি আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। চারদিকে জমাট-বাঁধা এমনি অন্ধকার, যে এত কাছে থেকেও পরস্পরকে যেন দেখা যায় না। পাইন-শীর্ষে বাতাসের শিহরণ; ক্রিসতফের হাতের আঙ্গুলগুলিকে জড়িয়ে জড়িয়ে য়্যাডার কোমল

আঙ্গুলের উষ্ণ আসঙ্গ; আর ওর বুকে গোঁজা হেলিওট্রোপ ফুলটির মধুর সুবাস।

হঠাৎ য়্যাডা টেনে কাছে নিয়ে এল ক্রিসতফকে। ক্রিসতফের অধরে লাগল য়্যাডার শিশির-ভেজা চুলের স্নিগ্ধ স্পর্শ; চোখে, দুই ভ্রূতে, নাকে, গালে, ওষ্ঠের কোণে সন্ধানী পরশ বুলিয়ে বুলিয়ে য়্যাডা ক্রিসতফের অধরে বিলম্বিত চুম্বন এঁকে দিল।

সাথীরা চ'লে যায়। ওদের আহ্বান আসে 'য়্যাডা।' ওরা নড়ে না···নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না···অধরে অধর পিষ্ট; ওরা যেন এক-দেহ প্রতিমা।

মীরার গলা শোনা যায়: 'ওরা এগিয়ে গেছে।'

রাত্রির বুকে সাথীদের পদধ্বনি মিলিয়ে যায়। আলিঙ্গন নিবিড়তর হয়···গভীরতর স্তব্ধতা···ওষ্ঠের প্রান্তে অনুচ্চার আবেগের কম্পন···

দূরে গ্রামের ঘড়িতে প্রহর বাজে। বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওরা ছুটল খেয়া-ঘাটের দিকে: নির্বাক, বাহুতে বাহু, হাতে হাত···দৃঢ়, দ্রুত সমতালে পড়ছে পা···। রাস্তা নিথর শূন্য···জন-প্রাণী-হীন। এত অন্ধকার, সামান্য দূরেরও কিছু দেখা যায় না। পরিপূর্ণ অচঞ্চল প্রশান্তিতে, স্থির বিশ্বাসে, সৌম্য প্রিয় রাত্রির বুক বেয়ে ওরা চলে দৃঢ় অস্খলিত পদে। দেরী হ'য়ে গিয়েছে—একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে। কিছুদূর পর্যন্ত একটা আঙ্গুর-খেতের মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তাটা; তারপর উঠেছে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরের দিকে। কুহেলীর জালায়নের ভেতর দিয়ে শোনা যায় নদীর কলোচ্ছ্বাস আর অগ্রসরমান জাহাজের ভারী চাকার শব্দ। রাস্তা ছেড়ে খেতের মধ্য দিয়ে দৌড়ুতে লাগল এবার। এসে পৌছুল নদীর পারে। কিন্তু খেয়া-ঘাট তখনও বহু দূর। ওদের প্রশান্ত চিত্ত ত্রস্ত হ'লো না। য়্যাডার সন্ধ্যা-বেলাকার

শ্রান্তির লেশও আর নেই। বায়ুমণ্ডল কোয়াশায় পরিব্যাপ্ত। ভেজা ভেজা কোয়াশায় রাইন-এর বুক যেন চন্দ্রিকা-ছানা একখানি অপরূপ শুভ্রতা। দুজনেরই মনে হ'ল, এই মৌন তৃণ-বিস্তার, এই কুহেলী জালের মধ্য দিয়ে সারা রাত এমনি চলতে পারা যায় অবিরাম। ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠল; অদৃশ্য দানবটা দূর হ'তে দূরে মিলিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল য়্যাডা:

'যাকগে। পরেরটায় যাব।'

জলের ধারে ঢেউ-ভাঙ্গার কোমল ভীরু ছলছলানী। নামবার ঠিক মুখে কে একজন বললে যে-ষ্টীমারটা এই মাত্র গেল, ওটাই সে-দিনের শেষ ষ্টীমার। ক্রিসতফের বুক কেঁপে উঠল। য়্যাডার হাত ওর বাহুর ওপরে আরো চেপে বসল। বলল:

'গেছে যাকগে, কাল তো পাব জাহাজ।'

কয়েক গজ দূরে নদীর ধারে খুঁটিতে ঝোলান একটা ল্যাম্পের মিট-মিটে আলো দেখা যায় কোয়াশার মধ্য দিয়ে। আরো দূরে কতগুলি আলোকিত জানালা। বুঝতে পারল সরাইখানা কাছে।

ছোট্ট একটী বাগান সামনে। বালি ভেঙ্গে বাগানে এল; অন্ধকারে হাতড়ে সিঁড়ি খুঁজে যখন সরাইখানার ভেতরে এল ওরা, তখন আলো নিবছে। রাতের মত ঘর জোগাড় হ'ল একখানা। বাগানের ঠিক সামনেই ঘরখানা; দরজা খুললেই তার অবারিত অন্তরঙ্গতা। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ক্রিসতফ—বাইরের অনুপ্রভ জল-বিস্তারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাতিটার কাঁচের গায়ে বড় বড় ডানাওয়ালা মশার দল আছড়ে মরছে। দরজা বন্ধ। য়্যাডা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। ওর চোখে চোখে চাইবার সাহস হ'ল না ক্রিসতফের। য়্যাডার দৃষ্টিও অন্যদিকে, কিন্তু দীর্ঘ পক্ষজালের ফাঁক

দিয়ে ও দেখছে ক্রিসতফের প্রতিটী নড়া চড়া। প্রতি পদক্ষেপে মেজেতে মচ্ মচ্ শব্দ হয়। সারা বাড়ীটায় এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নীরবে ওরা বসল এসে বিছানায়—নীরব নিবিড় আলিঙ্গনে।

বাগানের ভীরু থরো থরো কম্পিত আলোটি নিবে গেছে···মৃত্যু হয়েছে তার···মৃত্যু হয়েছে সব কিছুর···।

রাত্রি·· রাত্রি···বিরাট অতল গহ্বর····· আলোক-হীন······চেতনা-হীন······। তারি মধ্যে অতন্দ্র জৈব-সত্তা······অতন্দ্র তার বিচিত্র-রূপ সর্বগ্রাসী ক্ষুধা······অতন্দ্র তার আনন্দ···সব-ভাসানো, পাগল-করা—যে আনন্দ শূন্যতা যেমন পাথরকে গ্রাস করে, তেমনি ক'রে তোমায় গ্রাস ক'রবে নিঃশেষে······বিদীর্ণ ক'রবে কঠিন আঘাতে······। অতন্দ্র তার সর্ব-চিন্তা-গ্রাসী নবোদ্ভিন্ন কামনার অঙ্কুর······আর রজনী-চারী জীব-লোকের বাধা-বন্ধ-হীন, নিয়ম-হীন, শাসন-হীন উদ্দাম লীলা-মধুর প্রমত্ততা···

······যেন একখানি রাত নয়, অসংখ্য রাত্রি ঘনীভূত ওই একখানি রাতে···একটি প্রহরে কত শতাব্দীর সঞ্চয়···কত মৃত্যুর ইতিহাস···প্রিয়-জনকে পাশে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখা···নিমীলিত চোখে কত কথা, কত হাসি, কত অশ্রুর স্মৃতি···। যুগ যুগ ধ'রে রাত্রির বিবিক্ত বাসরে কত কণ্ঠ প্রেমে বিহ্বল হয়েছে···কত নিদ্রার শূন্যতা প্রিয়-সান্নিধ্যে হয়েছে পুলকিত···

···মস্তিষ্কের মধ্যে দ্রুত-প্রবাহিত কত ছায়ার স্রোত···কত গর্জমান রজনীর মায়া···গৃহের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি উপশাখায় প্রবাহিত রাইন ···দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে তার জল পড়ছে উপচে—বালির ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি-পড়ার কোমল শব্দে···জলের আঘাতে আঘাতে

নৌকাটা যেন ককিয়ে উঠছে…নৌকা-বাঁধা মরচে-ধরা শিকলটা একবার ঢিলে পরক্ষণেই টান প'ড়ে ঝনঝনিয়ে উঠছে…নদীর বুক থেকে উঠছে তার উদাত্ত আহ্বান…ঘর ভ'রে গেল সে আহ্বানে…। ওদের বিছানা যেন নৌকা…ঘূর্ণি স্রোতে ভেসে চলেছে পাশাপাশি…উড়ন্ত পাখীর মত শূন্যে রয়েছে ঝুলে। আঁধার যেন আরো গভীর কালো হ'য়ে উঠল…শূন্যতা হ'ল শূন্যতর। য়্যাডার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল…সম্বিত হারাল ক্রিসতফ…রাত্রির দুর্বার কৃষ্ণ প্রবাহে যেন ওরা ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে…।

রাত্রি…মৃত্যু…কেন আবার জীবনে উত্তরণ ?

শিশির-লেপা শার্শির মধ্য দিয়ে দেখা দিল প্রভাতী আলো। ওদের আলস দেহে জীবনের স্ফুলিঙ্গ উঠল ঝলমল ক'রে। ক্রিসতফ জাগল। য়্যাডা স্থির দৃষ্টিতে ক্রিসতফের দিকে চেয়ে আছে। একটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে একটা গোটা জীবন, তার যত পাপ-পুণ্য, শান্তি-অশান্তি, ক্ষুদ্রতা মহিমার ইতিহাস…

আমি কি আছি ? আমি একা না দোসর ? আমি আছি এখনও বেঁচে ? কই, আমি যে আছি সে তো আর বুঝতে পারছিনে ! অসীম…আমি অসীম…আমার চতুঃপার্শ্বে লুটায় অসীম বিশ্ব। আমি এক পাথরের প্রতিমা আয়ত, প্রশান্ত, শান্তির পারাবার দুই চোখ ওই প্রতিমার…

আবার সুষুপ্তি। প্রভাতের অতি-চেনা শব্দগুলি, দূরের ঘণ্টার ধ্বনি…চলতি নৌকার দাঁড়ের ছপছপানী, রাস্তায় পথিকের পদধ্বনি সুখ-সুপ্তির মধ্যেই আদরের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়…জানিয়ে দিয়ে যায় ওরা বেঁচে আছে…সুখী চিত্তে লহর তোলে আনন্দের…

জানালার অদূরে দাঁড়িয়ে জাহাজটা সশব্দে ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে…

তন্দ্রা ছুটে যায় ক্রিসতফের। ওরা ঠিক করেছিল সাতটার জাহাজেই ফিরবে, যাতে আজের কাজ নষ্ট না হয়।

কানে কানে বলে ক্রিসতফ: 'শুনছ?'

চোখ খোলে না য়্যাডা; শুধু একটু হাসে। ক্রিসতফকে চুমু খেতে যায়; একটু উঠে সাথীর কাঁধেই মাথাটি এলিয়ে দিল…কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় জাহাজের চোঙটি আকাশের গায়ে যেন আঁকা… দেখা যায় শূন্য ডেক আর ধোঁয়ার জাল। আবার যেন স্বপ্নের আবেশে ডুবে যায়…

কোথা দিয়ে অজান্তে একটি ঘণ্টা চ'লে গেল। ঘড়ির শব্দে উঠল চমকে।

আস্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল: 'য়্যাডা!'

আবার ডাকে: 'য়্যাডা, শুনছ! আটটা বাজল যে!'

তবু চোখ খোলেনা য়্যাডার। কেবল ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁট ফোলায় আব্দারের ভঙ্গিতে:

'বাবাঃ ঘুমুতে দাও একটু—'

ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ক্রিসতফের দিকে পিছন ফিরে আবার ঘুময়।

ক্রিসতফ আবার স্বপ্নের প্রবাহে ভাসে। ওর শিরায় শিরায় রক্ত-ধারা বইছে—প্রশান্ত, বলিষ্ঠ। ওর স্বচ্ছ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ক্ষুদ্রতম অনুভূতিরও রেখা পড়ছে অতি সহজ অভ্যর্থনায়। যৌবনের তেজে ও যেন দীপ্ত হ'য়ে উঠল। পৌরুষের গর্বে বুকটা ফুলে উঠল অজান্তে। সুখের স্মিতে মুখে আলো জ্বলে উঠল। তবু বড় একা লাগে—এমনি একলাই তো ওর কাটে; আজ যেন আরো বেশী একলা…কিন্তু কই দুঃখের ভার তো নেই, ছায়া নেই—এ যেন স্বর্গের একলা আকাশ…

আত্মার ওই প্রশান্ত আকাশ এখন প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রেখায় আলিম্পিত হ'তে পারে। জানালার দিকে মুখ ক'রে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ও আকাশ দেখে; ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

'জীবন এত সুন্দর!'

বেঁচে থাকা…একটা নৌকা চ'লে গেল…হঠাৎ মনে হয় আজ যারা বেঁচে নাই তাদের কথা…এমনি আরেকখানি নৌকা ভেসেছিল… সেদিন 'এক-তরীতে ছিলেম তুমি আমি।' সে নৌকোও আজ নেই… কোথায় ভেসে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই প্রিয়া…সেই সামান্যা রমণী, প্রেমে অসামান্যা—মৃত্যু তাকে হরণ করেছে। আচ্ছা এ কে? এ কি সেই? এ কেমন ক'রে এল এখানে? কেমন ক'রে এল, ওরা দুজন? তাকাল ওর দিকে। কে এই মেয়ে? ক্রিসতফ ওকে চেনেনা, চেনেনি। কে এই নূতন পথিক? কাল তো ছিলনা ও ক্রিসতফের পথে! ক্রিসতফ, তোমার কাছে কি ওর পরিচয়? পরিচয়! সামান্যা মেয়ে—নয় চতুর, নয় ভালো, নিদ্রায় ফোলা নিষ্প্রাণ মুখখানা মোটেই স্বরূপ নয়, নীচু কপাল, শুকনো ঠোঁট জোড়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে মাছের মত হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। ক্রিসতফ ভালোবাসেনা ওই মেয়েকে। অথচ প্রথম নৈকট্যেই নিতান্ত অপরিচিত ওই অধরে ও চুম্বন করেছে—প্রথম রজনীতেই পরম ঘনিষ্ঠতায় গ্রহণ ক'রেছে ওই শোভন দেহকে, যার 'পর ওর কোন মমতা নেই। বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল বেদনায়। অথচ যে-নারী ওর প্রেমের অর্ঘ্য পেল সে রইল নিরঞ্জন হ'য়ে—ও কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল—দেখল জীবনে, দেখল মরণে। কেশের সৌগন্ধে অধরের স্পর্শটুকু অবধি বুলিয়ে দেয়নি—জানলো না কোনোদিন সেই বরণীয় সত্তার সুরভিখানি কেমন। আজ সব নিঃশেষ। মাটি ওর সর্বস্ব-ধনকে ওর বুক থেকে হরণ করে লুকিয়ে রেখেছে আপন

বক্ষে। আপন অধিকারের বিত্তকে না করল দাবী, না করল তার রক্ষণ।

ঝুঁকে পড়ল নিরপরাধ ঘুমন্ত মুখখানার 'পর ; বিরস পরুষ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল মুখখানা। নিদ্রিতার অনুভূতিতে ছায়া প'ড়ল। সন্ধানী দৃষ্টির সামনে বড় সংকুচিত হ'য়ে প'ড়ল য়্যাডা—প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ভারী চোখের পাতা টেনে খুলতে। 'তাকিয়োনা বাপু, অমন ক'রে। আমার চেহারাটা পরীর মত নয় আমি জানি।' গভীর ঘুম হ'তে জাগন্ত শিশুর মত তুতলে তুতলে বলে। আবার ঘুমে এলিয়ে পড়ে। হেসে বলে গুনগুনিয়ে :

'ওঃ বড্ড ঘুম পেয়েছে—' ব'লেই ঘুমে ঢ'লে পড়ল আবার।

হেসে ফেলল ক্রিসতফ। আরো কোমল ভাবে কচি ঠোঁট দুখানিতে চুমু খেল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত মুখখানার দিকে, তারপর উঠে দাঁড়াল অতি সন্তর্পণে। ভারী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলল য়্যাডা ও চ'লে গেলে। অতি সন্তর্পণে পোষাক পরল ক্রিসতফ যাতে য়্যাডা জেগে না যায়। [যদিও সে ভয়ের কারণ ছিলনা] তারপর চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল গিয়ে জানালার ধারে—তাকিয়ে রইল নদীর দিকে···বাষ্পায়িত নদী···দেখে মনে হয় ও জল নয়, তুহিন প্রবাহ। ওর মনে হ'ল যেন গেরুয়া বরণ এক তেপান্তরের মাঠে এসে পড়েছে--যেখানে আকাশ ভ'রে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে বিষণ্ণ এক মেঠো সুর।

মাঝে মাঝে চোখ খোলে য়্যাডা। ক্রিসতফের দিকে একটু তাকায়, একটু হাসে, তারপর এক সুপ্তি থেকে আর এক সুপ্তিতে যেন ছিটকে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে : 'কটা বেজেছে ?'

'পৌনে ন'টা।'

ঘুম জড়ান চোখে ভাবতে বসল : 'পৌনে ন'টা! এরই মধ্যে পৌনে ন'টা কি ক'রে হ'ল ?'

সাড়ে ন'টার সময় আড়া-মোড়া ভেঙ্গে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল :

'এবারে উঠব।'

উঠতে উঠতে হ'ল দশটা। ওর মেজাজ বিগড়ে গেল। 'আবার বাজছে! নিশ্চয় ঘড়িটা দৌড়ে চলছে!' ক্রিসতফ হাসল। বিছানায় ওর পাশে ব'সল এসে। দুহাতে ক্রিসতফের গলা জড়িয়ে কি স্বপ্ন দেখেছে তাই শোনাতে লাগল য়্যাডা। ক্রিসতফ আধা-আনমনা—মন দিয়ে শুনছে না। মাঝে মাঝে দুটো একটা ভালোবাসার কথা ব'লে য়্যাডার কথায় বাধা দিচ্ছে।

ধমক দিয়ে থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে যায় যেন খুব জরুরী কথা বলছে :

'বুঝলে, চলছে ডিনার। ও ছিল, গ্র্যাণ্ড ডিউক ছিলেন। একটা নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর···না না এই ইয়া একটা লোমওলা ভেড়া···কে জান? মীরা, মীরা। পরিবেশন করছিল মীরা! আর য়্যাডা, য়্যাডা কি ক'রছিল জান?······ স্রেফ শূন্যে, কখনও হাঁটছিল, কখনও নাচছিল, লম্বা হ'য়ে শুয়ে ছিল কখনও···কি ক'রে কার কাছে শিখেছিল···! আহা, কি করে? ওঃ, ভারী মুস্কিল কিনা! কিস্সুনা, কিস্সুনা···এই দেখো, এমনি······বুঝলে! তারপর এমনি···বাস্··· আর কি······!'

ক্রিসতফ হেসে ওঠে। য়্যাডাও হাসল বটে কিন্তু ওর হাসিতে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল :

'ছাই বুঝেছ তুমি···!'

বিছানায় ব'সে একই প্লেটে, একই পেয়ালায়. একই চামচে ওরা প্রাতরাশ খেল।

তার পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল বিছানা থেকে, আবার বসে পড়ল। আর দেরী করা চলে না; হাতের ইশারায় ক্রিসতফকে বাইরে যেতে বলল। কিন্তু ক্রিসতফ গড়িমসি করে। তাই নিজে উঠে একেবারে গলা-ধাক্কা দিয়ে ওকে বের ক'রে দরজা দিলে বন্ধ করে।

তারপর আরো খানিকক্ষণ আবেশে গা এলিয়ে গড়িয়ে, দাঁড়াল উঠে। প্রতিটি সুকুমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মুগ্ধ-চোখে নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে দেখল। হাত মুখ ধুতে ধুতে গাইতে লাগল ভালোবাসার গান; ক্রিসতফ জানালায় ব'সে তাল দিচ্ছিল, দিলে তার গায় জল ছিটিয়ে। যাবার সময় শেষ গোলাপটি তুলে নিয়ে গিয়ে ব'সল জাহাজে। কোয়াশা কাটেনি তখনও। সূর্যের আলোর উৎসব লেগে গেছে দিকে দিকে। তুলতুলে নরম গোলাপী আলোর সাগর যেন···কোয়াশার দল ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে। ক্রিসতফকে নিয়ে সামনের দিকে গিয়ে ব'সল য়্যাডা। ওর চোখে তখনও ঘুমের ঘোর, তাই মেজাজটি ছিল গুমরে। চোখে আলো লাগায় বিরক্ত হয়ে বক্ বক্ করতে লাগল: 'রোদ লাগল···আর কি? সারাদিন মাথাটি ধ'রে থাকবে।' ক্রিসতফ তেমন আমল দিল না। য়্যাডা গুম হয়ে বসে রইল। সদ্য-ঘুম-ভাঙ্গা শিশুর গাম্ভীর্য-মাখা চোখ দুটিকে রাখলে বন্ধ ক'রে।

পরের ঘাটে উঠলেন এক মহিলা। ইয়া জাঁদরেল চেহারা। বসল এদের কাছে ঘেসে। সাথে সাথেই য়্যাডা ঝলমল টগবগ ক'রে উঠল। ক্রিসতফের সাথে উচ্ছ্বসিত হয়ে আলাপ জুড়ে দিল বড় বড় বিষয়ে। আবার আগের মত কেতা-দুরস্ত 'আপনি' শুরু ক'রে দিলে এবার। ক্রিসতফ ভাবছিল আজ য়্যাডা দেরীর জন্য তার মালিকের

কাছে গিয়ে বলবে কি। কিন্তু যার মাথা, তার ব্যথা ছিল না ঃ

'বারে, আর যেন কোন দিন দেরী হয়নি।'

'মানে?'

'মানে আর কি, ও তো সাত সতের বার হচ্ছে।' ক্রিসতফের প্রশ্নে একটু যেন দমে গেল। দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করার সাহস হ'লো না ক্রিসতফের।

'কি বলবে গিয়ে?'

'বলব মায়ের অসুখ ছিল…নয়ত বলে দেব মা মরে গেছেন…তৈরী করে নেব কিছু একটা। তখন কি মুখে আসবে তা এখন থেকে কি করে বলব।'

এই খেলো ধরণ ক্রিসতফকে আঘাত দেয়।

'কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বল, এ আমি চাইনে।'

রেগে উঠল য়্যাডা :

'প্রথম কথা, আমি মিথ্যে কথা বলিনে। কিন্তু তাই বলে আজের কথাটা মালিককে বলব কি ক'রে…'

'কেন বলা যায় না, শুনি!' ক্রিসতফ বলে, কতকটা হাল্কা সুরে, আর কতকটা সত্যি কৌতূহলে।

য়্যাডা হাসল। মুখভঙ্গি ক'রে বলল : 'ভারী অভদ্র তো আপনি। আপনাকে তো বলেছি, তুমি টুমি ব'লে গায়ে পড়া আমার ভালো লাগে না।'

'সে অধিকার কি আমার নেই!'

'নিশ্চয়ই নয়!'

'কাল রাতের পরেও নয়!'

'কাল রাত! ওঃ, ভারী তো মহাভারত হয়েছে কাল রাতে!'

ক্রিসতফের দিকে তাকিয়ে হাসল য়্যাডা জেদী ছেলের গোঁ-ধরা ভঙ্গিতে। ও নেহাৎ হাল্কা সুরে কথাগুলো বলেছে বটে, কিন্তু ক্রিসতফের মন ভয়ংকর মোচড় দিয়ে উঠল···এখন ঠাট্টা করছে বটে, কিন্তু সত্যি ক'রে কথাটা বলতে বুঝি ওর একটুও বাজবে না। ততক্ষণে ভারী একটা মজার কথা টগবগিয়ে উঠছে য়্যাডার মনে—খিল খিল করে হেসে উঠে ক্রিসতফের ওপর গড়িয়ে প'ড়ে ওকে চুমু খেল সশব্দে—চারপাশে যে লোকজন আছে তাতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। অবিশ্যি অবাক হলো না কেউ।

এখন থেকে ক্রিসতফ ঘুরে বেড়ায় দোকানী-মেয়ে আর কেরাণী-মেয়েদের দল নিয়ে। ওদের রুচির স্থূলতা ওকে পীড়া দেয়; ও এড়াতে চায়। কিন্তু য়্যাডার প্রকৃতি আলাদা। আজকাল বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে আর তার ভালো লাগে না। বৃষ্টি অথবা অন্য কোনো কারণে শহরের বাইরে যাওয়া সম্ভব না হ'লে ক্রিসতফ য়্যাডাকে নিয়ে থিয়েটরে, যাদুঘর বা এমনি কোন জায়গায় যায়। ওর ভারী ইচ্ছে করে ক্রিসতফের সাথে ওকে সবাই দেখুক। এমন কি গির্জায় যাবার সময়ও ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এইখানে ক্রিসতফ একেবারে খাঁটি সোনা। ওর বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস হারানোর ফলে ও গির্জায় যাবার সনদ হারিয়েছে। [তাই একটা অজুহাত দেখিয়ে ওখানকার কাজও ও ছেড়ে দিয়েছে] কিন্তু বিশ্বাস হারালেও ওর ধর্মবুদ্ধি হারায়নি। ওটা ওরই অজান্তে ওর রক্তে জন্ম-নিয়েছে। তাই য়্যাডার ইঙ্গিত ওর কাছে অত্যন্ত কলুষিত, পঙ্কিল ব'লে মনে হয়।

সন্ধ্যেটা কাটে য়্যাডার আস্তানায়। মীরাও থাকে—কারণ একই

বাড়ীর বাসিন্দা দুজন। ক্রিসতফের ওপরে মীরার রাগ নেই। এলেই পরম সমাদরে কোমল হাতখানি বাড়িয়ে দেয়। তারপর গুটি কয় আজে বাজে কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বুদ্ধি ক'রে। মীরার কাছে য়্যাডা অবারিত, নিঃসঙ্কোচ। য়্যাডা প্রাণ ঢেলে বলে, মীরা প্রাণ দিয়ে শোনে। দুজনে সমান খুশি। বন্ধুত্বটা ওদের এমনি ঘনিষ্ঠ পর্যায়ে। আশ্চর্য! যখন ওদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা ছিল, আসলে তখন থেকেই ওরা দাঁড়াল এসে আরো কাছাকাছি।

ওরা দুজন সঙ্গে থাকলে ক্রিসতফের কেমন অস্বস্তি লাগে। ওদের ঘনিষ্ঠতা, বিচিত্র কথাবার্তা, বে-আব্রু চাল-চলন, বিশেষ ক'রে মীরার ভাঁড়ামো [অবশ্যি ওর সামনে মীরা বিশেষ কিছু বলে না ; কিন্তু মীরা চলে গেলে য়্যাডা আবার সবিস্তারে বর্ণনা করতে বসে সব] ; ওদের অশোভন কৌতূহল—বিশেষ ক'রে যত বস্তা-পচা কুৎসিত ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপারে নূতন অভিজ্ঞতা ওর, অতএব কিছুটা কৌতূহল থাকলেও, এই নোংরা আবহাওয়ায় ক্রিসতফ হাঁপিয়ে ওঠে। ওদের রহস্য-জনক ইশারার কথা ও কিছু বুঝতে পারে না।

দুই বন্ধুতে এক সাথে হলেই চলে কেবল সাজ পোষাকের আলোচনা, আর ইতরামো। হেসে লুটিয়ে পড়ে কথা বলতে বলতে। চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে। মীরা চলে গেলে ক্রিসতফ আরাম পায়, নইলে ওর মনে হয় অচিন দেশে এসেছে, যে দেশের ভাষা ও বোঝে না, আর ওর ভাষাও কেউ বুঝতে পারে না। ওর কথা ওরা শোনেও না, বরঞ্চ আনাড়ী ব'লে ঠাট্টা করে।

কিন্তু একা থাকলে য়্যাডা ক্রিসতফ মুখর হয়—হয়তো ওদের ভাষা ভিন্ন, কিন্তু পরস্পরকে বুঝে নেবার চেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিক। অথচ যতই বুঝতে যায়, না-বোঝাটা ততই বড় হ'য়ে ওঠে। এই মেয়েই ওর জীবনে

প্রথম নারী। সেবাইনও নারী হ'য়েই ওর জীবনে এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকুই আর ও জেনেছে! স্বপ্নের মায়া হয়েই সে রইল। যে-কাল বৃথা গেছে, তার ক্ষতিপূরণের ভার এখন য়্যাডার হাতে। আর নারীর রহস্য ভেদ করার কাজ রইল ওর—আসলে এ তো রহস্য নয়, যারা অর্থ খোঁজে, তাদের কাছেই নারী রহস্যময়ী।

য়্যাডা আর যাই হোক খুব বুদ্ধিমতী নয়। তার জন্য ওর আফশোষ তো নেই বরঞ্চ উল্টো-পাণ্ডিত্যের, উগ্ররকম অভিমান রয়েছে। সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে জোরের সাথে···সঙ্গীত সম্বন্ধেও ওর কথা বলতে ভয় নেই—এমন কি ক্রিসতফের সঙ্গেও তর্ক ক'রতে বসে, এবং রায় দেয় এমনি নিশ্চয়তায়, যেন তা অভ্রান্ত সত্য। সব বিষয়ে ওর অহংকার, আর একটুতেই ছোঁয়া লাগে। ও চলে চালের ওপরে; কারু কথায় নোয়ায় না, কিছু বোঝে না, বুঝতে পারে না। ক্রিসতফ অবাক হয়। য়্যাডা যে বোঝে না, তা ও মানে না কেন? ও যখন গুমর ছেড়ে, ভান ছেড়ে, ভালোয় মন্দয় মেশান ঠিক খাঁটি য়্যাডাটি হ'য়ে ওঠে, তখন ওকে ওর বেশী ভালো লাগে।

আসলে য়্যাডার ভাববার ক্ষমতা নেই। খেয়ে-দেয়ে, নেচে-গেয়ে, হেসে-খেলে, ঘুমিয়েই ও খুশি। ও সুখী হ'তে চায়, এবং হ'তে পারলে ভালোই হত। সুখী হবার মত গুণ ওর নেই তা নয়—কিন্তু ওর লোভ প্রচণ্ড। জৈব-ক্ষুধাটা বিশ্রী রকম উগ্র, স্বভাব অলস, এবং এমনি বে-আব্রুভাবে আত্মকেন্দ্রিক যে ক্রিসতফের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে চায়··· আবার কৌতুকও হয়। আসলে ওর স্বভাব-ধর্মে এমন কিছুরই অভাব ছিল না, যাতে জীবন অপরের পক্ষে না হলেও [সুখী মানুষের মুখ—তা যদি আবার সুদর্শন হয়, দেখলে সকলের প্রাণে সুখ হয়] নিজের পক্ষে উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। পরিতৃপ্তি পাবার মত উপাদান ওর জীবনে

ছিল বিস্তর, কিন্তু পরিতৃপ্ত হবার বুদ্ধি ছিল না। মজবুত বলিষ্ঠ কাঠামোয় স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল চেহারা, তাজা সরস মন, উচ্ছ্বসিত জীবনের প্রাচুর্য,—বলিষ্ঠ ক্ষুধা—কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ভারী উদ্বেগ। চার-জনের খাবার এক সাথে খেয়েও শারীরিক দৌর্বল্য নিয়ে ওর ভারী খেদ ; সর্বদাই খুঁৎ খুঁৎ করে, চলতে কষ্ট হয়, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা-ধরা, দাঁত-ব্যথা, চোখ ব্যথা, পেট ব্যথা—আসলে ব্যথা ওর মনে। সব কিছুতেই ওর ভয় আর উগ্র সংস্কার ; খাবার সময় টেবিলে কাঁটা-চামচ আড়াআড়ি রাখায়, অতিথিদের সংখ্যার কোন বিশেষ অংকে, নুনের পাত্রটা উল্টে যদি নুন প'ড়ে গেল—সব কিছুতে অমঙ্গলের চেহারা দেখে। এবং তার পর লম্বা স্বস্ত্যয়নের পালা। বাইরে বেরুলে কাক গুণবে এবং তারা কোন পাশ দিয়ে উড়ে গেল তার হিসেব ক'রে পা ফেলবে। চলতে গিয়ে চোখ থাকে রাস্তার ওপর—যদি সকালবেলায় মাকড়সা সামনে পড়লে চীৎকার ক'রে উঠে বাড়ীর দিকে ছুটবে। তখন তাকে বোঝাও যে সকাল নয়, বেলা বারোটা বেজে গেছে, এবং বারোটার পর মাকড়সা পড়া খারাপ তো নয়ই বরঞ্চ শুভ-লক্ষণ, তবে সে ফিরবে। স্বপ্ন দেখে ওর ভারী ভয়! এবং যত স্বপ্ন দেখুক—সবিস্তারে ক্রিসতফের কাছে বর্ণনা করবে, একটি শব্দও বাদ যাবে না। এক এক সময় ছোট এতটুকু একটা ব্যাপার মনে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। তা ছাড়াও, কে মরল, কার অসামাজিক বিয়ে হল, দরজির মজুরী, এমনি আজে বাজে, নোংরা জিনিষ ক্রিসতফকে ধৈর্য ধরে শুনতে হয়, পরামর্শ দিতে হয়। কোন কোন দিন হয়ত সারাটা দিনই য়্যাডার এ সব নিয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে থাকবে। তখন ওর জীবন মনে হবে যাচ্ছে-তাই, মানুষগুলোকে মনে হবে যাচ্ছে-তাই, আর তার জের এসে পড়বে বেচারা ক্রিসতফের ওপর।

কিন্তু গুমট কেটে রোদ ওঠেও মুহূর্তে। হঠাৎ খুশিতে উঠল ছল-ছলিয়ে ,চলন বলন আবার তেমনি টগবগ করতে লাগল। অকারণে হাসতে হাসতে পড়ল লুটিয়ে, কিছুতে থামতে চায় না হাসি ; ছুটল মাঠের মধ্যে, ছেলে মানুষের মত ময়লা কাদা ঘেঁটে, পোকা-মাকড় জন্তু-জানোয়ার খুঁচিয়ে মেরে সে এক তাণ্ডব শুরু ক'রে দিল···বেড়ালের মুখের সামনে নিয়ে এল পাখী, মুরগীর সামনে পোকা, ডেঁয়ে পিঁপড়েকে এনে দিল মাকড়সা···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল হিংসার বীভৎসতা। উদ্দেশ্যটা হিংসামূলক নয়। নিছক কৌতূহল ও কৌতুক। অথবা ওটা ওর স্বভাবেরই চণ্ডতা সম্পূর্ণ নির্জ্ঞানের গোপনে আড়াল-করা। অথবা সময় কাটাবার এর থেকে ভালো অবলম্বনের অভাব। বোকার মত কথা আর বাজে কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারংবার বলায় ওর পরমোৎসাহ। ক্রিসতফের ধৈর্য চ্যুতি ঘটে—স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। যে কেউ হোক সামনে এলে ওর লাস্য-লীলার উৎসাহটা বাড়ে··· কল-কলিয়ে কথা কয়ে, উচ্চগ্রামে হেসে, মুখ বাজিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস উৎকট রকম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রিসতফ ভয় পায় কি কথা শুরু ক'রে বসে মেয়ে। আর সত্যি, য়্যাডা করেও তাই। কথা কইতে গিয়ে ওর ঢলানো ভাব প্রায় অশ্লীলতার মত। ক্রিসতফের ইচ্ছে হয় তখন ওকে চাবকাতে। ওর ভেতরের মিথ্যেটাকে ও কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। ধী আর রূপ যেমন সব মানুষের নেই, তেমনি ইচ্ছে করলেই সত্য মেলে না সকলের মধ্যে, এ ক্রিসতফ আজও বোঝে না। মিথ্যা ওর অসহ্য, আর য়্যাডার কাছে ও যা পায়, তার ষোল আনা মিথ্যে। বিপরীত প্রমাণের মুখে দাঁড়িয়ে অতি অবলীলায় নির্বিকার ভাবে ও মিথ্যে কথা বলে। যে-সব মেয়েরা কেবল বর্তমান নিয়েই বেঁচে থাকে, তাদের মত প্রিয়

অপ্রিয় সব কিছুকে সুবিধে মত ভুলবার ক্ষমতা ওর অসাধারণ।

কিন্তু তবু পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ওদের হৃদয়-ঢালা। য়্যাডার আন্তরিকতা ক্রিসতফের চাইতে কম নয়। ওদের আকর্ষণটা ভাব-সাধর্ম্যের আমন্ত্রণে না হলেও, প্রেম ছিল খাঁটি। এবং শুধুই নীচ-প্রবৃত্তির ছট্‌ফটানী ছিল না।

এ প্রেম যৌবনের অপরূপ প্রেম। দেহ-ধর্মী হ'লেও স্থূল নয়। তরুণ বুকের শিশু-প্রেম—অরুণ আলোর মত সহজ, শুচি,—সঙ্গ-সুখ লাভের আকুল-লীলায় পরিশুদ্ধ, সুন্দর। ক্রিসতফের মত য়্যাডা অত সরল না হলেও, ওর ভারী একটি সুবিধা ছিল। এবং এ সুবিধাটি ঈশ্বর-দত্ত। ওর দেহ মন ছিল একেবারে তাজা সবুজ; অনুভূতিগুলি স্রোতস্বিনী ঝর্ণার মত স্বচ্ছ, স্পষ্ট; বুঝি কোনো মালিন্যের স্পর্শ আজও লাগেনি। এ মেয়েরা বিধির বিধানে অনন্ত-যৌবনা। য়্যাডা নিতান্ত সাধারণ স্তরের মেয়ে; আত্মকেন্দ্রিক, দৈনন্দিন জীবনে নির্ভরের অযোগ্য। কিন্তু প্রেম ওকে একেবারে বদলে দিলে। ওর মধ্যেকার ফাঁক ফাঁকি বেবাক উড়ে গেল। নিরেট ভালো মেয়ে হ'য়ে উঠল ও। ভালোবেসে ও বুঝেছে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার সুখ। ক্রিসতফের বুক আনন্দে উথলে ওঠে; ও বুঝি এ মেয়ের জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রেমিকের কাছে প্রেম যে কত মধুর ছলনা নিয়ে আসে, তার হিসেব কে রাখে! শিল্পী ক্রিসতফের চোখের রং-এ প্রেমিক ক্রিসতফের হৃদয়ের রাগ এসে মিশল। য়্যাডার মৃদু হাসিতে ও গভীর অর্থ খুঁজে পায়; মুখের একটি মিঠে কথায় দেখে ওর গভীর হৃদয়ের মহিমা। ক্রিসতফের মুগ্ধ চোখের সামনে য়্যাডা বিশ্বের ঐশ্বর্য নিয়ে যেন সহস্র দল মেলে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। য়্যাডা ওর একান্ত আপনার, ওর আত্মা;

'ত্বমসি মম জীবনম্'। সম্মিলিত অশ্রুতে ওদের প্রেমের রাখী বন্ধন হয়।

ওদের সম্পর্কটা কেবলি সম্ভোগের নয়। এ যেন একটা কবিতা—অরূপ, অনির্বচনীয়—অজস্র স্মৃতি, অজস্র স্বপ্ন দিয়ে গাঁথা—নিজেরই স্বপ্ন?—না, যুগে যুগে যত নারী যত পুরুষ এই পৃথিবীর বুকে এসেছিল, ভালোবেসেছিল—শাশ্বত কালের সেই প্রেমের স্মৃতি অমর হয়ে আছে ওদের বুকের তলায়, হৃদয়ে, শোণিতে? নীরবে সংগোপনে মর্মের তলায় জ্যোতিষ্কের মত অনির্বান হ'য়ে জলছে বনের প্রান্তে সেই প্রথম দেখার বিচিত্র মুহূর্তখানি; রোমাঞ্চিত সেই প্রথম দিবস:—পরম-সান্নিধ্যের প্রথম রাত্রিখানি—যে-দিন একেবারে নির্ভাবনায়, গভীর ভালোবাসায় নীরব আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে ওরা পরস্পরের বুকে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। অজস্র কল্পনা, স্বপ্ন, অজস্র মূক ভাবনা বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে...তীব্র কামনায় ওরা যেন বিবশ হয়ে পড়ে...স্তব্ধ বাণী মৌমাছির মত গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—দীপ্ত হ'য়ে ওঠে কোমল সূক্ষ্ম জ্যোতির রেখায় রেখায়।

উৎসারিত মাধুরীর প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে উতল হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে যায়। বসন্তের প্রথম আলোর স্পর্শে বিবশা, বাক্যহারা, প্রমত্তা পৃথিবীর রহস্যময় হাসিখানি কাঁপতে থাকে ওদের দৃষ্টিতে।

তরুণ হৃদয়ের এই সতেজ ভালোবাসা বসন্তের প্রথম প্রভাতের মত ঝলমলিয়ে ওঠে, বসন্তেরই মত দুদিনে আবার হারিয়ে যায়। প্রথম প্রভাতের আলোর উৎসবের মত সে-তারুণ্য আকাশ রাঙ্গায় ক্ষণিক লীলায়। লোক-নিন্দাই ক্রিসতফকে য়্যাডার কাছে টেনে নিয়ে এল।

ওদের দেখা হবার পরের দিনই কথাটা সারা শহর রাষ্ট্র হ'য়ে গেল ডাল-পালা ছড়িয়ে। য়্যাডা লজ্জা তো পেলেই না, বরঞ্চ আরও রং ফলিয়ে নিজের বিজয়-বার্তা প্রচার করতে লাগল। ক্রিসতফ অবশ্য অত বোকামো করলে না। কিন্তু যখন দেখলে সহস্র কুতূহলী দৃষ্টি

ওরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন না পালিয়ে, ধর্ম মনে ক'রে ম্যাডার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওদের নিন্দেয় ছোট শহর গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠল। ওর অর্কেষ্ট্রার সহকর্মীরা মিঠে মিঠে টিপন্নী কাটে ; ও জবাব দেয় না ; কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ওর ব্যক্তিগত। এখানে কারো হস্তক্ষেপ ও সইবে না। শহরের সম্ভ্রান্তদের ভ্রূ কঠিন ও বাঁকা হ'য়ে উঠল। অনেক বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল ; যে-সব জায়গার কাজগুলো টিকে গেল কপাল-গুণে, সে-সব জায়গায়ও ছাত্রীরা গুরুর সামনে আসে মা বা দিদির সতর্ক পাহারায়। ছাত্রীদের জানবার কথা না হ'লেও তারা সবই জানলে এবং মাষ্টার মশায়ের এই বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে ওরা খুশি হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য। বাইরে অবহেলার ভান করলেও ব্যাপারটাকে ভালো ক'রে জানবার জন্য চোখ কান রইল খাড়া হ'য়ে। কেবল ব্যবসায়ী আর দোকানদার মহলে ওর স্থানটা অক্ষুণ্ণ রইল। কিন্তু এও বেশী দিন বরদাস্ত করতে পারল না। সম্ভ্রান্তদের উন্নাসিকতা আর এ পক্ষের সমর্থন দুটোই ওর কাছে বিষের মত মনে হ'ল। কিন্তু ও-পক্ষ প্রবল সুতরাং সেখানে ও অক্ষম। অতএব রাগে নিন্দা স্তুতি দুইই ও পরিহার ক'রল। দেশশুদ্ধ লোকের অনধিকার-চর্চায় ও প্রায় ক্ষেপে উঠল।

ওর ওপর সব থেকে বেশী চটল বাড়ীওলা ও তার পরিজন। ব্যাপারটা যেন ওদেরই ব্যক্তিগত অপমান। অপরাধীর প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ক'রতে পারলে না ব'লে খাম-খেয়ালী শিল্পীগুলোর ওপর হাড়ে হাড়ে জ্ব'লতে লাগল ওরা—বিশেষ ক'রে ফোগেল-গৃহিনী। অসন্তুষ্ট-স্বভাবের ধর্মে জীবনটা ওদের দুর্ভাগ্য দেবতার চিরস্থায়ী ভ্রূকুটি। সুতরাং রোজার সাথে ক্রিসতফের বিবাহকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নেবার পর এই উল্টো বিপাককে অদৃষ্টের আর একটা ভ্রূকুটি ব'লে সান্ত্বনা পেলে। কিন্তু ক্রিসতফ রেহাই পেল না। দায় ওকেই নিতে হ'ল। এবং

প্রমাণ হ'য়ে গেল যে ফোগেলদের অপমান করবার জন্যে ইচ্ছে করেই অপকর্মটা করেছে ও। এই পরম-ধার্মিক, পরম নীতি-বাগীশ আদর্শ গৃহস্থদের মতে চরিত্র বলতে দেহ-ঘটিত স্খলন। এবং হেয়তম ও সব চেয়ে বড় লজ্জাকর স্খলন। সব চেয়ে কেন, বলতে গেলে একমাত্র ও অতি ভয়ংকর পাপ [কারণ সম্ভ্রান্ত লোকেরা চুরিও করবে না, মানুষও খুন করবে না]। সুতরাং ক্রিসতফ অতি বড় লম্পট, চরিত্রহীন। অতএব ওকে দেখলে ওরা মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটায়। ক্রিসতফ বেপরোয়া—ওর মুখটা তাচ্ছিল্যে বেঁকে ওঠে। এমেলিয়া ভাব দেখায় যেন ওর মুখ দেখতেই চান না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে ক্রিসতফ আসুক, সামনা-সামনি দাঁড়াক ; মনের সুখে একবার আচ্ছা ক'রে গাল দিয়ে নেবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

রোজার ব্যবহার ক্রিসতফকে ঘা দিল। এ মেয়ের মুখ কঠিন হ'য়েছে সব চেয়ে বেশী ; চোখে কি কঠিন ঘৃণা! শেষ আশা-ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় যে এমন হ'ল তা নয় ; আশা ও ছেড়েছে বহু আগেই। [ও তো ছাড়ল, কিন্তু আশা ওকে ছাড়ে কই ?] কিন্তু ক্রিসতফকে একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে রে'খেছিল। গোল বাঁধল এখানে।

রোজা মানুষ হয়েছে কড়া রকম গোঁড়ামীর মধ্যে ; হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে ও এই আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। ক্রিসতফের সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমাচারটি শুধু ওর কানেই এল না বুকে বাজল—বুক খানা ভাঙ্গল, আর ভাঙ্গল ওর দেউলের প্রতিমা। ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। এ বেদনার আর পার রইল না। ওর শুচি শুভ্র হৃদয়ে এ বেদনা একেবারে রক্তের অক্ষরে লেখা হ'ল। ক্রিসতফ সেবাইনের প্রেমে পড়াতে ও অন্তরে পীড়িত হয়েছিল। কিন্তু এই সাধারণ মেয়েকে যে ক্রিসতফের মত মানুষ কি ক'রে ভালোবাসতে পারল ও তার

কোনও কূল কিনারা পে'ল না। কাজটা ওর অত্যন্ত গর্হিত মনে হ'ল। সেবাইনের ব্যাপারে ওর সান্ত্বনা ছিল যে ক্রিসতফের প্রেম ছিল শুদ্ধ—সেবাইনও পাত্রী অযোগ্য ছিল না। সে তো যাহোক চুকে গেছে। মৃত্যু সে-অধ্যায়ের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে, সে-প্রেমকে দিয়েছে মহিমা। কিন্তু—দু'দিনও গেল না, কোথায় গেল সে প্রেম…এরই মধ্যে ঐ মানুষই আর এক মেয়ের প্রেমে প'ড়ল—আর য়্যাডার মত মেয়ে! সমস্ত জিনিষটাই ওর ভারী কুৎসিত, অশ্লীল মনে হ'ল। মনে হ'ল সেবাইনের বড় অপমান হয়েছে। এ অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্য মৃতা দুর্ভাগিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রোজা…ক্রিসতফের এত শিগগির এমনি ক'রে ভুলে যাওয়ার অপরাধ ও ক্ষমা করতে পারলে না। কিন্তু রোজা কেমন ক'রে জানবে, ক্রিসতফের সারা চিত্ত জুড়ে জেগে আছে হারানো মানুষটা। ভাবতে পারে না রোজা কেমন ক'রে দু'জনকে একই সময়ে ভালবাসা যায়। একের বিসর্জন বিনা অপরের প্রতিষ্ঠা কেমন ক'রে সম্ভব! নিরুত্তাপ পাথুরে পবিত্রতার খোলসের মধ্যে ব'সে না চিনলে ও জীবনকে, না চিনলে ক্রিসতফকে; ও নিজেকে রেখেছিল ধোপ-দুরস্ত ক'রে, ছকে এঁটে, কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে। জীবনও ওর কাছে তাই। ওর সংকীর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একমাত্র গৌরবের বস্তু—পবিত্রতা; নিজের কাছে, অন্যের কাছে ঐ ওর চরমতম দাবী। সুতরাং যে-মানুষ গায়ে কাদা মেখেছে তাকে ও কেমন ক'রে ক্ষমা ক'রবে!

ক্রিসতফ ওর সাথে কথা কইতে চেষ্টা করে— নিজের সাফাই গাইবার উদ্দেশ্যে নয়; [কিই বা বলবে? অমন গোঁড়া ভালোমানুষকে কি আর বলা যায়!]; হয়তো জানাতে চায় রোজার সাথে ওর প্রীতির বন্ধন ক্ষুণ্ণ হয়নি—রোজার শ্রদ্ধা চায় ও, তার পরে ওর দাবী

এখনও রয়েছে। রোজা ওর কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে—দু হাতে এই দুর্যোগকে ঠেকাতে চায় ও। কিন্তু কঠোর নীরবতায় রোজা ওকে এড়িয়ে চলে; ও বুঝতে পারে কতখানি ঘৃণা করছে রোজা।

দুঃখ হয়, রাগও হয়; এত উপেক্ষা নিশ্চয়ই ওর প্রাপ্য নয়। কিন্তু হার মানতে হয়, মানতে হয় অপরাধ। সেবাইনের কথা মনে পড়ে—চারদিকে যত তিরস্কার জমে উঠেছে, সব ছাপিয়ে ওঠে আত্ম-তিরস্কার। সত্যি মহাপাপ করেছে ও। আত্ম-নিগ্রহ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করে।

একি হ'ল ভগবান···! কেমন ক'রে এ সম্ভব হ'ল···এ আমার কোন পরিণতি?

কিন্তু যে-উদ্দাম স্রোতে ভেসেছে তাকে ঠেকাতে পারল না সর্ব-শক্তি দিয়েও। ভাবল জীবনটাই মস্ত বড় অপরাধ। কিন্তু বাঁচতে ওকে হবেই—দুর্বার প্রয়োজন ওর বাঁচার। তাই চোখ বুজলে—বাঁচতে যখন হবেই, জীবনের দিকে না তাকিয়েই ও বাঁচবে। বাঁচবে, সুখী হবে, ভালোবাসবে, বিশ্বাস করবে! ভালোবাসা! না ভালোবাসায় হেয় নেই কিছু, অশ্রদ্ধেয় নেই কিছু। ও জানে য়্যাডার মত মেয়েকে ভালোবাসার মধ্যে খুব বুদ্ধি বা বৈদগ্ধ্যের পরিচয় নেই। থাকা সম্ভব নয়। হয়তো খুব একটা সুখও মিলবে না। কিন্তু তাই ব'লে ভালোবাসা অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে? ধরো—[জোর করে নিজকে বোঝাতে চাইল] য়্যাডা তেমন চরিত্রবতী মেয়ে নয়—নাই হ'ল! ওর ভালোবাসাও অপবিত্র হ'য়ে যাবে, তাই বা কেমন যুক্তি? প্রেম প্রেমিকের হৃদয়ের ধন, আধার-নিরপেক্ষ। সব কিছুই প্রেমের যোগ্য, প্রেমিকের শ্রদ্ধার বস্তু। অন্তরে যে শুচি তার কাছে সব শুচি। সুস্থ বলিষ্ঠ অন্তরের কাছে অশুচি কিছু নাই। জীবজগতে দেখো—কোন কোন পাখীর দেহে যে বর্ণ-বিন্যাস, তার মূলে প্রেম। আত্মার গভীর হ'তে

শ্রদ্ধেয়তমের, মহত্তমের উদ্ঘাটন প্রেমে এবং ওই শ্রদ্ধেয়তম, মহত্তমই প্রিয়জনকে নিবেদন করতে চায় মানুষ। প্রেমের প্রতিমার সাথে বাক-মন-কর্মের অনুপম সুরটিকে মিলিয়ে রাখার সাধনারই পরিচয় সে আগ্রহে। তারুণ্যের যে-মন্দাকিনীতে আত্মা অবগাহী; তার শক্তি ও আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি, তা অনুপম—অপরূপ তার রূপ—তা স্বাস্থ্য আনে, হৃদয়কে ক'রে তোলে উদার আকাশ।

বন্ধুরাও ওকে ভুল বুঝেছে—ওর মনটা তিক্ত হ'য়ে উঠল। আবার মায়েরও ভাবান্তর হয়েছে। দেখা গেল আঘাত বেজেছে তাঁরও; ক্রিসতফের সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হ'ল এখানেই।

মা ভালো মানুষ। ফোগেলদের সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারেনি। সত্যিকারের দুঃখকে তিনি দেখেছেন, এবং এত ভালো ক'রে মর্ম দিয়ে দেখেছেন যে কাল্পনিক দুঃখ সৃষ্টি করে বিলাস করার মত ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি তাঁর আর নেই। জীবনে পেয়েছেন কম, চেয়েছেন আরো কম। কোনো প্রশ্ন না করে, এমন কি বোঝবার চেষ্টাও না করে, যা কিছু এসেছে নম্র-শিরে তা স্বীকার করে গিয়েছেন। আজ জীবনের ভাঙা হাটের হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে সবার পেছনে ধূলোয় পেতেছেন আসন। অপরের কাজের বিচার ভুলেও করেন নি; জানেন ওটা অনধিকার-চর্চা। দুনিয়াকে যারা ওর চোখ দিয়ে দেখলনা তাদের সাথেও ওর বিরোধ নেই; বলেন না, কারো অন্যায় হ'ল। বিনয়ে স'রে থেকে ভাবেন, অত বুদ্ধি কোথায় পাব? নিজের বিশ্বাস অপরের ওপর চাপাবার বুদ্ধিকে মনে করেন দুর্বুদ্ধি, মহা লজ্জার ব্যাপার। তা ছাড়া লুইসার বিশ্বাস আর নীতি-নিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ সহজাত। ধর্ম ওর নিশ্বাস-বায়ু; সমস্ত চেতনা জুড়ে রয়েছে তা। নিজে রয়েছে সমস্ত মালিন্যের ঊর্ধ্বে। সম্পূর্ণ ভাবে অপরের চরিত্র সম্বন্ধে রয়েছেন নিরুৎসুক।

শ্বশুরের বহু অভিযোগের মধ্যে সব চেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, লুইসার ভালো মন্দের বিচার নেই। সে অভিজাতদের শাস্ত্র-বিধি ভুলে, রাস্তায়-ঘাটে দাঁড়িয়ে আলাপ করেছে কুখ্যাত পল্লীর মেয়েদের সাথে অবলীলায়। এতটুকু বাধেনি ওর। ভেবেছে ভালো-মন্দ উঁচু-নীচুর বিচার থাকনা দুনিয়ার মালিকের হাতে—শাস্তি দিন বা ক্ষমা করুন মালিকই করবেন। মানুষের কাছে ওর শুধু সামান্য একটু দরদের, দুটো মিষ্টি কথার আকিঞ্চন; নইলে বাঁচবে কেমন ক'রে?

কিন্তু ফোগেলদের সঙ্গে থেকে থেকে সেই লুইসাও কেমন বদলে গেল। ওর ভাঙা দেহমনে প্রতিরোধের শক্তি ছিলনা—তাই ফোগেলদের মুঠোর মধ্যে এসে প'ড়ল সহজেই। এমেলিয়া ওর দুর্বলতার সুযোগ নিলে। রাতদিন একসাথেই বস-বাস, ঘর-কন্না। কাজ করে দুজনে, কিন্তু কথা বলার কাজটা করে এমেলিয়া একা। ভেঙ্গে-পড়া, উদ্যমহীন লুইসা নিজের অজ্ঞাতে ওর সাথে সাথে পর-চর্চায় যোগ দেয়। ক্রিসতফের ব্যাপারটা টীকা টিপ্পনী দিয়ে একদিন সালংকারে শুনিয়ে দিলে এমেলিয়া। লুইসার শান্ত ভাবে জ্বলে ওঠে ও। ওর মতে ছেলের অধঃপতনে নির্বিকার থাকতে পারে যে-মা, তারও চরিত্র নেই। সুতরাং কানের কাছে অনবরত বিষ ঢেলে ঢেলে লুইসাকে পাগল ক'রে তোলে। ক্রিসতফের চোখ এড়ায় না। লুইসা ছেলেকে তিরস্কার করল না, ভীরু দ্বিধায়, ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করে রোজা। ক্রিসতফ ধৈর্য হারিয়ে দু'একটা কড়া কথা ব'লে বসে কোনো কোনো দিন—লুইসা চুপ ক'রে যায়; কিন্তু চোখের দৃষ্টি আতুর হ'য়ে ওঠে। বাড়ী ফিরে ক্রিসতফ কখনও দেখতে পায় মায়ের চোখ ভেজা; এতক্ষণ ব'সে ব'সে মা তা'হলে কেবলি কেঁদেছেন। ও-মানুষকে ভালো ক'রে চেনে ক্রিসতফ; জানে এ কান্নার উৎসটি বাইরে নয়, অন্তরে।

ক্রিসতফ ঠিক করলে এ অবস্থা আর চলতে দেবে না।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় লুইসা চোখের জল ঠেকাতে পারলে না। খেতে খেতে মাঝপথে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। ক্রিসতফ বুঝতে পারলে না কি হ'ল। চার চার সিঁড়ি টপকে লাফিয়ে নেমে এল নীচে একেবারে ফোগেলদের ঘরের সামনে। রাগে ও তখন টগবগ ক'রে ফুটছে। আজ বোঝাপড়া ক'রবে এমেলিয়ার সাথে। কেবল মায়ের সাথেই নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছে তা নয়, রোজার সুদ্ধ মন ভাঙ্গিয়েছে; সেবাইন এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে। এত কাল, এত মাস ধ'রে বহু অত্যাচার সয়েছে, আজ সব কিছুর শোধ দেবে সুদে আসলে। এতকালের চাপা আগুন আজ ঠিকরে বেরুল।

একেবারে বোমার মত ফেটে প'ড়ল। দুর্দমনীয় চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোধে গলার স্বর কাঁপতে লাগল। এমেলিয়ার কৈফিয়ৎ চেয়ে ব'সল, কেন মা না খেয়ে উঠে গেল।

এমেলিয়া জ'লে উঠল। জানিয়ে দিল, যা খুশি ব'লেছে, তার জন্য কারো কাছে জবাবদিহি ক'রতে ও বাধ্য নয়। বিশেষ ক'রে ক্রিসতফের মত লম্পটের কাছে। এখানেই প্রতীক্ষিত সুযোগটিকে ছেড়ে দিলেনা; অনেক ক'রে এতদিন ধরে জিভে শান দিয়ে রেখেছে। সেই তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে শুনিয়ে দিলে, দেশশুদ্ধ মানুষের মুখে চুনকালি দিয়ে এখন মা কেন খেলে না ব'লে আদিখ্যেতা না ক'রে নিজের কালো মুখটাই বরঞ্চ আয়নায় দেখুক গিয়ে।

ক্রিসতফও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। চীৎকার ক'রে উঠল —ও যা খুশি করেছে, সে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে অন্যের মাথা ব্যথা কেন? আর বেশ ত, বলতে হয় ওকে বলুক যা খুশি; ওই শোকী দুঃখী বুড়ো মানুষটাকে টানা কেন?

এমেলিয়ার মুখের ওপর কথা শোনাবার স্পর্ধা কারো হয়নি এ পর্যন্ত। চীৎকার ক'রে উঠল বাড়ী ফাটিয়ে। নিজের বাড়ীতে ব'সে একটা চরিত্রহীন দস্যুর বক্তৃতা সে শুনবে কেন? মধুর কণ্ঠের অশ্লীল গালাগালি শুনে ক্রিসতফ যেন পালাবার পথ পায় না।

গোলমাল শুনে লোকজন এল ছুটে। শুধু ফোগেল এলনা স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয়ে। গোলমাল শুনলেই ও পালায়। এমেলিয়া অয়লারিকে সাক্ষী মানলে। কড়া ভাষায় ক্রিসতফকে শাসিয়ে দিলে আর যেন সে এ-মুখো না হয়। ক্রিসতফও পাল্টা শুনিয়ে রাখলে কারো মুফত উপদেশের ধার সে ধারেনা, এমেলিয়া বরঞ্চ নিজের চরকায় তেল দিক ভালো ক'রে।

জোর গলায় জানিয়ে দিল, চ'লে যাবে সে, এবং আর কোনো দিন এ নরকে আর পা দেবেনা।

কিন্তু তক্ষণি গেলনা, যেতে পারলে না; আরো কিছু কঠিন সত্য শোনাবার বাকী ছিল—বাকী ছিল ওদের কর্তব্যের মুখোসটা খুলে দেওয়ার। ক্রিসতফের সব থেকে বড় শত্রু ওদের ওই কর্তব্য। জেনে রাখুক এমেলিয়া, চরিত্র যদি হারিয়েই থাকে ক্রিসতফ, তার জন্যে দায়ী কে? জেনে রাখুক, ওই কর্তব্যের ঠেলায় বাধ্য হয়ে ও অন্যায়ের পেছনে ছুটেছে! এমেলিয়ার মত জীবেরা পৃথিবীর সব কিছু ভালো থেকে আনন্দ নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে ক'রে রাখে ব'লেই, ভালোকে মানুষ ভয় করে, এবং শ্রদ্ধা হারায় ভালোর ওপর। অন্ধকারের মধ্যে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যেখানে একটুখানি হাসি, একটু আনন্দের ঝিলিক দেখে—যেখানে একটু হাসতে পায়, একটু প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পায়—হোক না তা 'মন্দ' লোকের আড্ডায়—সেখানেই তারা ছোটে। ছুটবে বই কি! উপোসীর তো আর খাদ্যের জাত-বিচার চলে না! কেঠো গোড়ামীতে যা-তা কে কর্তব্য ব'লে চালিয়ে, পাশ-গাঁদার জঞ্জালকেও কর্তব্যের

লেবেল মেরে রাখে। এতে কতব্যের ঘোর অপমান। এর বাড়া পাপ নেই। লাভটা কি হয়? জীবনে কেবল বিষই জমে। রয়ে সয়ে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কথাটা ব্যবহার করা উচিত। কর্তব্য অতি দুর্লভ বস্তু। যেখানে সত্যিকারের ত্যাগ. কর্তব্য শুধু সেখানেই। ওটা নাক শিঁকেয় তুলে মানুষকে মুখ ভ্যাংচাবার জিনিষ নয়। এমেলিয়াদের মগজে কানা কড়ির বুদ্ধি থাকলে এমনভাবে দুঃখ নিয়ে বিলাস করত না। নিজেরা এঁদো গলিতে মুখ থুবড়ে অনন্তকাল প'ড়ে থাকুক, দুনিয়ার লোককে টানা কেন? ওরা নিজেরা নরকের পোকা ব'লে সবাইকে তাই হ'তে হবে, এমন জোরই বা কেন? জীবনের সব চেয়ে বড় ধর্ম আনন্দ—ওই হ'ল মূল মন্ত্র। দশের ভালো ক'রবে—কর! কিন্তু আনন্দ পাওয়া চাই তাতে। আনন্দ না পেলে চলবে কেন?

কিন্তু ওদের কর্তব্যের বিদঘুটে, হঠাৎ-বড়লোকের মত কপাল-কোঁচকান চেহারা: পাঠশালার গুরু-মশায়ের মত জীবনকে যেন বেত মেরে মেরে পড়া শেখায়। খিটখিটে খুঁৎখুতে মেজাজ ওদের; ওরা নিষ্ফল কথার পাঁক ঘাটে: তর্কের ধূম্র-জালে জীবনকে হেঁয়ালী ক'রে রাখে; ওদের রূপ রস-গন্ধ-দীপ্তিহীন অন্ধকূপের জীবন—যেখানে সামান্য শিষ্টাচারটুকু অবধি নেই; আছে কেবলি কোলাহল আর কলহ; সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সংকীর্ণ দুঃখের বিলাস। জীবনকে দীন ক'রে তোলার যত উপকরণ পায় খুটে খুঁটে তাই দিয়ে ঝুলি ভরে ওরা; যে ধী দিয়ে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করা যায় সে ধী ওদের নেই—মিথ্যে অহমিকায় তাই ওরা মানুষকে বোঝে না, বুঝতে চায় না; অত পরিশ্রম করার চাইতে মানুষকে ঘৃণা করা বরঞ্চ সহজ; তাই ওরা ঘৃণা করে। এই হ'লো মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারা আর তার নীতিই বলো আর ধর্মই

বলো সব। এর মধ্যে না আছে কল্যাণ, না আছে মর্যাদা, না আছে দাক্ষিণ্য। শ্রী নেই, সুখ নেই, সৌন্দর্য নেই ; একটা সর্বনেশে বিকৃত বীভৎসতা।

এই হলো ক্রিসতফের ধারণা। কিন্তু ওকে যারা আঘাত দিয়েছে, পাল্টে তাদের আঘাত করতে গিয়ে ওর ব্যবহারটাও যে ঐ লোক গুলোর মতই হ'ল, সে খেয়াল নেই ওর।

ছবিটা এঁকেছে নিখুঁত ক'রে, সন্দেহ নেই ; খোলা চোখে দেখেছে ওদের খাঁটি চেহারাই, কিন্তু অপরাধ ওদের নয় ; ওরা জীবনের রাজপথের পথিক হ'তে পারেনি—ওরা তার অন্ধ-গলির ধারের বাসিন্দা। তাই ওদের বাক-মন-ক্রিয়ার সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে—দুঃখের মার খেয়ে খেয়ে চেহারাটা অবধি বেঁকে চুরে কিম্ভূত কিমাকার হ'য়ে গেছে। কিন্তু যে-দুঃখের মার এরা খায়, সে দুঃখ-দেবতা নয়, যিনি হঠাৎ নেমে আসেন রুদ্র-তাণ্ডবে—আঘাত দিয়ে হয় একেবারে মারেন, নয় খুলে দেন নব-জীবনের স্বর্ণ-সিংহদ্বার। এ অতি ক্ষুদ্র দুঃখ :

> 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
> সরমের ডালি,'
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমায়িত কালী,
> লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
> কলহ সংশয়,'

একটু একটু করে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জীবনের রস শুষে নিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে এ দুঃখ জীবনের প্রথম দিন হ'তে শেষ দিন পর্যন্ত। কি করুণ পরিহাস ! কিন্তু তবু হতভাগাদের বাইরের কর্কশ খোলসটার তলায় খুঁজলে দেখতে পাবে হৃদয় আর মানসের কি বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ;

চরিত্রের অতুল বৈভব—প্রাণের নীরব বীর্য। ওখানেই তো উত্তরকালের পৃথিবীর শক্তির উৎস, জীবনের বীজ-মন্ত্র।

'কর্তব্য'কে অসামান্য জেনে ভুল করেনি ক্রিসতফ। অসামান্য—প্রেম, সবই অসামান্য। কিন্তু এত বড় মূল্যের কত বড় হত্যা অহরহ—আকস্মিক বিপর্যয়ে নয়, দুর্নীতির বিষে নয়—[দুর্নীতিরও মূল্য আছে] কেবল প্রাত্যহিক অভ্যাসে।

য়্যাডারও শ্রান্তি এল। ক্রিসতফের মত বিপুল প্রাণ-প্রবাহে অবগাহন ক'রে প্রেমের নিত্য নবীন রসটিকে ও আহরণ ক'রতে পারলে না। কারণ ওর চরিত্রে স্বাস্থ্য নেই। ও কেবল সম্ভোগ করেছে। সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রেমকে সর্বপ্রকারে শোষণ করে স্ফূর্তি লুটেছে। এখন বাকী আছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে স্ফূর্তি করা।

য়্যাডার মত বহু বুদ্ধিমতী দীপ্তিমতী মেয়ে, বহু চতুর দীপ্তিমান ছেলে কি জানি কেন জীবনের প্রতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে—শিল্পে বল, কর্মক্ষেত্রে বল, সন্তান-সৃষ্টি বল, কোথাও কোনো ফল ফলাতে পারে না। হয় তারা সৃষ্টি-বিমুখ, নয় শক্তিই বন্ধ্যা। কিন্তু প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে এ দৈন্যকে অন্তরে মেনে নেওয়াও সম্ভব হয় না। তাই বিক্ষোভ আসে এবং সেই বিক্ষোভের প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংস-মুখী হয়।

ধ্বংসাত্মিকা বুদ্ধিটা সহজ বুদ্ধির মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন। এবং সেই বুদ্ধিতেই ওরা চায় দুনিয়ার সবাই ওদের মত নিষ্ফলা হোক এবং ওই বুদ্ধির দৌলতেই ওরা সবাইকে নিজের স্তরে নামিয়ে আনতে চায় যেমন ক'রেই হোক। সব সময় যে জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে করে তা নয়; অজান্তে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করে। এবং সচেতন মনে এই অপচিকীর্ষা টের পাওয়া মাত্রই ঘৃণায় পিছিয়ে যায়। কিন্তু প্রায়ই এ ইচ্ছেটাকে ওরা লালন করে এবং কেউবা নিতান্ত কাছের মানুষের ওপর অথবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে

নিজের শক্তি অনুসারে প্রয়োগ করে। যেখানেই ওরা জীবনকে জীবন্ত দেখে—জীবনের প্রতি ভালোবাসা দেখে—যেখানেই জীবনের এতটুকু কণা খুঁটে পায়—সব কিছুকে ধ্বংস করে। যে-মানুষ তর্কের খাতিরে মহিমাকে খর্ব করে, বৃহৎকে হীন করে, আর যে-মেয়ে প্রমোদের জন্য প্রেমিককে নামায় মাটির ধূলোয়—দুইই এক গোত্রের জীব এবং [illegible] ভয়ংকর। তুলনা করে মনে হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবেদের দাঁত [illegible]থে বিষ কিছু কম।

য়্যাডা পারলে ক্রিসতফকে টেনে নীচে নামাত কিন্তু ও কাজ দুর্বলের নয়। অত শক্তি ওর ছিল না। মানুষকে নামাতে হ'লেও কিছুটা অন্ততঃ বুদ্ধির প্রয়োজন। তাও যে নেই এতটুকু য়্যাডা পরখ ক'রে দেখেছে।

য়্যাডা তেমন হিংস্র নয় ব'লেই যে ওর ভালোবাসায় ক্রিসতফের কোনো ক্ষতি হয় নি তা নয়। হয়নি, ওর ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই বলে। ওর মনের মধ্যে যে কোনো অপচিন্তা আছে, তা য়্যাডা নিজের কাছেও স্বীকার করে না। সম্ভবত ক্ষমতা থাকলে ক্ষতি ও করত না। কিন্তু সে-সাধ্য নেই বলেই ও আরো ক্ষেপে ওঠে। প্রত্যেক মেয়েই চায় যাকে সে ভালোবাসছে তার ওপর সব ক্ষমতা খাটানো যাবে—ক্ষমতা প্রলংকরীই হোক আর শুভংকরীই হোক। হয়ত এটা মোহ। কিন্তু এ মোহ তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এবং এ মোহের সুযোগও তাকে দিতে হবে। নইলে প্রেম বাঁচবে না। নিজের ক্ষমতা ওরা যাচাই ক'রে দেখবে নিক্তি ধ'রে।

কিন্তু ক্রিসতফ ওকে কোনো প্রশ্রয় দিল না। হাসতে হাসতে য়্যাডা জিজ্ঞাসা করে: 'আমার জন্য তুমি তোমার সঙ্গীত-চর্চা ছেড়ে দিতে পার?'

(সত্যি যে য়্যাডা এ চায় তা নয়)

অকপটে জবাব দেয় ক্রিসতফ :

'উঁহু! তুমি কেন, কারো জন্যই পারি নে। গান আমি ছাড়তে পারি নে।'

য়্যাডা যেন নিবে যায়। 'এই তোমার ভালোবাসা?'

সঙ্গীত বোঝেনা ব'লেই ও বস্তু ওর আরো অসহ্য। অথচ মুখোমুখি হ'য়ে ক্রিসতফের সঙ্গীত-প্রীতিকে আঘাত দিয়ে ভাঙ্গবে, এমন কোনই সম্ভাবনা দেখতে পায় না। দু' এক সময় ক্রিসতফের রচনার বিরূপ সমালোচনা যদি বা করে, ক্রিসতফ হেসে গড়িয়ে পড়ে। ভেতরে ভেতরে রাগে জ'লে যায় য়্যাডা, তবু চুপ ক'রে যেতে হয়, বুঝতে পারে নিজকে খেলো করছে।

এদিকে কিছু সুবিধে হয় না। কিন্তু আর একটা ফাঁক আছে। নীতির প্রতি ক্রিসতফের যে অটুট নিষ্ঠা, য়্যাডা বুঝলে এই সব চেয়ে দুর্বল স্থান। ফোগেলদের সাথে ঝগড়া সত্ত্বেও, বয়ঃ-সন্ধির মাদকতা সত্ত্বেও ওর চরিত্রে একটা অপূর্ব সংযম আছে, এবং আছে শুচিতার জন্য একটা গভীর পিপাসা। এ সংযম ওর সহজাত, এবং এ পিপাসা ওর সম্পূর্ণ সজ্ঞান সুস্থ চিত্তের পিপাসা। য়্যাডার মন বাঁধা পড়েছিল এ নিষ্ঠার টানেই। কিন্তু আরেক বিপরীত প্রবৃত্তির টানে সেদিনের মাধুরীর উৎস আজ ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল। মুখোমুখি আক্রমণ ক'রলেনা—ওটা চোরা পথে এল।

'তুমি আমায় ভালোবাসো?'

'নিশ্চয়ই।'

'কতখানি?'

'যতটা ভালোবাসা যায়।'

'সে আর কতটুকু—! আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা দাও। বল কি করতে পার আমার জন্য।'

'যা বলো।'

'খারাপ কাজ কিছু করতে পার?'

'বাঃ চমৎকার পরীক্ষা তো।'

'করতেই যে বলছি তা তো নয়। জিজ্ঞাসা করছি পারো কিনা।'

'এ অদ্ভুত প্রশ্নের কোনো দরকার আছে ব'লে তো মনে হয় না।'

'যদি আমি চাই?'

'অন্যায় করবে।'

'হবে—। কিন্তু জবাব দাও করবে কিনা তুমি।'

ক্রিসতফ ওকে চুমু খেতে এগিয়ে এল, কিন্তু ঠেলে সরিয়ে দিল য়্যাডা।

'বলো করবে কি না, হ্যাঁ বা না একটা জবাব দাও।'

'না গো না, আমার রাণী! না।'

ভীষণ রেগে মুখ ফিরিয়ে ব'সল য়্যাডা।

'ছাই ভালোবাসো। ভালোবাসা কাকে বলে জানোই না।'

সরল ভাবে হাসতে হাসতে বলে ক্রিসতফ:

'তা হবে।' জানে আরো দশ জনের মত ক্রিসতফ ঝোঁকের মুখেও অবিবেচনার কাজ, অন্যায় কাজ, এমন কি তার চাইতে আরো সাংঘাতিক কিছুও করে ফেলতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির বিচার নিয়ে 'আলবৎ পারি ব'লে' যদি কোমর কষে তবে লজ্জার সীমা থাকবে না। কিন্তু য়্যাডার কাছে এ লজ্জা প্রকাশ হ'লে অনর্থ ঘটবে—ওর সহজাত সংস্কারই ওকে সাবধান করে দিল। আবার জিজ্ঞাসা করে য়্যাডা:

'আচ্ছা তুমি আমায় ভালোবাসছ কি ভালোবাসার জন্যই, না আমি বাসছি তাই?'

'ভালোবাসি তাই বাসছি।'

'তা হ'লে আমি যদি তোমায় ভালো না বাসি, তা হ'লেও তুমি আমায় ভালোবাসবে, কেমন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, যদি আর কাউকে ভালোবাসি তা হ'লেও?'

'সে আমি জানিনে—বোধ হয় না—। বোধ হয় তোমার পরে ভালোবাসি আর কাউকে ব'লতে পারব না।'

'এ পরিবর্তন—?'

'অনেক কিছুই তো বদলায়, বদলাবে। আমিও হয়ত বদলাব। তুমি তো নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা আমি যদি বদলাই, কি হবে তা হলে?'

'কি হবে? সব কিছু ওলট-পালট হ'য়ে যাবে। তোমায় ভালোবাসি সে তুমি ব'লে। তুমি যখন অন্য কেউ হ'য়ে যাবে, তখন তাকেও ভালোবাসব এমন কথা হলপ ক'রে বলি কেমন ক'রে?'

'ছাই ভালোবাসো, ছাই ভালোবাসো। সাত সতের কথা ব'লে লাভ কি। ব'য়েই গেল ভালোবাসো আর না বাসো। যদি ভালোবেসেই থাকো তবে আমি যাই করি না কেন চিরকাল এক ভাবে ভালোবাসবে।

'সে তো জানোয়ারের ভালোবাসা।'

'জানোয়ারের ভালোবাসাই আমার ভালো।'

হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে ক্রিসতফ:

'তাহ'লে ভুল করেছ। আমি তোমার অযোগ্য। যে-মানুষ

তোমায় ভালোবাসতে পারবে সে আমি নই। হ'তে পারলে ভালো হ'ত। তবে তা পারবো না, হবোনা।'

'ভারী গুমর তো! আমার চাইতে নিজের ওপরে তোমার টান বেশী দেখছি।'

'কিন্তু পাগলী! আমি যে সত্যি তোমায় ভালোবাসি; তুমি নিজকে যা ভালোবাসো তার চাইতে বেশী। তুমি যত বেশী ভালো হও, সুন্দর হও, ততই তোমায় বেশী ক'রে ভালোবাসবো।'

'একেবারে ইস্কুল-মাষ্টারী বুলি,' শ্লেষের সুরে বলে য়্যাডা।

'আচ্ছা তোমার মনের কথাটাই শুনি। আমার তো সুন্দর জিনিষই ভালো লাগে। কোনো কিছু কুৎসিত দে'খলেই আমার মন বিগড়ে যায়।'

'আমার বেলায়ও তাই?'

'নিশ্চয়ই! তোমার বেলায় তো আরো বেশী।'

রাগে পা মাটিতে ঠুকতে থাকে য়্যাডা। বলে:

'আমি চাইনে কেউ আমার বিচার করে।'

"বেশ তো! থাক-না বিচার, নালিশই করনা। আমি তোমায় কি চোখে দেখি এবং তোমার মধ্যে আমি কি ভালোবাসি, তাই নিয়ে দাওনা ঠুকে একটা।' ওকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে কোমল স্বরে বলে ক্রিসতফ। দুই হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। য়্যাডা মৃদু হাসে। ক্রিসতফ আশ্বস্ত হয়, য়্যাডা সব ভুলে গেছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ও জিজ্ঞাসা ক'রে বসল:

'আচ্ছা, আমার মধ্যে কি কি খারাপ আছে বলতো।'

এত বড় দুঃসাহসের কথা কি ক'রে বলবে ক্রিসতফ? ভীরুর মত জবাব দেয়: 'কই, এমন কি আর?'

একটু চিন্তা ক'রে হেসে বলে য়্যাড়া :

'দাঁড়াও ক্রিস্টলী : 'মিথ্যা কথা না তুমি বলনা' ?

'বলি নাই তো। মিথ্যা কথা আমি ঘেন্না করি।'

'ঠিক ব'লেছ। আমারও ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমারও বিবেক আছে। মিথ্যে কথা আমিও বলিনে।'

ফ্যালফ্যাল ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ক্রিসতফ। ভাবে সত্যি কথাই বলছে য়্যাডা খাঁটি হ'য়ে। এ সরলতায় নিরস্ত্র হ'য়ে যায় ও।

দুহাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে য়্যাডা বলে : 'এখন বলতো আমি যদি অন্যকে ভালোবাসি আর তুমি সে কথা জানতে পার, তবে কি তুমি রাগ করবে ?'

'চটিও না বলছি।'

'চটাচ্ছে কে ? আমি সত্যি সত্যি যেন কারো প্রেমে প'ড়ে গেছি। না গো না, পড়িনি, পড়িনি। বলছিলাম, যদি প'ড়েই যাই কোনো দিন তবে…!'

'ওসব কথা ছাড়ো এখন।'

'কিন্তু আমি যে শুনতে চাই…। বল, রাগ করবে না ? পারবেই না রাগ ক'রতে, তাই না ?'

'না রাগ ক'রবো না, তবে বিদায় নেব। বস্।'

'সে কি ? কেন ? আমি ভালোবাসলেও !'

'ভালোবাসবে ? কি ক'রে ? দুজনকে এক সাথে ?'

'নিশ্চয়ই, তা যেন হয়না !'

'হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে হবে না।'

'কেন ?'

'যেহেতু, যে-মুহূর্তে আর কেউ তোমার আমার মাঝখানে এসে দাঁড়াবে, সে-মুহূর্ত থেকে আর আমায় খুঁজে পাবেনা। কোনো দিন না…।'

'কিন্তু এক্ষুনি যে বললে ;

'তাহ'লে প্রমাণ হ'ল তো যে আমায় মোটেই ভালোবাসো না।'

'ভালোই তো হ'ল তোমার।'

'কারণ…?'

'কারণ তুমি অন্যকে ভালোবাসলেও যদি আমি তোমায় ভালো-বাসি, তাহ'লে কে জানে তোমার আমার আর সেই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল নাও হতে পারে।'

'পাগল হ'লে? তুমি বলতে চাও, সারা জীবন ধ'রে তোমার সাথেই আমাকে গাঁঠ-ছড়া বেঁধে থাকতে হবে?'

'না। ভয় পেয়ো না। তা হবে না। তুমি মুক্ত, কোনো দায় নেই তোমার, যে দিন ইচ্ছে হয় চ'লে যেও, দ্বার খোলা রইল। তবে যাওই যদি, অমনি যাওয়া চলবেনা, একেবারে শেষ বিদায়ের পালা চুকিয়ে, চল্লুম ব'লে যাবে।'

'কিন্তু আমি যদি তখনও তোমায় ভালোবাসি!'

'দেখ, ভালোবাসা মানে পরস্পরের কাছে নিজকে একেবারে বিলিয়ে দেওয়া। ওখানে বাকীর কারবার চলে না।'

'বেশতো…দাও না দেখি তুমিই।'

না হেসে থাকতে পারলেনা ক্রিসতফ ওর আত্ম-কেন্দ্রিকতায়। য়্যাডাও হাসে।

'একতরফা?' ক্রিসতফ বলে। তার মানে ভালোবাসাটাও একতরফা।'

'মোটেই নয়। তার মানে ভালোবাসা দুই তরফা। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি যদি আমার হাতে নিজকে ছেড়ে দিতে না পারো, তবে আমার ভালোবাসা বেশী দিন আশা ক'রোনা। ক্রিষ্টী, একবার ভাবো, যদি তাই পারো, তোমার ভালোবাসা তবে কত বেড়ে যাবে—কত আনন্দ পাবে তুমি।'

মেঘ উড়ে গেল, দুজনে উঠল হেসে।

হেসে য়্যাডার দিকে তাকাল ক্রিসতফ। ক্রিসতফকে ছেড়ে যাবার কথা য়্যাডা মুখে অবশ্য বলেছে, কিন্তু সত্যি ছেড়ে যাবার কথা ও ভাবতে পারে না। বিরক্তি আসে, ক্লান্তি আসে. কিন্তু অমন পরিশুচি গভীর নিষ্ঠার দাম ও বোঝে। তা ছাড়া এখনও ওর জীবনে আর কেউ আসেনি। এতক্ষণ শুধু খেলা করছিল ; কতকটা ক্রিসতফকে চটাবার জন্যও বটে। জানে এ ধরণের কথায় ও চটে। অন্য কারণও ছিল। ছোট ছেলেরা নোংরা জল ঘেঁটে ঘেঁটে খেলতে যেমন ভালোবাসে, নোংরা কথা, নোংরা চিন্তা নিয়ে ঘাঁটাঘাটিতে ওরও কতকটা তেমনি আকর্ষণ আছে। ক্রিসতফ এ জানে। কাজেই ও বিশেষ কিছু মনে করেনা। কিন্তু বড় শ্রান্তিকর এই পাঁকে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকা, আর এই নিরন্তর সংশয়ের দোলা। ও ভালোবাসে এই মেয়েকে আর সম্ভবতঃ ওদের ভালোবাসাটা পারস্পরিক ; অথচ এই অনিশ্চয়তা। এক এক সময় যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে য়্যাডাকে নিয়ে আত্ম-ছলনা করতে করতে। চোখে জল আসতে চায়। ভাবে, কেন য়্যাডা অমন ? সংসারের মানুষই বা এমন কেন ? জীবন এত বিড়ম্বনার ? কিন্তু যেই সুন্দর মুখখানা চোখে পড়ে, সুনীল গভীর দুটি চোখ, কুসুম-সুকুমার বর্ণ, হাসির দ্যুতি-ঝরা মুখর এক জোড়া ঈষৎ-ফাঁক ঠোঁট, সেই আধ-খোলা পথে শুভ্র-দন্ত-রুচির সূক্ষ্ম রেখাটি, আর উজ্জ্বল

জিভখানির একটু ঝিলিক, ওর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে; হাসি অশ্রুতে মিশে যায়। দুই জোড়া ওষ্ঠ অতি অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে; ক্রিসতফ ওর দিকে তাকায় যেন বহু বহু দূরের আর এক জগৎ হ'তে। ওর মনে হয়, ক্রমশ যেন দূর হতে দূরে স'রে যায় মুখখানি, অদৃশ্য হ'য়ে যায় কুয়াশার যবনিকার আড়ালে—এবং তার পর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে একেবারে হারিয়ে যায়। ওর কথা অবধি কানে আসেনা—যেন এক সুখময় বিস্মৃতির জগৎ। ওই বিস্মৃতির জগতে একা জাগে সুরশিল্পী ক্রিসতফ—তার চেতনার আকাশ জুড়ে সুদূরের স্বপ্ন—এ ক্রিসতফ, এ স্বপ্নের সাথে য়্যাডার কোনো পরিচয়, কোনো সংযোগ নেই। আঃ—সঙ্গীত! অপরূপ! ক্রন্দসী পৃথিবীর বুকের কান্না—একমাত্র দরদী, মরমী বন্ধু। আর সব মিথ্যে—একমাত্র এই সত্য।

য়্যাডা ওর হাত ধ'রে ঝাঁকানি দেয়। অপরিচয়ের স্বরে চীৎকার করে ওঠে:

'কি হয়েছে তোমার বলতো? পাগল হ'লে? আমার দিকে অমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন?'

ওর দিকে তাকিয়ে-থাকা চক্ষু-জোড়ার দিকে গভীর ভাবে ক্রিসতফ তাকায়। কার চোখ? হঁ্যা, হঁ্যা মনে প'ড়েছে। গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ওকে য়্যাডা। খুঁজতে চেষ্টা করে কি ভাবছিল এতক্ষণ!—ওর মনের গহনে ডুব দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ কি ওর বুঝবার জিনিষ? তবু একটু যেন বোঝে; বোঝে যে, এ-মানুষকে ধ'রে রাখা যাবেনা। ওর স্পর্শেই বন্ধ দ্বারের আগল খুলে যাবে, আর সে খোলা দ্বারের পথে পাগল পথিক চ'লে যাবে। রাগ হয়। কিন্তু প্রকাশ করেনা।

আর একদিন এমনি বিচিত্র ভাবাবেশের পরে য়্যাডা জিজ্ঞাসা করল : 'কাঁদছ কেন ?'

চোখে হাত দিয়ে দেখে সত্যি তো চোখ ভেজা। বলে, 'কি জানি, জানিনে।'

'কেন মন খুলে কথা বলনা বলতো ? তিন তিন বার ওই একই কথা বলেছ।'

'কি চাও বল !' কোমল ভাবে বলে ক্রিসতফ।

আবার সেই পুরাণো আবর্জনা। ক্লান্ত ভাবে ক্রিসতফ প্রতিবাদ করে মাথা নেড়ে।

'বাস্! বাস্! আর একটি কথা মাত্র।' ব'লেই আবার জের টানতে আরম্ভ করে য়্যাডা।

ক্রিসতফ রাগে কাঁপে।

'দেখ ওসব ইতরামীগুলো তোমার নিজের মনেই রাখো।'

'বাবাঃ, ঠাট্টাও বোঝনা !'

'ঠাট্টাগুলোকেও একটু ধোপ-দুরস্ত করা দরকার।'

'আচ্ছা ঠাট্টাতে কেন চ'টে যাও বলতো ?'

'কেন ? আঁস্তাকুড় থেকে দুর্গন্ধ কেন বেরয় এ নিয়ে লাঠালাঠি ক'রবে কার সাথে ? গন্ধ বেরয়, বেরুবে, এ তার ধর্ম। বাস্। পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকটা বন্ধ করি বৈকি।'

য়্যাডা রাগে দুম্‌দাম করে পা ফেলে চলে গেল। কিন্তু ওর মুখ বন্ধ হয়না। যখনই সুযোগ পায়, ক্রিসতফের বিবেকে বাধে রুচিতে বাধে এমনি সব অশ্লীল আলোচনা টেনে টেনে আনে।

ক্রিসতফ ভাবে ওর রুচিকে আঘাত ক'রে য়্যাডা আনন্দ পায়। এ ওর ব্যাধিগ্রস্ত বিকৃত মনেরই সাক্ষ্য। আবার মরীচিকার পেছনে

ছোটে—নূতন আশায় বুক বেঁধে আবার য়্যাডার কাছে ফিরে আসে। ক্রিসতফ ভালোবাসে। প্রেমই বিশ্বাস। ভগবান আছেন কি নেই সে বিচার তুচ্ছ। বিশ্বাস করা বিশ্বাসের নেশায়। তেমনি ভালোবাসার নেশায় ভালোবাসা।

ফোগেলদের সাথে ঝগড়ার পরে, ও-বাড়ীতে থাকা আর চললনা। লুইসাকে আর একটা বাসা খুঁজতে হ'ল।

ক্রিসতফের পরের ভাই আর্নেষ্টের খবর নেই বহুদিন। হঠাৎ সেদিন সে বেকার অবস্থায় এসে উপস্থিত। । কাজ জুটিয়েছিল একটার পর একটা ক'রে অনেক কটাই; টিকতে পারেনি কোথাও। হাতে পয়সা নেই—শরীর ভেঙ্গেছে; সুতরাং মায়ের আশ্রয় ছাড়া গতি ছিল না।

ভাইয়ের সাথে আর্নেষ্টের অসদ্ভাব নেই; তবে তাদের বড় একটা মাথা ব্যথাও নেই ওর জন্যে,; কিন্তু এ জন্য ওর কোন আফশোষ নেই। ভাইদেরও কোনো রাগ নেই—ও যেন রাগেরও অযোগ্য। রাগ কার ওপরেই বা করবে। ওকে কিছু বলা মানে হাওয়াকে বলা। কোথাও কোনো দাগ থাকবেনা। ধূর্ত চোখ দুটি দিয়ে কেবল হাসবে, দেখাবে যেন ভারী অনুতাপ হয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে ঠিক উল্টো; ওদের কথায় সায় দিয়ে যাবে, ধন্যবাদ দেবে ঘটা ক'রে এবং শেষ পর্যন্ত যেমন করেই হোক দুজনের কারো না কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। ওদের বাবার সাথে আর্নেষ্টের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। এই খুশ-মেজাজী ছেলেটাকে ক্রিসতফ ভালো না বেসে থাকতে পারে না। ক্রিসতফের মতই ওর দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুছাঁদ দেহ; মুখের ভাবখানি যেন ওর মনের খোলা বাতায়ন; সরল ঋজু নাকটি, মুখে

হাসি লেগেই আছে, তার ফাঁকে শুভ্র দন্তপাটির সূক্ষ্ম রেখা ; ব্যবহার, ধরন-ধারন মানুষকে কাছে টানার মত। ভাইকে শাসন করার জন্য কড়া কড়া কথা শান দিয়ে রাখে ক্রিসতফ ; কিন্তু ওকে দেখলেই আর কিছু মনে থাকে না। ভাই-এর জন্য ওর বুকে মাতৃ-স্নেহের প্রশ্রয়। তার কিছুই মন্দ ঠেকেনা ওর চোখে। আর্নেষ্টও নির্বোধ নয়। কালচার হয়ত নেই কিন্তু বুদ্ধি নেই এমন নয়। মনোজগতের ব্যাপারে ওর খুব আগ্রহ। গান শুনতে ভালোবাসে ; না বুঝলেও দাদার রচনা আগ্রহ দিয়ে শোনে। পরিবারের কারো কাছ থেকে খুব বেশী প্রশ্রয় বা সহানুভূতি ক্রিসতফ কখনও পায়নি ; তাই ভাইকে মাঝে মাঝে কনসার্টে দেখে ওর ভারী ভালো লাগে।

দুই ভাইএর চরিত্রের অলিগলি ওর নখাগ্রে। এবং এ জ্ঞানকে ও ঠিক সুযোগ বুঝে কাজে লাগায়। আর্নেষ্টের আসল প্রতিভা এইখানে। ক্রিসতফ লক্ষ্য করেছে আরনেষ্ট অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক। নিজের বাইরে আর সকলের সম্বন্ধে সে উদাসীন। মায়ের আর দাদার কথা মনে হয় কেবল দরকার হলে ; কিন্তু শুধু চোখেই দেখে ক্রিসতফ, শক্ত হ'তে পারে না। ভাইয়ের আদুরে ব্যবহারে ওর মন গলে যায়। অতএব সে যা চায়, দাদার তাতে ঢালা মঞ্জুরী। রুডলফের স্বভাব একেবারে বিপরীত—মাপা-জোখা, হিসেব-করা, নিয়মে-বাঁধা ; কাজ কর্ম করে মন দিয়ে ; চরিত্র একেবারে নির্ভেজাল ; টাকা-পয়সায় জন্য হাতও পাতে-না ; কাউকে কিছু হাত উল্টে দেয়ও না। প্রতি রবিবার মাকে দেখতে আসে ; এক ঘন্টা থাকে—এবং যতক্ষণ থাকে নিজের সম্বন্ধে, কাজ সম্বন্ধে, কর্ম স্থল সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে। অর্থাৎ ওর যত কথা নিজকে কেন্দ্র ক'রেই ঘোরে। ভুলেও কারো কথা জিজ্ঞাসা করে না ; ঠিক এক ঘন্টা পরে চলে যায় কর্তব্য পালন করেছে সেই খুশিতে ডগমগ হয়ে। সব

দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত। তবু আর্নেষ্টকেই বেশী ভালো লাগে; রুডলফকে সহ্য করতে পারেনা ক্রিসতফ। ওর আসবার সময় হলে বেরিয়ে যায়। রুডলফের হিংসে আছে দাদার 'পর। আর্টিষ্ট নামেই ওর বিরাগ। তার ওপরে দাদার কৃতিত্বে ওর রীতিমত বুকে ঘা লাগে; যদিও তার সামান্য খ্যাতিটুকুকে ও নিজের স্বার্থে অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যবহার করে থাকে নিজের ব্যবসার মহলে। অবশ্য বাড়ীতে কোনো কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেনা; এড়িয়ে যায় কৌশল করে; কিন্তু ক্রিসতফের সম্বন্ধে কুৎসাগুলোকে লুফে নেয়; ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রীতিমত বাড়াবাড়ি করে। এই ধরণের নীচতা ক্রিসতফ বরদাস্ত করতে পারেনা। তবু যেন দেখেনি এমনি ভাবে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু এখনও ও জানেনা যে সব কিছুর জোগান দেয় আর্নেষ্ট। জানলে ওর বুক ভেঙ্গে যেত। ধূর্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদের ইন্ধন জোগায় অলক্ষ্যে। ক্রিসতফের প্রতিভাকে ও অস্বীকার করে না। এবং মাঝে মাঝে উপহাস করলেও তার সহজ উদার হৃদয়টির প্রতি ওর মমতা আছে। কিন্তু চতুর হিসেবী বুদ্ধি দিয়ে দুটোকেই কাজে লাগায়। দাদাকে যে রুডলফ দেখতে পারে না, এ ওর ভালো না লাগলেও তার সুযোগ গ্রহণ করতে ওর লজ্জা নেই। রুডলফের অহংকার আর হিংসেকে ও ফাঁপিয়ে তোলে, ওর গাল খায় ভক্তিতে নুয়ে, ওকে রসিয়ে রাখে শহরের যত লোকের কুৎসার খবর জুগিয়ে— বিশেষ ক'রে দাদার। ক্রিসতফের সম্বন্ধে কেমন ক'রে যে ও এত খবর রাখে সে এক আশ্চর্য।

এমনি ক'রে অবাধে আর্নেষ্ট নিজের কাজ হাসিল করে। রুডলফ লোভী; তবু ক্রিসতফের মত সে খুশি হ'য়েই যেন আর্নেষ্টের হাতে নিজকে ডালি দেয়। আর্নেষ্ট ওকে লুট করুক এই যেন ও চায়।

এবং আর্নেষ্টেরও বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় না এ বিষয়ে। দুজনের স্নেহ ও পকেট সমভাবে ভোগ করে সে।

এত চতুর হওয়া সত্ত্বেও এবারে বাড়ী এসে ওর অবস্থাটা অত্যন্ত শোচনীয় হ'ল। এল ও মিউনিক থেকে। কদিন আগে ওখানে একটা কাজ পেয়েছিল। পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি যায়। সুতরাং অধিকাংশ পথ ওকে পাড়ি দিতে হলো জল ঝড়ের মধ্যে হেঁটে—এবং পথের রাতগুলো কাটল যেখানে সেখানে। সারা গায়ে কাদা নিয়ে, ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে, অশ্রান্ত কাশিতে এমনি অবস্থায় এল, দেখে মনে হল আর বাঁচবেনা।

চেহারা দেখে লুইসা আপনাকে সামলাতে পারলে না। ক্রিসতফ ভয় পেয়ে ছুটে এসে ওকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল। এমনিতেই আর্নেষ্টের চোখের জল সহজ। আজ ওকে দেখে মা দাদার যে অবস্থা হ'ল ; ও তার সুযোগ অমনি যেতে দিল না। আজ অশ্রু বইল একেবারে ধারায় ধারায়। চোখের জলে ধুয়ে মেঘের লেশও রইল না সম্পর্কের মধ্যে। তিন জনের চোখের জল এক ধারায় মিশে গেল।

ক্রিসতফ নিজের ঘরখানি ছেড়ে দিল। তারপর দুজনে মিলে ভারী ব্যস্ত হ'য়ে বিছানা পেতে শুইয়ে দিলে ওকে। ডাক্তার এল—চিকিৎসা, ঔষধ পথ্যাদির যতদূর সম্ভব ভালো ব্যবস্থা হ'লো। অগ্ন্যাধারে পরিচ্ছন্ন একটি আগুন জ্ব'লে ঘর গরম হ'লো। মা দাদা দুজনে পালা ক'রে রোগীর শুশ্রূষার ভার নিলে।

আর্নেষ্ট এসেছে একেবারে এক কাপড়ে ভিখিরী হ'য়ে—অতএব অভিভাবকদের হাতে নিজকে সঁপে দিলে একেবারে বাধ্য ছেলের মত। ওর কাপড় জামা জুতো, মায় সূতোটি অবধি তৈরী ক'রতে হলো নতুন করে। ইদানীং ক্রিসতফের আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয় হ'য়ে প'ড়েছে। বাড়ী বদলের খরচ, নূতন বাড়ীর ভাড়া বেশী, গান শেখানর

কাজও চলে গেছে অনেক কটা। সংসার চলছিল কোনোমতে টেনে বুনে। এখন এই বাড়তি খরচে টানের ওপর আরো টান পড়ল। রুডলফের অবস্থা স্বচ্ছল, তার কাছে সাহায্য চাওয়া যেত। কিন্তু চাইতে পারলে না ক্রিসতফ, ওর আত্ম-সম্মানে ঘা লাগল। বড় ভাইয়ের কতব্য হিসেবে ভাইয়ের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়াই ও সম্মান-জনক বলে গ্রহণ ক'রল। এই সম্মানকে বাঁচাতে গিয়ে পরম অসম্মান বরণ ক'রে নিতে হ'ল ওকে। কদিন আগেই কোনো এক ধনী সখের গাইয়ের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব আসে; ওর একটা রচনাকে সে তার নিজের বেনামায় ছাপাবে। মাশুলটা বেশ বড় রকমের। কিন্তু সেদিন এই অসম্মানজনক প্রস্তাব ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু আজ উপযাচক হয়ে হাত বাড়াতে হ'ল। লজ্জায় ওর মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। আর্থিক দায় মেটাতে মাকেও নিতে হ'ল ছেঁড়া-রিপুর কাজ। যে টাকা ঘরে আসতে লাগল তার আসার পথটাকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে নিজেদের এই অসীম ত্যাগের কথা ওরা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ গোপন ক'রে রাখলে।

একটু সেরে উঠলে পর একদিন আগুনের পাশে জড়সড় হ'য়ে বসে প্রবল কাশির ফাঁকে আর্নেষ্ট প্রকাশ ক'রল ওর কিছু ঋণ আছে। সে ঋণও শোধ হ'ল বিনা প্রতিবাদে। ওকে কেউ কিছু বললে না—সবে রোগ থেকে উঠেছে; দ্বিতীয় কথা, হারানো ছেলে ফিরে এসেছে এতদিন পরে। দেখে শুনে মনে হয় যেন ওর অনুতাপ হ'য়েছে, রোগ আর দুঃখের আগুনে পুড়ে পুরানো আর্নেষ্ট খাঁটি সোনা হয়েছে। চোখের জলে ভেসে এমনি করুণ ক'রে নিজের পুরানো ইতিহাস বলে যে লুইসা কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে ওকে আশ্বাস দেয়: 'যা হবার হ'য়ে গেছে আর ভাবিসনে কিছু, সব ভুলে যা দেখি এখন!' মায়ের আদর

কাড়ার কৌশল আর্নেষ্ট ভালো ক'রে জানে। এককালে ক্রিসতফ একটু হিংসে ক'রত ; এখন ভাবে রোগা কোলের ছেলে, আদর করবেই তো মা। ওদের দুজনের মধ্যে বয়েসের তফাৎ সামান্য, তবু ক্রিসতফের স্নেহের রূপটা গভীর বাৎসল্যের। আর্নেষ্ট যেন ওর ভাই নয়, ছেলে। আর্নেষ্টও খুব মানে দাদাকে ; প্রায়ই দুঃখ করে দাদার কাঁধে এত বড় বোঝা। তার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু ক্রিসতফ ওর মুখ চাপা দেয়। আর্নেষ্টের চোখের দৃষ্টিতে ভারী বিনম্র সস্নেহ একটি কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে ওঠে। এমনি করে কর্তব্য শেষ করে আর্নেষ্ট। ক্রিসতফ ওকে যত উপদেশ দিক, ও তর্ক করে। দেখে মনে হয় যেন সে ছেলেই নয়, ভালো হ'য়ে এবার সত্যি কাজের ছেলে হবে।

ধীরে ধীরে ও ভালো হ'য়ে উঠল ; কিন্তু রোগোত্তর অবস্থাটার জের রইল বহুদিন। ডাক্তার রায় দিলেন অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে, সুতরাং এই ভাঙ্গা স্বাস্থ্যকে এখন জীইয়ে তুলতে হবে বহু যত্নে। অতএব থেকে যেতে হ'ল মায়ের কাছে। শোয় ক্রিসতফের বিছানায়, খায় তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জনের অন্ন, আর মায়ের সযত্ন নিপুন হাতের তৈরী চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়। যাবার নামও করেনা। ক্রিসতফ আর লুইসাও কখনো ও প্রসঙ্গ তোলে না। ভাই ভাইকে আর মা ছেলেকে ফিরিয়ে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

সুদীর্ঘ সন্ধ্যাটি ক্রিসতফের কাটে আর্নেষ্টের সঙ্গে। ধীরে ধীরে ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে ; হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয়। একজন কাউকে অন্ততঃ বিশ্বাস ক'রতে না পেলে ও যেন আর বাঁচতে পারছে না। আর্নেষ্ট চতুর ছেলে। ওর মন কাজ করে চোখের নিমেষে—অর্থাৎ একটু আভাসেই ও বুঝে নেয়। ওর সঙ্গে কথা ব'লে তাই ভালো লাগে ! কিন্তু চেষ্টা ক'রে বলতে গিয়েও,—ওর প্রেমের ইতিহাস মুখ ফুটে

বলতে পারে না। লজ্জায় কেবলি গলা বন্ধ হ'য়ে আসে। আর্নেষ্ট সবই জানে এ ব্যাপারের। কিন্তু মুখের ভাবে তার ছায়া পাওয়া গেলনা।

আর্নেষ্ট সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে গেল। একদিন বিকেল বেলা রাইন-নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়ল একটা হোটেলের ধারে। ভেতর থেকে ভেসে এল উচ্ছ্বসিত কলরব—রবি বাসরীয় পান-ভোজন, নাচ-গান-হল্লা চলছে। ভেতরে চোখে পড়ল চেনা মানুষ—ক্রিসতফ। য়্যাডা, মীরা সাথে রয়েছে। কোলাহলে মেতে রয়েছে ওরা। চোখা-চোখী হ'য়ে গেল। ক্রিসতফের মুখ লজ্জায় ঝলসে উঠল। বুদ্ধিমান আর্নেষ্ট বুঝতে দিলেনা ও দেখেছে—পাশ কাটিয়ে চ'লে এল।

ক্রিসতফ বিব্রত হ'য়ে পড়ল। সঙ্গীদের সম্বন্ধে যেন আরো তীব্র ভাবে সচেতন হ'য়ে উঠল। ছোট ভাই এই সঙ্গীদের সাথে ওকে দেখল। এর পর আর্নেষ্টকে আর ও কোন অধিকারে বিচার করবে! সে অধিকার ওর খোয়া গেল। সাথে সাথে বড় ভাই-এর কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে নিজের চোখেই নেমে গেল।

রাতে শুতে এসে ক্রিসতফ ভাবলে নিশ্চয়ই আর্নেষ্ট প্রসঙ্গটা তুলবে। ওর বুক কাঁপতে লাগল। ভয়ে ভয়ে প্রতীক্ষা ক'রতে লাগল। কিন্তু আর্নেষ্ট বুদ্ধি করেই কোন কথা তুললে না—ভাবলে দাদাই তুলবে। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ক্রিসতফ ঠিক ক'রলে আজ আর্নেষ্টের কাছে য়্যাডা আর ওর ব্যাপারটা খুলে বলবে। এত অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল যে আর্নেষ্ট-এর দিকে ও তাকাতে পারলে না। লজ্জায় গলার স্বর কেমন হ'য়ে গেল। আর্নেষ্ট-এর তরফ থেকে কোন সাহায্য এ'লনা; ওর দিকে তাকাল না পর্যন্ত সে। নিঃশব্দে অন্য দিকে চেয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিটা গোপনে রইল।

ওর দিকেই; এলোমেলো কথাগুলো প্রত্যেকটি কান পেতে শুনল, মনে মনে হাসল। য়্যাডার নামটা কিছুতেই মুখে আনতে পারে না ক্রিসতফ; বিনা নামের যে ছবিখানি মুগ্ধ ভাষার তুলিতে আঁকলে তা য়্যাডার ছবি হ'লনা, হ'ল প্রেমিকের হাতে আঁকা প্রিয়ার ছবি। প্রিয়ার নাম না ধরলেও, ওর প্রেমের কাহিনীটি ব'লে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে গভীর ভালোবাসায় হৃদয় উঠল উথলে, ওকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই বান-ডাকা স্রোত। তার উত্তাল তরঙ্গের আবর্তে উচ্ছৃত হ'ল ওর মর্মের বাণী :—ভালোবাসাই জীবনের রসায়ন। ওর এতদিনকার প্রেম-হীন জীবন কি জীবন ছিল! এখন প্রেমের প্রদীপ জ্ব'লেছে, ওর জীবনের আঁধার উঠেছে দীপ্ত হ'য়ে। জীবন তো জীবনই নয়, যদি প্রেম না থাকে আত্মার গভীরে। গম্ভীর ভাবে শুনলে আর্নেষ্ট, জবাব দিলে কৌশল ক'রে। জিজ্ঞাসা করলে না কিছু। অন্তরঙ্গভাবে দাদার হাতে ও হাত রাখল। সে স্পর্শ যেন বলে দিয়ে গেল আর্নেষ্টের মর্মেও একই সুর। এর পর জীবন ও প্রেম সম্বন্ধে হু'জনে অনেক আলোচনা হ'ল। ভাই ওকে এমন ক'রে বুঝবে, ক্রিসতফ এতটা আশা করেনি। আনন্দে ওর অন্তর ভ'রে উঠল। গভীর আলিঙ্গনে সেই আনন্দকে ভাষা দিয়ে ওরা শুয়ে প'ড়ল।

ক্রিসতফ এখন আর সব কথা আর্নেষ্টকে না ব'লে থাকতে পারেনা— যদিও এখনও লজ্জা যায়নি, এখনও সহজ হ'য়ে উঠতে পারেনি। আর্নেষ্টের ব্যবহারে ক্রমে ওর ভয় ভাঙ্গল, য়্যাডাকে নিয়ে যে অস্বস্তি ওর মনের মধ্যে নিরন্তর দংশন করছিল তাও ভাইয়ের কাছে আর গোপন করল না; কিন্তু য়্যাডাকে কোনো দোষ দিলেনা। দোষ দিলে ও নিজকে; ওর দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল,—য়্যাডাকে হারিয়ে ও বাঁচবে না।

য়্যাডার কাছেও আর্নেষ্টের কথা বলল—ওর কত বুদ্ধি, কত সুন্দর দেখতে, কিছুই বলতে ভুললে না।

য়্যাডার সাথে পরিচয় ক'রে দেবার জন্য একদিনও ক্রিসতফকে অনুরোধ করেনি আর্নেষ্ট। কিন্তু মুখ গুমরে ব'সে থাকে, কোথাও বেরয় না। কিছু ব'ললে বলে কোথায় কার কাছে যাবে, কেইবা চেনা আছে। রবিবার ক্রিসতফ য়্যাডাকে নিয়ে বেড়াতে বেরয়, কিন্তু মনের মধ্যে কেবলি খোঁচা বাজে, আর্নেষ্ট ঘরের কোণে বসে রয়েছে। কিন্তু প্রিয়-সান্নিধ্যটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ব্যর্থ হবে। বুঝছে বড় স্বার্থপরতা হচ্ছে। একদিন অগত্যা আর্নেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

য়্যাডার ঘরের সামনে সিঁড়ির গোড়ায় দুজনের পরিচয় হ'ল শিষ্ট অভিবাদনের বিনিময়ে। কায়ার ছায়ার মত যেখানে য়্যাডা সেখানে মীরা। আজও য়্যাডার সাথে সাথে মীরাও বেরিয়ে এল। আর্নেষ্টকে দেখেই বিস্ময়ে উঠল চীৎকার ক'রে। আর্নেষ্ট মৃদু হেসে এগিয়ে এসে মীরাকে সম্ভাষণ করল চুম্বন করে। মীরার অবাক লাগল না—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ ক'রল।

ক্রিসতফ অবাক হ'ল :

'কি হে আগে থেকেই চেনা আছে বুঝি ?'

'নিশ্চয়ই !' হাসতে হাসতে মীরা বলে।

'কবে থেকে ?'

'সে অনেক দিন।'

য়্যাডার দিকে ফিরে ব'লল : 'তুমি জানতে ? বেশ তো ! আমায় বলোনি কেন ?'

য়্যাডা ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দিলে : 'মীরার কি এক আধজন প্রেমিক আমি চিনব কি ক'রে সবাইকে ?'

মীরা রাগের ভান করে। এর বেশী কিছু ক্রিসতফ জানতে পারলেনা। মনটা কেমন মুষড়ে গেল। ভাবতে লাগল মীরা তো য়্যাডার কাছে কখনও কিছু গোপন করেনা। এ ব্যাপারটাই শুধু মীরা গোপন ক'রে গেছে, এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে? বেশ বোঝা যাচ্ছে, য়্যাডা ও আর্নেষ্টের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কেমন মনে হচ্ছে কি একটি ষড়যন্ত্র বাতাসে ভাসছে। ওরা ওকে ছলনা করেছে। কিন্তু কই ও তো পারলেনা কোনো অসত্যকে টেনে আনতে! ও সতর্ক হ'য়ে রইল। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না—সামান্য দুচারটে কথাই বললে ওরা। আর্নেষ্ট সারাদিন মীনার সঙ্গে কাটাল। য়্যাডার কথাবার্তা ক্রিসতফের সাথেই হ'ল। আজ যেন ওর ব্যবহারটা একটু বেশী মিঠে।

এখন থেকে আর্নেষ্ট ওদের দলের একজন। ও সঙ্গে থাকে, মোটেই ভালো লাগেনা ক্রিসতফের, অথচ মুখ ফুটে বলতে পারেনা সাহস ক'রে। আর্নেষ্ট সামনে থাকলে আসলে ওর লজ্জা করে; নয় তো এমনি কোনো সন্দেহের কারণ ঘটেনি। আর্নেষ্টও তার অবকাশ দেয়নি। বরঞ্চ মনে হয় ও মীরার সাথেই প্রেমে পড়েছে। য়্যাডার সাথে ওর ব্যবহার সংযত, সসম্মান ও শিষ্ট। এবং দেখা যায় য়্যাডাকে ও সযত্নে এড়িয়ে চলে। দাদার বান্ধবীকে ও যেন প্রাপ্য সম্মানটাই দিতে চায়। কিন্তু বাড়াবাড়িটাও চোখে লাগে। য়্যাডা অবাক হয়না অথচ সাবধান থাকে।

সেদিন অনেক দূরের পাল্লায় রওনা হ'ল সবাই এক সাথে। দু'ভাই আগে আগে চল্ল। য়্যাডা আর মীরা অল্প দূরে পেছন পেছন আসছে হাসতে হাসতে কি যেন ফিস ফিস ক'রে ওরা বলছে। কখনও বা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প'ড়ে কথায় মাতে। আর্নেষ্ট ক্রিসতফ থেমে

অপেক্ষা করে। কখনও ক্রিসতফ রাগ ক'রে না থেমে এগিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়ে কানে আসে হাসির শব্দ—তিনজনে মিলে খুব জমে উঠেছে; বিরক্ত হ'য়ে ফিরে আসে। জানতে ইচ্ছে হয় অত উচ্ছ্বাসের কারণটা কি, কিন্তু ও কাছে এলেই ওরা চুপ ক'রে যায়। কখনও বা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলে। জবাবে একটা ঠাট্টাই হয়ত শোনে। মেলার মধ্যে চোরের দলের মত ওদের পরস্পরের মধ্যে বেশ পাকা রকম যোগ-সাজস রয়েছে ব'লে মনে হয়।

খুব ঝগড়া হ'য়ে গেল য়্যাডার সাথে ক্রিসতফের। সারা দিন গুমট কাটল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—এমনি অবস্থায় অন্যদিনের মত আজ য়্যাডা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত ব্যবহার না ক'রে কেবল ক্রিসতফকে উপেক্ষা করল; ওকে যেন দেখতেই পায়নি। আর ওদিকে আর্নেষ্ট মীরার সাথে গলাগলি হ'য়ে রইল। যেন ঝগড়া-ঝাটির সাথে ওদের কোন সম্পর্ক নেই।

ক্রিসতফ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্‌গ্রীব। আজ যেন ওর প্রেম শত-ধারায় বইছে। আজ শুধু স্নেহ নয়—উদ্বেল প্রেম-প্রবাহের সাথে মিশেছে কৃতজ্ঞতা, মিশেছে অনুতাপ—প্রেমের অমিয়-ভাণ্ড হ'তে কত ঐশ্বর্য ঝ'রে পড়েছে জীবনের পর, কত সোনার মুহূর্ত ঝ'রে গেছে বৃথা কলহে, বৃথা অভিমানে আর হারাই হারাই ক'রে অহেতুক শংকায়। গভীর বেদনায় য়্যাডার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকায়। য়্যাডা দেখেও যেন দেখে না, কিন্তু হেসে ঢলাঢলি করে বন্ধুদের সাথে। য়্যাডার দিকে তাকিয়ে ক্রিসতফের চোখের সামনে ভিড় ক'রে এল অজস্র মধুর স্মৃতি—কত দিনের কত পরিপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার, কত বিপুল

ভালোবাসার। মাঝে মাঝে [এখনও রয়েছে] কি অপূর্ব সরলতায় ঝলমল ক'রে ওঠে ওর মুখখানা, হাসিখানি শুভ্র শুচি হ'য়ে ওঠে—, ক্রিসতফ নিজকেই শুধায়, তবে কেন ওদের সম্পর্ক আরো সুন্দর হ'য়ে উঠতে পেলনা, কেন খেয়াল দিয়ে আনন্দকে কেবলি হত্যা করে ওরা ? কেন য়্যাডা ওদের আলো-ঝরা অন্তরঙ্গতার মুহূর্তগুলোকে অমন ক'রে তু'হাতে মুছে ফেলতে চায়। কেন অস্বীকার করে অন্তরের সুন্দরকে! কেন পরুষ হাতে তাকে হত্যা করে! কাজে না হ'লেও চিন্তা দিয়েই বা প্রেমের শুচিতাকে তুপায়ে দলে ও কি শান্তি পায়! ক্রিসতফ ভালো ক'রে জানে বিশ্বাসই প্রেমের সব থেকে বড় নৈবেদ্য। বিশ্বাস নইলে প্রেম বাঁচে না। অতএব আবার চক্ষে লাগুক মোহাঞ্জন, আবার হোক স্বপ্নের আবাহন। আত্ম-তিরস্কার তীব্র হ'য়ে উঠল—ও নিজেই তো অন্যায় করেছে য়্যাডার 'পর—যত অসম্ভব সন্দেহ ক'রে। এত অনুদার ক্রিসতফ!

য়্যাডার কাছে গিয়ে কথা কওয়ার চেষ্টা ক'রল। য়্যাডা জবাব দিলে সংক্ষিপ্ত কাটা কাটা কথায়। বোঝা গেল ওর রাগ যায়নি। কিন্তু ক্রিসতফ ছাড়লে না। মিনতি ক'রলে একবার একটি মিনিটের জন্য অন্ততঃ একান্তে এসে ক্রিসতফের একটা কথা শুনুক য়্যাডা। অনিচ্ছায় মুখ ভার ক'রে য়্যাডা উঠে এল। সকলের দৃষ্টির আড়াল হ'তেই ওর হাত তুখানি ধ'রে মাটির পর নতজানু হ'য়ে ক্ষমা চাইলে ক্রিসতফ। ওর সাথে ঝগড়া ক'রে বাঁচবে না ও। বেড়ানো ওর কাছে বিস্বাদ হ'য়ে গেছে—সোনালী দিন হয়েছে আঁধার। য়্যাডার ঘৃণা কুড়িয়ে ওর জীবনে আনন্দ থাকবে কোথায় ? ও যে নিশ্বাসও নিতে পারছে না। য়্যাডার ভালোবাসা যে একান্ত ক'রে চাই ক্রিসতফের—সত্যি বড় অবুঝ হ'য়ে ওঠে ও মাঝে মাঝে, অত্যাচার ক'রে ফেলে। কিন্তু

ক্ষমা নেই কি তার! আর এ অপরাধ ওর নয়, ওর ভালোবাসার—। ভালোবাসে ব'লেই না থেকে থেকে অমন পাগল হ'য়ে ওঠে। ভালো-বাসে ব'লেই য়্যাডার মধ্যেকার অসুন্দর ওকে ব্যথা দেয়! ওর মধ্যে ও চায় উত্তমের প্রতিষ্ঠা। য়্যাডার বিগত দিনের যে-স্মৃতি আলোর অক্ষরে ওর বুকে লেখা হয়ে আছে তার মধ্যে অশ্লাঘ্য কোনো কিছুকেই ও স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। ক্রিসতফ স্মরণ করিয়ে দেয় ওদের প্রথম দেখার দিনগুলি, প্রথম মিলনের রাতটিকে। ওর ভালোবাসার মধ্যে তারা অমর হ'য়ে আছে! ও যে আজও ঠিক তেমনি ভালোবাসে—বাসবে শাশ্বত কাল, 'যেওনা য়্যাডা, আমায় ত্যাগ ক'রে যেওনা।' ওর সমস্ত খানি হৃদয় যেন আকৃতি হয়ে বলতে চায়ঃ ত্বমসি মম জীবনং—

য়্যাডা শোনে—ওর মুখে মৃদু হাসির রেখা, বুকের ভেতর অস্বস্তি—। তুষার বুঝি গ'লেছে। চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল, মেঘের ঘটা গেল মিলিয়ে। আমি ভালোবাসি এ বাণী দুলতে লাগল তার ব্যঞ্জনায়। সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'ল দুজনের অধর-স্পর্শে। পরস্পরকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওরা এগিয়ে গেল নিষ্পত্র বনের আড়ালে। ক্রিস-তফকে এখন বড় ভালো লাগছে য়্যাডার—এত আকুলতা! কৃতজ্ঞতায় ওর বুক ভ'রে উঠল। কিন্তু দুষ্টুমী জেগে রইল মনের মধ্যে। ছটফট করতে লাগল। মনও সরেনা, অথচ যে ফন্দীটি আঁটা হয়েছে তা কিছুতেই ছাড়তে পারলে না। কেন? কে বলতে পারে?—কথা দিয়েছে ব'লে কি? কে জানে তা? হয় ভেবেছে বন্ধুকে ঠকিয়ে একটু মজা করা যাবে, আমোদের আসর জমবে ভালো, প্রমাণও হ'য়ে যাবে তার কাছে, ওর নিজের কাছে, যে ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। ক্রিসতফকে খোয়াতে ও চায় না। সে-কথা কল্পনায় নেই। বরঞ্চ মনে হয় ওদের সম্পর্কের ভিৎটা আজ আরো পাকা হয়েছে।

সবাই বনের একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুল। দুটো রাস্তা। ক্রিসতফ একটা রাস্তা দিয়ে চলল--আর্নেষ্ট বললে, দ্বিতীয়টি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। য়্যাডা আর্ণেষ্টের কথা সমর্থন করে। ও-রাস্তায় ক্রিসতফ বহুবার গেছে—অতএব ওটা ওর মুখস্থ। কাজেই জোর ক'রে বললে ওদের ভুল হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মানলে না ওরা। ঠিক হ'ল দুটোকেই পরখ ক'রে দেখা যাক। বাজী রাখা হল। য়্যাডা আর্নেষ্টের দিকে গেল। মীরা ক্রিসতফের পক্ষ নিলে। অতএব ক্রিসতফের সাথেই রইল ও। যথারীতি ক্রিসতফ খেলাটাকে খেলাচ্ছলে না নিয়ে নিলে সত্যিকার গুরুত্ব দিয়ে। যাই হোক হারা চলবে না; পা চালালে জোর কদমে। মীরা তাল রাখতে পারে না, যেন চায়ওনা। যেন গা নেই ওর। শান্ত বিদ্রূপের স্বরে ডেকে বললে:

'অত তাড়াহুড়ো করোনা, আমরা জিতবই দেখে নিও।'

ক্রিসতফ যেন একটু দমে যায়: 'তা বটে, বড় বেশী জোরেই হাঁটছি।' চলার গতি শ্লথ হয়। বলে, 'কিন্তু ও গুলোকে আমি তো জানি, আগে পৌঁছুবার জন্য ঠিক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারবে দেখো।' মীরা হেসে লুটিয়ে পড়ে, 'কখনও না, তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর তো!'

ক্রিসতফের বাহু নিজের বাহুতে জড়িয়ে মীরা যেন সেঁটে রইল ওর সাথে। ও কিছু বেঁটে। হাঁটতে হাঁটতে কোমল চোখ দুটি ক্রিসতফের দিকে তুলে ধরে। এমনিতেই ওর চেহারায় রূপের সাথে মাদকতা আছে। কিন্তু এক মুহূর্তে তার ওপর কি যে রং-এর ছোপ লাগল—ক্রিসতফ যেন চিনতে পারলে না ওকে। সাধারণতঃ মীরার মুখ ফ্যাকাশে এবং ফোলা-ফোলা। কিন্তু সামান্যতম উত্তেজনার বা খুশির কারণ ঘটলে বা মনের মধ্যে কোনো কৌতুক অথবা কাউকে খুশি করবার ইচ্ছা হলেই—ওর চেহারা যেন যাদু-মন্ত্রে একেবারে বদলে

যায়, কোথায় যায় সেই নিষ্প্রভতাঃ নিমেষে গালে ঢেউ জাগে গোলাপীর, চোখের চারপাশের কুঞ্চন মুহূর্তে মসৃণ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল সৌকুমার্যে, চোখের দৃষ্টিতে বিজুলী নাচে। সমস্ত মুখখানার বয়স যেন বহু বছর পিছিয়ে এক অনুপম তারুণ্যে আর আত্মিক বিভায় একেবারে নূতন হয়ে ওঠে। ও আলো য়্যাডার মুখে দেখা যায় না। ক্রিসতফ অবাক হ'ল এই আকস্মিক রূপান্তরে। চোখ ফিরিয়ে নিলে। মীরার সাথে একলা একলা ওর ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ল। মীরা ওকে আরো বিব্রত ক'রে তুলল তার দুষ্টুমী দিয়ে। ও স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যায়, মীরার উপদ্রবে স্বপ্ন কেবলি ভাঙ্গে। মীরার কথা ওর কানে যায় না, যাও বা যায় জবাব দেয় না; যাও বা দেয় ছেঁড়া ছেঁড়া অসংলগ্ন। ক্রিসতফ ভাবছে—ভাবতে চাইছে কেবল য়্যাডাকে; চাইছে তার চিত্তের অসীম আকাশ ভরে তুলুক ওই মেয়ে। তার চোখের করুণা, তার হাসি, তার চুম্বনের মধু ওর চেতনায় অমৃত ঢেলে দেয়, হৃদয় ভালো-বাসায় ছেয়ে যায়। মীরা ওর দিক ভোলায়, মনকে বাইরে টানে—স্বচ্ছ আকাশের পটে নিষ্পত্র বৃক্ষ-শাখার সূক্ষ্ম রেখা-চিত্র—দেখো ক্রিসতফ, দেখো কি চমৎকার! চমৎকার! সত্যি চমৎকার। মেঘ চ'লে গেছে, হারানো য়্যাডা ফিরে এসেছে; দুজনের মাঝখানে যে তুষার-প্রাচীরখানি ছিল, ক্রিসতফ ওর বুকের উষ্ণতা দিয়ে তা গলিয়েছে। ফিরে এসেছে প্রেম, তাই তো ফিরে এল প্রাণ আর তার গান; তাই তো সুন্দর হলো ভুবন! নিকটে হোক দূরে হোক, হৃদয় ওদের মিলেছে এক মন্দাকিনী-ধারায়। স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। ওর সমস্ত বুকখানি একেবারে লঘু হয়ে গেছে পালকের মত। য়্যাডা ফিরে এল—ফিরে এল—তাই তো বাতাস এত লঘু—অনুভূতি-গ্রাহ্য প্রতি বস্তু প্রিয়াকে একেবারে বুকের মাঝখানটিতে নিয়ে আসে—দিনটা যেন একটু

ভেজা ভেজা—ঠাণ্ডা লাগবে না তো ওর? তুহিন-ঢাকা গাছগুলি কি সুন্দর হয়েছে। বেচারা য়্যাডা দেখতে পেলেনা…।

বাড়ীর কথা মনে পড়ে। পা চালিয়ে দেয় সামনের দিকে। খেয়াল রাখে পথটি যেন না হারায়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে ও উল্লাসে চীৎকার করে উঠল :

'আমরা আগে এসে গেছি।'

আনন্দে ও টুপী তুলে নাড়তে লাগল। মীরা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। জায়গাটা হল বনের মাঝখানে ছোট একটা খাড়া পাহাড়। ওপরটা সমতল ; বাদাম আর খাটো খাটো ওক গাছের সারিতে ঘেরা। তারি ফাঁকে ফাঁকে পর্বত-গাত্রের শ্যাম-শষ্পরাজির উপর দিয়ে দেখা যায় বেগুনী রংএর কুহেলী-অবগাহী পাইন-শীর্ষ আর রাইন নদীর বিসর্পিল নীল রেখা। সারা বন-ভূমি নিস্তব্ধ—একটা পাখীরও ডাক নেই ; না একটু বাতাসের শিরশিরাণী, না অন্য কোনো শব্দ। শান্ত শুদ্ধ শীতের দুপুর কোয়াশায় ঢাকা সূর্যের ক্ষীণ উত্তাপে স্নিগ্ধ। ওদিক থেকে উপত্যকা-গামী রেলের বাঁশীর তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে নিস্তব্ধতা যেন ফেটে চৌচির হচ্ছে। ক্রিসতফ পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওদিকের গ্রামটার দিকে চেয়ে। মীরা সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে পাহাড়া দেয়।

'দেখছ, কুঁড়েগুলোর রকমটা? আমি তখনই বলেছিলাম। যাক গে এখানেই অপেক্ষা করি।' বলে ফাটা এবড়ো খেবড়ো মাটির ওপর রোদে দেহ মেলে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

টুপীটা খুলতে খুলতে মীরা বলে : 'হুঁ, অপেক্ষাই করা যাক। ওর স্বরে যেন কি একটা রহস্য। ক্রিসতফ মাথা তুলে ওর দিকে তাকায়।

'কি হলো?' মীরা জিজ্ঞাসা করে শান্তভাবে।

'কি বল্লে তুমি?'

'বললাম সেই ওদের জন্য বসে থাকতেই হল। মিছামিছি আমাকে দৌড় করালে বাপু।'

'তাই তো দেখছি।'

মাটির ওপর শুয়ে শুয়ে ওরা প্রতীক্ষা করে। মীরা একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে ভাঁজে। ক্রিসতফও সাথে সাথে গায় কিন্তু বারে বারে থেমে থেমে কান পাতে।

'বোধ হয় ওরা আসছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন।'

মীরা গান গেয়েই চলে। ক্রিসতফ আর চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে পারলে না।

'শুনছ, ওরা নিশ্চয় রাস্তা হারিয়েছে।'

'রাস্তা হারাবে? পাগল! প্রতিটি রাস্তা আর্নেষ্টের মুখস্থ।'

ক্রিসতফের হঠাৎ মনে হয়: 'ওরা আমাদের আগেই এসে চ'লে যায়নি তো?'

মীরা চিৎ হয়ে শুয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক দুর্দান্ত হাসিতে ও ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রিসতফ কারণটা শোনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ভাবলে আর্নেষ্ট আর য়্যাডা স্টেশনেই চলে গেছে। ও উঠে দাঁড়াল!

'তোমার কপালে হার আছে। কেন! স্টেশনে যাওয়ার কথা তো নেই। এখানেই সকলে এসে জুটবে, এমনি কথাইত ছিল।'

ক্রিসতফ মীরার পাশে এসে ব'সল। ওর ব্যস্ততায় মীরার ভারী মজা লাগছে। ক্রিসতফ বেশ বুঝতে পারছে মীরার দৃষ্টিতে কি একটা কৌতুক কিলবিল করছে। সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল ও। এখনও পর্যন্ত ওর মনে কোনো রকম সন্দেহ আসেনি। উঠে দাঁড়াল,

—নীচে নেমে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখবে। মীরা কি জানি একটু ব'লল, বোঝা গেল না। পকেট থেকে কাঁচি সূঁচ সুতো বের ক'রে নিশ্চিন্ত মনে টুপীর পালকগুলো সেলাই ক'রতে লাগল একেবারে গুছিয়ে ব'সে, যেন সারা দিন আর উঠতে হবেনা। বললে :

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ওদের আসবার ইচ্ছে থাকলে নিজেরাই আসত।'

ক্রিসতফের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন ধাক্কা লাগল। ফিরে তাকাল মীরার দিকে—কিন্তু মীরা তখন কাজে ব্যস্ত। উঠে কাছে গেল মীরার। ক্রিসতফ ডাকে :

হাত না থামিয়ে জবাব দেয় মীরা : 'কি ?'

ওকে ভালো ক'রে দেখবার জন্য ক্রিসতফ নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়ে মাটিতে। 'মীরা ?' আবার ডাকে।

এবারে হাত থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে মীরা বলে : 'কি হ'লো আবার ?'

ক্রিসতফের মুখের দিকে তাকায় মীরা, ওর দৃষ্টিতে বিদ্রূপ। 'মীরা—' ধরা গলায় ক্রিসতফ বলে : 'বলতো তোমার কি মনে হয়— ?' মীরা ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে আবার নিজের কাজে মন দেয়। ক্রিসতফ ওর হাত ধরে ফেলে, টুপীটা হাত থেকে কেড়ে নেয় : 'ও সেলাইটা রাখ না একটু ! দোহাই তোমার রাখো ; যা জিজ্ঞাসা করি বল—।' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মীরা ওর দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে। ক্রিসতফের ঠোঁট থর থর ক'রে কাঁপে।

খুব আস্তে আস্তে ক্রিসতফ বলে : 'তোমার কি মনে হয় আর্নেষ্ট আর য়্যাডা—'

মীরা হাসে ! 'কি জানি বাপু—তা হ্যাঁ—'

ক্রিসতফ চমকে ওঠে রেগে : 'না না কক্‌খনও না, হ'তে পারে না ! মিছে কথা বলছ আমায় চটাবার জন্য—না—না—'

ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে মীরা প্রবল ভাবে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। 'নাঃ আচ্ছা মোটা মগজ তো—!'

ক্রিসতফ ওকে ধ'রে জোরে একটা ঝাঁকানি দেয় : 'হেস না, কেন অমন ক'রে হাসছ ? সত্যি হলে আর হাসি বেরুত না। আর্নেষ্টকে তুমি তো ভালোবাস !'—মীরার হাসি থামে না। ক্রিসতফকে কাছে টেনে এনে চুমু খায়। ভেতর থেকে প্রতিবাদ আসা সত্ত্বেও মীরার চুম্বন ও ফিরিয়ে দিতে যায়। কিন্তু উত্তপ্ত ঠোঁট দুটির স্পর্শ এসে লাগতেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় মীরাকে—আর্নেষ্টের চুম্বনের উষ্ণতা এখনও লেগে আছে ওর ওষ্ঠে···। বলে : 'নিশ্চয়ই তুমি জানতে, আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করে রেখেছ—'

'করেছিই তো।' হাসে মীরা।

ক্রিসতফ চীৎকার করলে না, রাগের কোনো ব্যঞ্জনা দেখা গেল না মুখে। কেবল ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'য়ে রইল যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ বন্ধ হ'য়ে এল, হাত দু'টি বুকের ওপর এসে বসল শক্ত হয়ে। হৃদপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হ'য়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। হতাশা আর ঘৃণার উন্মত্ত ঢেউ যেন নির্মমভাবে আছড়াতে লাগল। ওর দেহ মন তার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে লাগল।

মীরার মন নবনী নয়, কিন্তু তবু ও এ দৃশ্যে কঠিন থাকতে পারল না। কোথা দিয়ে যেন মাতৃ-স্নেহে হৃদয় ভ'রল ; ক্রিসতফের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, অত্যন্ত কোমল স্বরে স্নেহে গ'লে গিয়ে ওকে বোঝাতে লাগল। স্মেলিং সলট্‌-এর শিশিটা ধ'রল ওর নাকের কাছে। ভয় পেয়ে শিউরে ও ছিটকে উঠে পড়ল এমনি হঠাৎ ও এমনি এক ঝটকায়

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মীরাকে, ও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ক্রিসতফের প্রতিহিংসা নেবার না ছিল প্রবৃত্তি না ছিল শক্তি। তীব্র বেদনা-বিকৃত মুখে নিঃশব্দে কেবল ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

মথিত স্বরে বলল, 'শয়তানী! আমার কি যে সর্বনাশ করলে, জানোনা এখনও—'

ধ'রে রাখতে চেষ্টা করে মীরা। হাত ছাড়িয়ে ছুটে বনের মধ্যে ও চ'লে গেল প্রবলভাবে থুথু ফেলতে ফেলতে। যে-অপরিসীম ঘৃণা আর অপমান ওর সর্ব সত্তাকে বিষ-জর্জর ক'রে তুলেছে, ওই থুথুর সাথে ও যেন তাই উগরে ফেলতে চায়। আজ ওকে অনাচারে লিপ্ত করতে চেয়েছিল ওরা, টেনে নামিয়েছে পচা পাঁকে ; ওর ভেতরটা অবধি যেন পাঁকে ভ'রে গেছে। ও ফুফিয়ে কেঁদে উঠল—সর্ব শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। কি একটা বিকট ভয়ে ও যেন কালো হয়ে গেল – ওদের সবাইকে আজ ওর ভয় করছে ; ভয় নিজকে, নিজের দেহকে, আত্মাকে। ঘৃণার এক প্রবল তুফান যেন সমস্ত আড়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়ল অসংযত উন্মত্ততায়। বহুদিন থেকেই এ ঝড়ের গর্জন শোনা যচ্ছিল অন্তরের গভীরে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যে-ক্লেদ যে-গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে ওর দিন গেছে—যে-হীনতা, যে-অপমানের সাথে ওকে নিরন্তর আপোষ করতে হয়েছে—ওর মনে হ'য়েছে সমস্ত আবহাওয়ায় পূতি-গন্ধ, পোকা কিলবিল করছে। বিদ্রোহ জেগেছে…সেই বিদ্রোহে, আর প্রতিক্রিয়ার আঘতে এক দিন না একদিন আগল ভাঙ্গতোই। কিন্তু ক্রিসতফ বুক ভ'রে ভালোবাসতে চেয়েছিল—তাই ভালোবাসার পাত্রী সম্বন্ধে জেনে শুনেই মরীচিকাকে লালন করেছিল। তাই সংকট এত দিন ঠেকেছিল কোনো মতে। কিন্তু আজ আর ঠেকাবে কিসের

জোরে? নিমেষে কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল—আর হ'য়ে ভালোই হ'ল—কঠোর শুচিতার তুষার-জমান দমকা হাওয়ার ঝটকায় যত পূতি-গন্ধ, যত ক্লেদ, যত গ্লানি বেবাক উড়ে গিয়ে আকাশ একেবারে স্বচ্ছ হ'য়ে উঠল। ঘৃণার এক আঘাতে য়্যাডার প্রতি ভালোবাসার মৃত্যু হ'ল।

য়্যাডা হয়তো ভেবেছিল ওই নোংরা হাতে টেনে ও রাখবে ক্রিসতফকে হাতের মুঠোয় পুরে; ভুল করেছিল য়্যাডা। চেনেনি ও-ছেলেকে, দিতে পারে নি তার যোগ্য মূল্য। বরঞ্চ আজ আবার প্রমাণ হ'য়ে গেল যে-দাম ও তাকে দিয়েছিল তা কাঁচ-মূল্যের চেয়েও হীন। হিংসে জাগিয়ে বাঁধা যায় হীনের মন—ক্রিসতফের মত শুচি-শুদ্ধ, তরুণ মানসের মর্যাদা নয়। তাই আজ বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে ধক্ ধক্ ক'রে। শুচিতার ত্রিনয়নে। ক্রিসতফ বুঝতে পারছে, য়্যাডার আজের এই বিশ্বাস-ঘাতকতা ভাব-প্রবণতায় নয়, নারী-সুলভ অহেতুক খামখেয়ালীতেও নয়। কত সময়ই তো কত অন্যায় খেয়াল ওদের, বুঝেও ঠেকাতে পারে না। তবে কেন? কেন? কেন এই অপরিচ্ছন্ন নির্মমতা! বুঝেছে ক্রিসতফ—ওকে মাটির ধূলায় টেনে নামাতে চেয়েছিল য়্যাডা, চেয়েছিল অপমান করতে—ওর নীতি-নিষ্ঠাকে নোংরা হাতে ভাঙ্গতে চেয়েছিল, চেয়েছিল দু'পায়ে দলতে, ওর ব্রত ভঙ্গ ক'রতে, ওকে শাস্তি দিতে—দশের স্তরে নামিয়ে আনতে—ওর উন্নত মর্যাদাকে ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিতে। য়্যাডা চেয়েছিল দেখাবে ক্রিসতফকে কত বড় ওর পৈশাচিকী শক্তি, আর কত বড় তার মহিমা। ক্রিসতফ এত বড় হীনতাকে ক্ষমা করতে পারলে না। পারবে না। ভয়ে পাংশু হ'য়ে যায়—পাঁকের প্রতি কিসের এ-টান মানুষের? অধিকাংশ

মানুষ পাঁকে লুটায়—আর পাঁক ছিটায়—শুভ্র থাকতে দেবে না কাউকে—দেবে না কাউকে শুচি থাকতে। শুকর-বৃত্তি ওই মনুষ্য-রূপী জীবের দল—কি উল্লাস ওদের পাঁকে গড়িয়ে—সর্বাঙ্গে পাঁক মেখে তবে ওদের সুখ! কেন এমন হয়? কেন? কে দেবে এর জবাব?

য়্যাডা দু'দিন ক্রিসতফের পথ চেয়ে ব'সে রইল। কিন্তু সে এল না। উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল ও। ভারী নরম ক'রে একখানা চিঠি লিখল—সেদিনের ব্যাপারের কোনো উল্লেখ ক'রল না। জবাব দিলে না ক্রিসতফ। দিতে পারলে না। অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ করবার মত ভাষা খুঁজে পেলে না। জীবন-মূল থেকে ও য়্যাডাকে একেবারে উৎপাটন করেছে। য়্যাডা নেই, কোথাও নেই। ক্রিসতফের কাছে সে সম্পূর্ণ মৃত আজ।

ক্রিসতফ য়্যাডার বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে। কিন্তু পেলে না নিজের কাছ থেকে। একান্ত ভাবে ফিরে যেতে চায় স্বপ্নাবিষ্ট সেই অতীতে—খুঁজে ফেরে কোথায় বিগত-দিনের সেই শুভ্র প্রশান্ত বলিষ্ঠতা। কিন্তু আর ফেরবার পথ নেই! বৃথাই ফিরে ফিরে চাওয়া! চেয়ে দেখ, তোমার চলতি পথের দুধারে বিলীয়মান জগৎ—যে-জগৎ তুমি এসেছ পেছনে ফেলে, পথ চলতে চলতে ক্লান্ত দেহে যে-গৃহের আশ্রয়ে একদা রজনীতে ছিলে নির্ভর-প্রসুপ্ত, সে গৃহের অগ্নি-শালার ধূম-কুণ্ডলী ওই দেখ আকাশে উঠে বিস্মৃতির কোয়াশাচ্ছন্ন দিগ্‌বালের ওপারে মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে সবই মিলিয়ে যাবে···হারিয়ে যাবে···চলে যাবে বহু দূরে···। কিন্তু ক'দিনের জন্য জীবনে এসেও ব্যক্তি আর মানসে প্রেম যে-ব্যবধান রচনা করে তার বুঝি সীমা নেই। সেই দূরের বুকে হঠাৎ যেন আসে পথের বাঁক

দেশান্তরের নিশানা নিয়ে, সেই বাঁকে দাঁড়িয়ে পেছনের মাটিকে একেবারে চিরবিদায় জানিয়ে যায় মানুষ।

কিন্তু ক্রিসতফ কিছুতেই যেন পারছে না এমনি ক'রে অনিবার্যের সামনে মাথা পেতে দিতে। অতীতের দিকে আকুল হয়ে হাত বাড়ায় - অতীতের সেই ক্রিসতফ, নিরালা নিদ্বন্দ্বী ক্রিসতফকে, ক্রিসতফের পুরানো আত্মাকে উদভ্রান্ত হয়ে খোঁজে। কিন্তু কোথায় পাবে? সে কি আছে? মুস্কিল প্রেম নিয়ে নয়—যে ধ্বংস-স্তূপ সে পেছনে রেখে যায়—তাই নিয়ে। ক্রিসতফ প্রেমকে বর্জন করল—ক্ষণেকের জন্য মুখ ফেরাল ঘৃণায়। কিন্তু বৃথা। প্রেমের নখর-চিহ্ন ওর চিত্ত জুড়ে; প্রেমে ওর চেতনার কোষ কোষ সম্পৃক্ত। হৃদয়ে যে শূন্যতা—কান পেতে যেন শোনা যায় তার হাহাকার। ওই শূন্যতাকে পূর্ণ না করলে নিস্তার নেই। যে-মানুষ একবার স্নেহের স্বাদ পেয়েছে, পেয়েছে ভোগের স্বাদ, প্রেম নইলে তার জীবন মরু-ভূমি। জীবনকে জীইয়ে রাখতে হলে তার চাই স্নেহ, চাই সম্ভোগের উপকরণ, আর চাই তার সাথে আবেগ—হোক না সে একেবারে বিপরীত-ধর্মী—হোক ঘৃণা, হোক গোঁড়ামী, হোক আর কিছু। কিন্তু ক্রিসতফের বুভুক্ষু হৃদয়ের কতটুকু খাদ্য মিলবে বিরুদ্ধ ভাবাবেগের মধ্যে! ওর জীবনটাই প্রবল প্রতিক্রিয়া পরম্পরার অশ্রান্ত ঢেউএর বিক্ষোভ—কেবলি এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছিটকে পড়া। কখনও দেখবে ওর আবেগ ছুটেছে দিশে-হারা পাগলামোর পথে—ছাড়বে খাওয়া—এমন কি জলটুকুও ছোঁবে না, শুধু শুধু হেঁটে হেঁটে দেহকে করবে ক্ষয়, রাতের ঘুম অবধি বিসর্জন দিয়ে অনর্থক পরিশ্রম করবে - অর্থাৎ, দেহের সর্বপ্রকার আরাম আর আনন্দ কেড়ে নিয়ে করবে অমানুষিক কৃচ্ছ্র -সাধন। আবার কখনও কোমর কষে লাগবে শক্তি-সাধনায়—শক্তিতেই নাকি ওর

স্তরের মানুষের আসল চরিত্র। এবং ছুটবে তখন স্ফূর্তির সন্ধানে। যাই হোক কোথাও সুখ মেলে না। ও এখন আর একা থাকতে পারে না। আবার একা না হলেও বাঁচে না।

বাঁচতে পারত একমাত্র যদি খাঁটি সুহৃদ পেত—হয়তো বা রোজাই একমাত্র বাঁচাতে পারত ওকে। কিন্তু রোজাদের সাথে প্রায় মুখ দেখাদেখি নেই। দেখাও হয়নি সেই থেকে আর। একদিন মাত্র ক্রিসতফ দেখেছিল রোজাকে। সন্ধ্যাবেলা গির্জা থেকে ফিরছিল রোজা। ক্রিসতফ ইতস্তত করছিল সম্ভাষণ করবে কিনা। রোজাও ওকে দেখে কাছে আসার জন্য যেন পা বাড়াতে গেল—সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ভক্ত-বৃন্দের স্রোত, সেই ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে এগিয়ে আসতে গিয়ে ও দেখল রোজার চোখ অন্যদিকে ফিরে গেছে। এবং কাছে এলে সে ঠাণ্ডা রকম একটা ছোট্ট নমস্কার ক'রে এগিয়ে গেল কঠিন পায়ে। ক্রিসতফের মনে হল রোজার বুকের ওপর দুর্জয় ঘৃণা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে আছে। ওর জন্য ভালোবাসার একটি কণাও নেই সেখানে। হয়ত রোজা ওকে ভাবছে চরিত্রহীন, লম্পট, এবং এই লম্পটকে ভালোবেসে সে একদা যে বোকামী করেছিল হয়ত তাই নিয়ে আড়ালে বসে হাসছে। হয়ত ওকে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে মনের প্রান্ত হতে বহুদূর। সুতরাং পরস্পরের কাছে ওরা ফুরিয়ে গেছে। হয়ত ভালোই হয়েছে দুজনের পক্ষে। রোজা মেয়ে ভালো সন্দেহ নেই, গুণও আছে। কিন্তু কাছে এসে হাত ধরে চোখে চোখটি রেখে বলতে পারে 'বন্ধু তোমায় আমি চিনেছি—' কোথায় ছিল সে-ঐশ্বর্য ওর! বুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে ওর সাথে যদি বা নীড় বাঁধতো, আনন্দ-বেদনা-হীন নিতান্ত সাধারণ জীবনের নির্ঘাত নিষ্কম্প স্থির পল্বলে মুখ থুবড়ে ওকে আঁকু-পাঁকু করতে হ'ত—মাখতে হ'ত "নিশি নিশি

রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র-শিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি।" কষ্ট পেত দুজনেই। সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে যে বিচ্ছেদ ঘটল তা হয়তো বা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদই। প্রায়ই—প্রায়ই কেন? সর্বদাই। বলিষ্ঠের বুকে আঘাত হেনে দুঃখ-দেবতা এমনি প্রসাদই ছড়ান।

কিন্তু দুঃখটা যখন এসেছিল তখন তো দুজনেরই বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল, কাঁদিয়েছিল দুজনকেই। বিশেষ ক'রে ক্রিসতফকে। কিন্তু ধর্ম-বুদ্ধি প্রসূত হ'লেও রোজাদের উগ্র সংকীর্ণতা, পর-মত-অসহিষ্ণুতা, বিবেক-বুদ্ধি দয়া-মায়া কেড়ে নিয়ে মানুষকে দানব ক'রে তোলে। ও সহ্য করতে পারেনি, ওকেও আঘাতে আঘাতে ক্ষিপ্ত ক'রে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাইতো বিদ্রোহে বিক্ষোভে ও মুক্ততর আকাশের খোঁজে ডানা দিয়েছিল মেলে।

য়্যাডাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয় ক্রিসতফের। নিষ্কর্মা ভবঘুরে জাতীয় হলেও এদের সহজ ব্যবহার ও নির্বিকার স্বভাব ওর মন্দ লাগেনি। এদের মধ্যে একজন ছিল ফ্রীডম্যান। অর্গ্যান্ বাজায়; বয়স ত্রিশের কোঠায়; কিছুটা বুদ্ধি আছে, আর বাজানর হাত ভালো—কিন্তু বেহদ্দ অলস, না খেয়ে মরলেও ন'ড়ে চ'ড়ে বিদ্যেটাকে একটু ঘ'সে মেজে ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না। যারা খেটে পিটে বেঁচে থাকে তাদের কুৎসা গেয়ে ও কেমন একটা সান্ত্বনা পায়। ওর চুট্‌কীগুলো একটু ওজনে ভারী হ'লেও সঙ্গীদের অজস্র হাসায়। সঙ্গীদের চেয়ে ওর সাহস বেশী—তাই ও উচ্চ-পদস্থদের বিদ্রূপ করে [ভেতরে ভেতরে যে ভয় পায় না তা নয়] চোখ মুখ ভাষার নানা রকম ব্যক্ত অব্যক্ত ইশারায়। সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজের কোনো ধারণা নেই; কিন্তু নাম-করা সঙ্গীত-কুশলীদের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করে জোর গলায়। বলে—ওদের

খ্যাতিটা মেকী। স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে ও নির্মম—নারী-দ্বেষী কোন এক সন্ন্যাসীর কথা ধার ক'রে ও তাদের গাল দেয়। ক্রিসতফের ভারী মজা লাগে।

পরিবর্তনের বর্তমান অধ্যায়ে ক্রীডম্যানের কাছে প্রায়ই আসে ক্রিসতফ। ওর সঙ্গে কথা-বার্তায় অনেকটা ভুলে থাকে। কিন্তু বিচার বুদ্ধি কখনও খোয়ায়নি; ক্রীডম্যানের ইতর হাসি-ঠাট্টা ওর বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। এবং দুদিন না যেতেই ওর এল বিরক্তি। চোখে প'ড়ল যা-কিছু ভালোকে নিরন্তর মুখ ভ্যাংচানো আর অস্বীকার করার বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু ফিলিষ্টাইনদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুস্থির জীবন-ধারাকে ওর মনে হয় স্রেফ বোকামী। তাই তাদের বিরুদ্ধে ওর বিদ্রোহ। সুতরাং ক্রিসতফের চোখ খুলে যাওয়া সত্বেও এবং ক্রীডম্যানকে আন্তরিক ঘৃণা করলেও ওর ইতরামীগুলিই আজ ওর একমাত্র ভুলে থাকবার উপকরণ। তাই সন্দেহজনক চরিত্রের গোত্রহীন অনুচর-পরিবৃত ক্রীডম্যানএর সাথে সর্বদাই ওকে দেখা যায়। ওরা সারা সন্ধ্যা কাটায় জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, কোলাহল ক'রে। হঠাৎ তামাকের আর খাদ্য-দ্রব্যের গন্ধে ও ঘুম থেকে জেগে ওঠে—শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকের মানুষগুলির দিকে চায়—কাউকে যেন চিনতে পারে না—বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে—যেন একটা কান্না ওঠে হাড় পাঁজর ভেদ ক'রে :

'এ কোথায় এসেছি আমি? কারা এরা? এদের সাথে আমার সম্বন্ধই বা কি?'

ওদের হাসি, ওদের টিপ্পনীতে ওর ভেতরটা অত্যন্ত পীড়িত বোধ হয়; ত্মক্কার আসতে চায়। কিন্তু এদের সংসর্গ ছেড়ে আসার মত জোরও পায়না মনে; ওর ভয় করে বাড়ী যেতে—সেখানকার নির্জন

নৈঃসঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াবে এসে ও আর ওর আত্মা ; ওর কামনার দল আর ওর পীড়িত বিবেক ; এদের সামনে একা ওর ভয় করে। ও জানে ও জাহান্নামে যাচ্ছে—এবং যাচ্ছে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে পথ কেটে। ক্রীডম্যান···কে ক্রীডম্যান? ক্রিসতফ যা হয়েছে ও ক্রিসতফ যা হবে··· নরক-বিলাসী ক্রিসতফের বীভৎস বিকৃতির প্রতিরূপ ওই ক্রীডম্যান··· ক্রীডম্যান ক্রিসতফেরই ছবি···নিষ্ঠুর উলঙ্গ স্পষ্টতায় চোখের সামনে সত্য উদ্ঘাটিত হয়···কিন্তু এই সম্ভাবিত ভয়ংকর সত্যের আঘাতও ওর মোহাবরণ ঘুচিয়ে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে না—ওর শক্তি হরণ ক'রে, বিরসতায় বিষিয়ে ওকে টানতে চাইলে একেবারে মাটির ধূলায়।

পারলে ও সত্যি যেত জাহান্নামে। কিন্তু ক্রিসতফের মত মহা-স্রষ্টিদের ধ্বংশ নেই। ওদের রক্ষা-কবচ আছে,—ক্রিসতফেরও আছে। এ বস্তু অন্যের নেই। ওর শক্তিই ওর রক্ষা-কবচ—রক্ষা-কবচ ওর বেঁচে থাকার ও ধ্বংস হ'তে আত্ম-রক্ষার সহজাত বুদ্ধি—যে-বুদ্ধি ওর বুদ্ধির চাইতে বড়, ওর ইচ্ছার চাইতেও প্রবল। ওর অচেতন মনে আছে শিল্পীর জিজ্ঞাসা—মানব-মনের সেই আবেগোন্মাদ, নৈর্ব্যক্তিক, স্রষ্টি-ধর্মী বিভূতি। আজ ও বুঝছে, বৃথাই ও ভালোবেসেছে, দুঃখ পেয়েছে, বৃথাই আবেগের স্রোতে ভেসেছে। ও আবেগ-ধর্মী, কিন্তু আবেগ ওর সবখানি নয়। ওটা ওর সত্য-রূপ নয়। নিঃসীম ব্যোমের শূন্যতার মধ্যে—গ্রহ উপগ্রহের দল যেমন কোন অদৃশ্য শক্তির টানে এক অজ্ঞাত আঁধার রহস্যের দিকে নিরন্তর ছুটছে, তেমনি ওরও সত্তার অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা প্রচ্ছন্ন ভাবে এক অজ্ঞেয় সুনির্দিষ্ট সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ধাবমান। নির্জ্ঞান মনের এই শাশ্বতী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঢেউগুলি এসে লাগে জীবনের সর্বনেশে বাঁকে বাঁকে।

প্রাত্যাহিক জীবন তখন নিদ্রায় ছেয়ে যায় এবং সেই সুপ্তির আঁধার আকাশে হয় উদিত-সবিতৃর মত বহু-মুখী, বিচিত্র-রূপ সত্তার উদ্ভাস—সহস্র চক্ষুতে তার স্ফীংক্স-এর দৃষ্টি। বছর খানেক হ'ল অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ও প্রায়ই—নিমেষে কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যায়—চোখের সামনে নির্ভুল স্পষ্টতায় একই সময়ে এক ক্রিসতফ বহু বহুধা·· প্রতি ক্রিসতফ বিচ্ছিন্ন ··পরস্পর হ'তে বহু দূর···মাঝখানে যেন বহু দেশ কালের ব্যবধান···জেগে উঠেও ঘোর কাটে না। ওর চোখে মনে তখনও জড়িয়ে থাকে স্বপ্ন। থাকে অস্বস্তি ; কিন্তু স্বপ্নটা ভুলে যায়, মনে করতে পারে না। কোন একটা বদ্ধমূল সংস্কার মন থেকে চলে গেলে দাগ থাকে, কিন্তু আসলটাকে আর চেনা যায় না। তেমনি স্বপ্নটার আবেশ থাকে, একটা শ্রান্তি থাকে জড়িয়ে।

এমনি আলোড়নের মধ্য দিয়ে চলছিল ক্রিসতফের আত্মা দিনের পর দিন ; কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে এই সংগ্রাম দেখছিল আর একজন—আর এক আত্মা—ধীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে, পরম আগ্রহ ভরে। দেখছিল সে পৃথিবীকে লোভীর মত—আনন্দে, কৌতূহলে। নিরীক্ষণ ক'রে দেখবে—প্রতিটি মানবকে, প্রতিটি মানবীকে—শুনবে তাদের বুকের ধুকধুকানী, নাড়ীর স্পন্দন—দেখবে জীবনকে, দেখবে জগতকে, দেখবে দুনিয়ার মনকে আর মানসকে তার চিন্তাধারাকে। অত্যাচারীর দলকেও বাদ দেবে না, সাধারণ মানুষকে না। শ্রীভ্রষ্ট মানুষরূপী দানবের দলকেও দেখবে, বুঝবে, অনুভব করবে, সবার সাথে দুঃখভাগী হবে। নিজের আলোর অন্ততঃ একটুখানি ওদের বিলিয়ে দিতে পারলে তবে ক্রিসতফ সর্বনাশ হ'তে বাঁচবে। অলক্ষ্যের সেই জনকে ক্রিসতফ দেখতে পায় না, কিন্তু বুকে তার আলোর ছোঁয়া লাগে। কোথা দিয়ে কে যেন বলে যায় : ওরে তুই একা নস। কে এই দোসর ? কার এ আত্মা ? চেন নাই, ক্রিসতফ ? এযে "অহং